রবীন্দ্র রচনাবলী

পঞ্চবিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পঞ্চবিংশ খণ্ড

বিশ্বভারতী
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৭

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

রোগশয্যায়

বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশু পক্ষী তরুতে লতায়
নিত্যরত অদৃশ্য শুশ্রূষা
জীর্ণতায় মৃত্যুপীড়িতেরে
অমৃতের সুধাস্পর্শ দিয়ে,
রোগের সৌভাগ্য নিয়ে, তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিনু যে-দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে,
রেখে গেনু তাদের উদ্দেশে
অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

১৯৪০ 'আরোগ্য'-পর্বে রবীন্দ্রনাথ শ্রীজিতেন্দ্রপ্রতাপ সিং গৃহীত

রোগশয্যায়

১

সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে
যদি ক্ষণকালতরে
ক্লান্ত উর্বশীর
তালভঙ্গ হয়
দেবরাজ করে না মার্জনা।
পূর্বার্জিত কীর্তি তার
অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত।
আকস্মিক ত্রুটি মাত্র স্বর্গ কভু করে না স্বীকার।
মানবের সভাঙ্গনে
সেখানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।
তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে;
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপতালে।
খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্তমনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়;
নির্মম ভবিষ্য, জানি, অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে
কীর্তির সঞ্চয়ে—
আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা।

উদয়ন
২৭ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,
পদে পদে সংকটে সংকটে
নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশবিহীন কোন্ তটে
পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেয়া,
কোন্ সে অলক্ষ্য পাড়ি-দেয়া
মর্মে বসি দিতেছে আদেশ,
নাহি তার শেষ।
চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী,
এই শুধু জানি।
চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে,
পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে।
মৃত্যুর কবলে লুপ্ত নিরন্তর ফাঁকি—
তবু সে ফাঁকির নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি ;
পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া
পদে পদে তবু রহে জিয়া।
অস্তিত্বের মহৈশ্বর্য শতছিদ্র ঘটতলে ভরা—
অফুরান লাভ তার অফুরান ক্ষতিপথে ঝরা ;
অবিশ্রাম অপচয়ে সঞ্চয়ের আলস্য ঘুচায়,
শক্তি তাহে পায়।
চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে—
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।

৩

একা বসে আছি হেথায়
যাতায়াতের পথের তীরে।
যারা বিহান-বেলায় গানের খেয়া
আনল বেয়ে প্রাণের ঘাটে,
আলোছায়ার নিত্য নাটে,
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা
মিলায় ধীরে।
আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে ;
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গনি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে।

জোড়াসাঁকো
৩০ অক্টোবর, ১৯৪০

৪

অজস্র দিনের আলো,
জানি, একদিন
দু চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি, মহারাজ।
শোধ করে দিতে হবে জানি,
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে
ফেল ছায়াখানি।
রচিলে যে আলো দিয়ে তব বিশ্বতল
আমি সেথা অতিথি কেবল।

হেথা হোথা যদি পড়ে থাকে
কোনো ক্ষুদ্র ফাঁকে
নাই হল পুরা
সেটুকু টুকুরা—
রেখে যেয়ো ফেলে
অবহেলে,
যেথা তব রথ
শেষ চিহ্ন রেখে যায় অন্তিম ধুলায়
সেথায় রচিতে দাও আমার জগৎ
অল্প কিছু আলো থাক্‌,
অল্প কিছু ছায়া
আর কিছু মায়া।
ছায়াপথে লুপ্ত আলোকের পিছু
হয়তো কুড়ায়ে পাবে কিছু—
কণামাত্র লেশ
তোমার ঋণের অবশেষ।

জোড়াসাঁকো
৩ নভেম্বর, ১৯৪০

৫

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে,
চূর্ণ হতে থাকে গ্রহতারা।
উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যত
দিক্‌ বিদিকে অস্তিত্বের বেদনারে
প্রলয়দুঃখের রেণুজালে
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে
পীড়নের যন্ত্রশালে
চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে

কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত,
কোথা ক্ষতরক্ত উৎসারিছে।
মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণায় শক্তি তার কী দুঃসীম।
সৃষ্টি ও প্রলয় -সভাতলে—
তার বহ্নিরসপাত্র
কী লাগিয়া যোগ দিল বিশ্বের ভৈরবীচক্রে
বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা—কেন
এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত
প্রতি ক্ষণে অন্তহীন মূল্য দিল তারে
মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহদুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।
এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি—
সাথে সাথে পথে পথে
এমন সেবার উৎস আগ্নেয় গহ্বর ভেদ করি
অফুরান প্রেমের পাথেয়।

জোড়াসাঁকো
৪ নভেম্বর, ১৯৪০

৬

ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি,
একটুখানি আঁধার থাকতে বাকি
ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে
সাশির 'পরে ঠোকর মার এসে,
দেখ কোনো খবর আছে নাকি।
তাহার পরে কেবল মিছিমিছি
যেমন খুশি নাচের সঙ্গে
যেমন খুশি কেবল কিচিমিচি;
নির্ভীক ঐ পুচ্ছ
সকল বাধা শাসন করে তুচ্ছ।
যখন প্রাতে দোয়েলরা দেয় শিস
কবির কাছে পায় তারা বকশিশ;
সারা প্রহর একটানা এক পঞ্চম স্বর সাধি
লুকিয়ে কোকিল করে কী ওস্তাদি—
সকল পাখি ঠেলে
কালিদাসের বাহবা সেই পেলে।
তুমি কেয়ার কর না তার কিছু,
মান নাকো স্বরগ্রামের কোনো উঁচু নিচু।
কালিদাসের ঘরের মধ্যে ঢুকে
ছন্দভাঙা চেঁচামেচি
বাধাও কী কৌতুকে।
নবরত্নসভায় কবি যখন করে গান
তুমি তারি থামের মাথায় কী কর সন্ধান।
কবিপ্রিয়ার তুমি প্রতিবেশী,
সারা মুখর প্রহর ধ'রে তোমার মেশামেশি।
বসন্তেরই বায়না-করা
নয় তো তোমার নাট্য,
যেমন-তেমন নাচন তোমার—
নাইকো পারিপাট্য।

অরণ্যেরই গাহন-সভায় যাও না সেলাম ঠুকি,
আলোর সঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় আলাপ মুখোমুখি ;
কী যে তাহার মানে
নাইকো অভিধানে—
স্পন্দিত ওই বক্ষটুকু তাহার অর্থ জানে।
ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কী কর মস্করা,
অকারণে সমস্ত দিন কিসের এত ত্বরা।
মাটির 'পরে টান,
ধুলায় কর স্নান—
এমনি তোমার অযত্নেরই সজ্জা
মলিনতা লাগে না তায়, দেয় না তারে লজ্জা।
বাসা বাঁধ রাজার ঘরের ছাদের কোণে—
লুকোচুরি নাইকো তোমার মনে।

অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে দুখের রাত
আশা করি দ্বারে তোমার প্রথম চঞ্চুঘাত।
অভীক তোমার, চটুল তোমার,
সহজ প্রাণের বাণী
দাও আমারে আনি—
সকল জীবের দিনের আলো
আমারে লয় ডাকি,
ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি।

জোড়াসাঁকো
১১ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৭

গহন রজনী-মাঝে
রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে
যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব,

মনে হয়, যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার
তার পরে জানি যবে
তুমি চলে যাবে,
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা।

জোড়াসাঁকো
১২ নভেম্বর, ১৯৪০। রাত্রি দুটা

৮

মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা-পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়,
হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০

৯

হে প্রাচীন তমস্বিনী,
আজি আমি রোগের বিমিশ্র তমিস্রায়
মনে মনে হেরিতেছি—
কালের প্রথম কল্পে নিরন্তর অন্ধকারে
বসেছ সৃষ্টির ধ্যানে

কী ভীষণ একা,
বোবা তুমি, অন্ধ তুমি।
অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি
অনাদি আকাশে।
পঙ্গু উঠিতেছে কাঁদি নিদ্রার অতল-মাঝে,
আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত লৌহগর্ভ হতে
গোপনে উঠিছে জ্বলি শিখায় শিখায়।
অচেতন তোমার অঙ্গুলি
অস্পষ্ট শিল্পের মায়া বুনিয়া চলিছে ;
আদিমহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণহস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ,
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে।
মূর্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

১০

আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু
মিশাইলে মূলতানে—
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন,
ভুলে যাবে তার মানে।
কর্মক্লান্ত পথিক যখন

বসিবে পথের ধারে
এই রাগিণীর করুণ আভাস
পরশ করিবে তারে,
নীরবে শুনিবে মাথাটি করিয়া নিচু ;
শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে,
বুঝিবে না আর কিছু—
'বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে
বেঁচেছিল কেউ বুঝি,
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই
তাই সে পেয়েছে খুঁজি।'

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

১১

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা
সুতীব্র অক্ষমা।
অগোচরে কোনোখানে একটি রেখার হলে ভুল
দীর্ঘ কালে অকস্মাৎ আপনারে করে সে নির্মূল।
ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয়নর্তনে।
প্রাণী কত এসেছিল দলে দলে
জীবনের রঙ্গভূমে
অপর্যাপ্ত শক্তির সম্বলে—
সে শক্তিই ভ্রম তার,
ক্রমেই অসহ্য হয়ে লুপ্ত করে দেয় মহাভার।
কেহ নাহি জানে,
এ বিশ্বের কোন্‌খানে
প্রতি ক্ষণে জমা
দারুণ অক্ষমা।

দৃষ্টির অতীত ত্রুটি করিয়া ভেদন
সম্বন্ধের দৃঢ় সূত্র করিছে ছেদন ;
ইঙ্গিতের স্ফুলিঙ্গের ভ্রম
পশ্চাতে ফেরার পথ চিরতরে করিছে দুর্গম।
দারুণ ভাঙন এ যে পূর্ণেরই আদেশে ;
কী অপূর্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে—
গুঁড়াবে অবাধ্য মাটি, বাধা হবে দূর,
বহিয়া নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।
হে অক্ষমা,
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা ;
শান্তির পথের কাঁটা তব পদপাতে
বিদলিত হয়ে যায় বারবার আঘাতে আঘাতে।

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০

১২

সকাল বেলায় উঠেই দেখি চেয়ে,
যাহা তাহা রয়েছে ঘর ছেয়ে—
খাতাপত্র কোথায় রাখি কী যে,
হাতড়ে বেড়াই, খুঁজে না পাই নিজে।
দামী যত কোথায় কী হয় জমা—
ছড়াছড়ি, নাই কোনো তার সেমিকোলন কমা।
পড়ে আছে পত্রবিহীন লেফাফা সব ছিন্ন—
এই তো দেখি পুরুষ জাতের জাত-কুঁড়েমির চিহ্ন।
পরক্ষণেই নামে কাজে মেয়ের হস্ত দুটি,
মুহূর্তেকেই বিলুপ্ত হয় যেথায় যত ত্রুটি।
দ্রুত হস্তে নির্লজ্জ সব বিশৃঙ্খলার প্রতি
নিয়ে আসে শোভনা তার চরম সদ্গতি।
ছেঁড়ার ক্ষত আরোগ্য হয়, দাগীর লজ্জা ঢাকে,
অদরকারীর গোপন বাসা কোথাও নাহি থাকে।

অগোছালোর মধ্যে থাকি ভাবি অবাক-পারা—
সৃষ্টিতে এই পুরুষ মেয়ের চলেছে দুই ধারা ;
পুরুষ আপন চারি দিকে জমায় আবর্জনা,
মেয়ে এসে নিত্য তারে করিছে মার্জনা ।

জোড়াসাঁকো
১৪ নভেম্বর, ১৯৪০ । দুপুর

১৩

দীর্ঘ দুঃখরাত্রি যদি
এক অতীতের প্রান্ততটে
খেয়া তার শেষ করে থাকে,
তবে নব বিস্ময়ের মাঝে
বিশ্বজগতের শিশুলোকে
জেগে ওঠে যেন সেই নূতন প্রভাতে
জীবনের নূতন জিজ্ঞাসা ।
পুরাতন প্রশ্নগুলি উত্তর না পেয়ে
অবাক্ বুদ্ধিরে যারা সদা ব্যঙ্গ করে,
বালকের চিন্তাহীন লীলাচ্ছলে
সহজ উত্তর তার পাই যেন মনে
সহজ বিশ্বাসে—
যে বিশ্বাস আপনার মাঝে তৃপ্ত থাকে,
করে না বিরোধ,
আনন্দের স্পর্শ দিয়ে সত্যের প্রত্যয় দেয় এনে

জোড়াসাঁকো
১৫ নভেম্বর, ১৯৪০ । প্রাতে

১৪

নদীর একটা কোণে শুষ্ক মরা ডাল
স্রোতের ব্যাঘাত যদি করে,
সৃষ্টিশক্তি ভাসমান আবর্জনা নিয়ে
সেখানে প্রকাশ করে আপনার রচনাচাতুরী—
ছোটো দ্বীপ গড়ে তোলে, টেনে আনে শৈবালের দল,
তীরের যা পরিত্যক্ত নেয় সে কুড়ায়ে,
দ্বীপসৃষ্টি-উপাদানে যাহা-তাহা জোটায় সম্বল।
আমার রোগীর ঘরে আবদ্ধ আকাশে
তেমনি চলেছে সৃষ্টি
চৌদিকের সব হতে স্বতন্ত্র স্বরূপে।
তাহার কর্মের আবর্তন
ছোটো সীমাটিতে।
কপালেতে হাত দিয়ে দেখে
তাপ আছে কি না;
উদ্‌বিগ্ন চক্ষুর দৃষ্টি প্রশ্ন করে, ঘুম নেই কেন।
চুপিচুপি পা টিপিয়া
ঘরে আনে প্রভাতের আলো।
পথ্যের থালাটি নিয়ে হাতে
বার বার উপরোধে
রুচির বিরোধ লয় জিনি।
এলোমেলো যত-কিছু সযত্নে গুছায়ে রাখে
আঁচলে ধুলার লেশ ঝাড়ি।
দু হাতে সমান করি শয্যার কুঞ্চন
আসন প্রস্তুত রাখে শিয়রের কাছে
বিনিদ্র সেবার লাগি।
কথা হেথা ধীর স্বরে,
দৃষ্টি হেথা বাষ্প দিয়ে ছোঁওয়া,
স্পর্শ হেথা কম্পিত করুণ—

জীবনের এই রুদ্ধ স্রোত
আপনার কেন্দ্রে আবর্তিত,
বাহিরের সংবাদের
ধারা হতে বিচ্ছিন্ন সুদূর।

একদিন বন্যা নামে, শৈবালের দ্বীপ যায় ভেসে ;
পূর্ণ জীবনের যবে নামিবে জোয়ার
সেইমতো ভেসে যাবে সেবার বাসাটি,
সেথাকার দুঃখপাত্রে সুধাভরা এই ক'টা দিন।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৯ নভেম্বর, ১৯৪০

১৫

অসুস্থ শরীরখানা
কোন্ অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন,
বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা।
নির্ঝর যখন ছোটে পরিপূর্ণ বেগে
বহুদূর দুর্গমেরে করিবারে জয়—
গর্জন তাহার
অস্বীকার করি চলে গুহার সংকীর্ণ আত্মীয়তা,
ঘোষণা করিতে থাকে নিখিল বিশ্বের অধিকার।
বলহারা ধারা তার মৃদু হয় যবে
বৈশাখের শীর্ণ শুষ্কতায়—
হারায় আপন মন্দ্রধ্বনি,
কৃশতম হয়ে আসে আপনার কাছে
আপনার পরিচয়।
খণ্ড খণ্ড কুণ্ড-মাঝে
ক্লান্ত তার গতিস্রোত লীন হয়ে থাকে।

তেমনি আমার রুগ্ন বাণী
স্পর্ধা হারায়েছে তার,
শক্তি নাই জীবনের সঞ্চিত গ্লানিরে
ধিক্কার দিবার।
আত্মগত ক্লিষ্ট জীবনের কুহেলিকা
তাহার বিশ্বের দৃষ্টি করিছে হরণ।

হে প্রভাতসূর্য,
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,
প্রভাতধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত;
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও,
পরাভূত রজনীর অপমান-সহ।

উদয়ন
২১ নভেম্বর, ১৯৪০

১৬

অবসন্ন আলোকের
শরতের সায়াহ্নপ্রতিমা—
সংখ্যাহীন তারকার শান্ত নীরবতা
স্তব্ধ তার হৃদয়গহনে,
প্রতি ক্ষণে নিশ্বসিত নিঃশব্দ শুশ্রূষা।
আঁধারের গুহা দিয়ে
আসে তার জাগরণপথে
হতাশ্বাস রজনীর মন্থর প্রহরগুলি
প্রভাতের শুকতারা-পানে

পূজাগন্ধী বাতাসের
হিমস্পর্শ লয়ে।
সায়াহ্নের ম্লানদীপ্তি
সে করুণচ্ছবি
ধরিল কল্যাণরূপ
আজি প্রাতে অরুণকিরণে ;
দেখিলাম, ধীরে আসে আশীর্বাদ বহি
শেফালিকুসুমরুচি আলোর থালায়।

১৭

কখন ঘুমিয়েছিনু,
জেগে উঠে দেখিলাম—
কমলালেবুর ঝুড়ি
পায়ের কাছেতে
কে গিয়েছে রেখে।
কল্পনায় ডানা মেলে
অনুমান ঘুরে ঘুরে ফিরে
একে একে নানা স্নিগ্ধ নামে।
স্পষ্ট জানি না'ই জানি,
এক অজানারে লয়ে
নানা নাম মিলিল আসিয়া
নানা দিক হতে।
এক নামে সব নাম সত্য হয়ে উঠি
দানের ঘটায়ে দিল
পূর্ণ সার্থকতা।

উদয়ন
২১ নভেম্বর, ১৯৪০

১৮

সংসারের নানা ক্ষেত্রে নানা কর্মে বিক্ষিপ্ত চেতনা—
মানুষকে দেখি সেথা বিচিত্রের মাঝে
পরিব্যাপ্ত রূপে ;
কিছু তার অসমাপ্ত, অপূর্ণ কিছু বা।
রোগীকক্ষে নিবিড় একান্ত পরিচয়
একাগ্র লক্ষ্যের চারি দিকে,
নূতন বিস্ময় সে যে
দেখা দেয় অপরূপ রূপে।
সমস্ত বিশ্বের দয়া
সম্পূর্ণ সংহত তার মাঝে,
তার করস্পর্শে, তার বিনিদ্র ব্যাকুল আঁখিপাতে।

উদয়ন
২৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

১৯

সজীব খেলনা যদি
গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে,
কী তাহার দশা হয়
তাই করি অনুভব
আজি আয়ুশেষে।
হেথা খ্যাতি মোর পরাহত,
উপেক্ষিত গাম্ভীর্য আমার,
নিষেধে অনুশাসনে
শোওয়া বসা চলে।
‘চুপ করে থাকো,’
‘বেশি কথা কওয়া ভালো নয়’,
‘আরো কিছু খেতে হবে’—
এ-সকল আদেশ নির্দেশ

কভু ভর্ৎসনায়, কভু অনুনয়ে,
যাহাদের কণ্ঠ হতে আসে
তাহাদের পরিত্যক্ত খেলাঘরে
ভাঙা পুতুলের ট্রাজেডিতে
এই তো সেদিন মাত্র পড়েছে কৈশোর-যবনিকা।
কিছুক্ষণ
বিরোধের স্পর্ধা করি,
তার পরে ভালো ছেলে হয়ে
যেমন চালায় তাই চলি।
মনে ভাবি,
বৃদ্ধ ভাগ্য তার শাসনের ভার
কিছুদিন নূতন ভাগ্যের হাতে
সঁপি দিয়া কটাক্ষে হাসিছে দূরে থেকে
হেসেছিল যেমন বাদশা
আবুহোসেনের পালা
রচিয়া আড়ালে।
অমোঘ বিধির রাজ্যে বারবার হয়েছি বিদ্রোহী ;
এ রাজ্যে নিয়েছি মেনে
সেই দণ্ড
যাহা মৃণালের চেয়ে সুকোমল,
বিদ্যুতের চেয়ে স্পষ্ট
তর্জনী যাহার।

উদয়ন
২৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২০

রোগদুঃখ রজনীর নীরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোকবিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি,
মনে ভাবি, কী তার নির্দেশ।

পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেইমতো যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে—
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে।

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২১

সকালে জাগিয়া উঠি
ফুলদানে দেখিনু গোলাপ;
প্রশ্ন এল মনে—
যুগ-যুগান্তের আবর্তনে
সৌন্দর্যের পরিণামে যে শক্তি তোমারে আনিয়াছে
অপূর্ণের কুৎসিতের প্রতি পদে পীড়ন এড়ায়ে,
সে কি অন্ধ, সে কি অন্যমনা,
সেও কি বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর মতো
সুন্দরে ও অসুন্দরে ভেদ নাহি করে—
শুধু জ্ঞানক্রিয়া, শুধু বলক্রিয়া তার,
বোধের নাইকো কোনো কাজ?
কারা তর্ক করে বলে, সৃষ্টির সভায়
সুশ্রী কুশ্রী বসে আছে সমান আসনে—

প্রহরীর কোনো বাধা নাই।
আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন ;
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২২

মধ্যদিনে আধো ঘুমে আধো জাগরণে
বোধ করি স্বপ্নে দেখেছিনু—
আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে
লয়ে মোর নাম, মোর খ্যাতি,
কৃপণের সঞ্চয় যা-কিছু,
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত ;
গৌরব ও অগৌরব
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায়,
তারে আর পারি না ফিরাতে ;
মনে মনে তর্ক করি আমিশূন্য আমি,
যা-কিছু হারালো মোর
সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।
সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন।

সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোনো কালে পাই নাই,
যার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আমার
ভূমিগর্ভে বীজের মতন
অঙ্কুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি।

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। বিকাল

২৩

আরোগ্যের পথে
যখন পেলেম সত্য
প্রসন্ন প্রাণের নিমন্ত্রণ,
দান সে করিল মোরে
নূতন চোখের বিশ্ব-দেখা।
প্রভাত-আলোয় মগ্ন ঐ নীলাকাশ
পুরাতন তপস্বীর
ধ্যানের আসন,
কল্প-আরম্ভের
অন্তহীন প্রথম মুহূর্তখানি
প্রকাশ করিল মোর কাছে ;
বুঝিলাম, এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।
সপ্তরশ্মি সূর্যালোকসম
এক দৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা।

উদয়ন
২৫ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

প্রহরীর কোনো বাধা নাই।
আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন;
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।

উদয়ন

২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২২

মধ্যদিনে আধো ঘুমে আধো জাগরণে
বোধ করি স্বপ্নে দেখেছিনু—
আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে
লয়ে মোর নাম, মোর খ্যাতি,
কৃপণের সঞ্চয় যা-কিছু,
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত;
গৌরব ও অগৌরব
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায়,
তারে আর পারি না ফিরাতে;
মনে মনে তর্ক করি আমিশূন্য আমি,
যা-কিছু হারালো মোর
সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।
সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন

সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোনো কালে পাই নাই,
যার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আমার
ভূমিগর্ভে বীজের মতন
অঙ্কুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি।

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। বিকাল

২৩

আরোগ্যের পথে
যখন পেলেম সদ্য
প্রসন্ন প্রাণের নিমন্ত্রণ,
দান সে করিল মোরে
নূতন চোখের বিশ্ব-দেখা।
প্রভাত-আলোয় মগ্ন ঐ নীলাকাশ
পুরাতন তপস্বীর
ধ্যানের আসন,
কল্প-আরম্ভের
অন্তহীন প্রথম মুহূর্তখানি
প্রকাশ করিল মোর কাছে;
বুঝিলাম, এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।
সপ্তরশ্মি সূর্যালোকসম
এক দৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা।

উদয়ন
২৫ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২৪

প্রত্যুষে দেখিনু আজ নির্মল আলোকে
নিখিলের শান্তি-অভিষেক,
তরুগুলি নম্রশিরে ধরণীর নমস্কার করিল প্রচার।
যে শান্তি বিশ্বের মর্মে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত,
রক্ষা করিয়াছে তারে
যুগ-যুগান্তের যত আঘাতে সংঘাতে।
বিক্ষুব্ধ এ মর্তভূমে
নিজের জানায় আবির্ভাব
দিবসের আরম্ভে ও শেষে।
তারি পত্র পেয়েছ তো কবি, মাঙ্গলিক।
সে যদি অমান্য করে বিদ্রূপের বাহক সাজিয়া
বিকৃতির সভাসদ্‌রূপে
চিরনৈরাশ্যের দূত,
ভাঙা যন্ত্রে বেসুর ঝংকারে
ব্যঙ্গ করে এ বিশ্বের শাশ্বত সত্যেরে,
তবে তার কোন্ আবশ্যক।
শস্যক্ষেত্রে কাঁটাগাছ এসে
অপমান করে কেন মানুষের অন্নের ক্ষুধারে।
রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা বলে জানি—
তার চেয়ে বিনা বাক্যে আত্মহত্যা ভালো।
মানুষের কবিত্বই
হবে শেষে কলঙ্কভাজন
অসংস্কৃত যদৃচ্ছের পথে চলি।
মুখশ্রীর করিবে কি প্রতিবাদ
মুখোষের নির্লজ্জ নকলে।

উদয়ন
২৬ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২৫

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ড রূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।

উদয়ন
২৮ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২৬

আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস
জানি, কালসিন্ধু তারে
নিয়ত তরঙ্গঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।
আমার বিশ্বাস আপনারে।
দুই বেলা সেই পাত্র ভরি
এ বিশ্বের নিত্যসুধা
করিয়াছি পান।
প্রতি মুহূর্তের ভালোবাসা
তার মাঝে হয়েছে সঞ্চিত।
দুঃখভারে দীর্ণ করে নাই,
কালো করে নাই ধূলি
শিল্পেরে তাহার।
আমি জানি, যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি,
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে

আপন আত্মায় যারা
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানবসৃষ্টির ;
একমাত্র তারা আছে, আর কেহ নাই ;
আর যারা সবে
মায়ার প্রবাহে তারা ছায়ার মতন—
দুঃখ তাহাদের সত্য নহে,
সুখ তাহাদের বিড়ম্বনা,
তাহাদের ক্ষতব্যথা দারুণ আকৃতি ধ'রে
প্রতি ক্ষণে লুপ্ত হয়ে যায়,
ইতিহাসে চিহ্ন নাহি রাখে।

উদয়ন
২৯ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩০

সৃষ্টির চলেছে খেলা
চারি দিক হতে শত ধারে
কালের অসীম শূন্য পূর্ণ করিবারে।
সম্মুখে যা কিছু ঢালে পিছনে তলায় বারে বারে ;
নিরন্তর লাভ আর ক্ষতি,
তাহাতেই দেয় তারে গতি।
কবির ছন্দের খেলা সেও থাকি থাকি
নিশ্চিহ্ন কালের গায়ে ছবি আঁকা-আঁকি।
কাল যায়, শূন্য থাকে বাকি।
এই আঁকা-মোছা নিয়ে কাব্যের সচল মরীচিকা
ছেড়ে দেয় স্থান,
পরিবর্তমান
জীবনযাত্রার করে চলমান টীকা।
মানুষ আপন-আঁকা কালের সীমায়

সান্ত্বনা রচনা করে অসীমের মিথ্যা মহিমায়,
ভুলে যায় কত-না যুগের বাণীরূপ
ভূমিগর্ভে বহিতেছে নিঃশব্দের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ।

উদয়ন
৩০ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩১

আজিকার অরণ্যসভারে
অপবাদ দাও বারে বারে ;
বল যবে দৃঢ় কণ্ঠে অহংকৃত আপ্তবাক্যবৎ
প্রকৃতির অভিপ্রায়, 'নব ভবিষ্যৎ
করিবে বিরল রসে শুষ্কতার গান'—
বনলক্ষ্মী করিবে না অভিমান।
এ কথা সবাই জানে—
যে সংগীতরসপানে
প্রভাতে প্রভাতে
আনন্দে আলোকসভা মাতে
সে যে হেয়,
সে যে অশ্রদ্ধেয়,
প্রমাণ করিতে তাহা আরো বহু দীর্ঘকাল যাবে
এই এক ভাবে।
বনের পাখিরা ততদিন
সংশয়বিহীন
চিরন্তন বসন্তের স্তবে
আকাশ করিবে পূর্ণ
আপনার আনন্দিত রবে।

উদয়ন
৩০ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২

প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে
অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান,
জ্যোতিঃস্রোতে মিশে যায় রক্তের প্রবাহ,
নীরবে ধ্বনিত হয় দেহে মনে জ্যোতিষ্কের বাণী।
রহি আমি দু চক্ষুর অঞ্জলি পাতিয়া
প্রতিদিন ঊর্ধ্ব-পানে চেয়ে।
এ আলো দিয়েছে মোরে জন্মের প্রথম অভ্যর্থনা,
অস্তসমুদ্রের তীরে এ আলোর দ্বারে
রবে মোর জীবনের শেষ নিবেদন।
মনে হয়, বৃথা বাক্য বলি, সব কথা বলা হয় নাই ;
আকাশবাণীর সাথে প্রাণের বাণীর
সুর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ সুরে,
ভাষা পাই নাই।

উদয়ন
ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৩

বহুকাল আগে তুমি দিয়েছিলে একগুচ্ছ ধূপ,
আজি তার ধোঁয়া হতে বাহিরিল অপরূপ রূপ ;
যেন কোন্ পুরানী আখ্যানে
স্তব্ধ মোর ধ্যানে
ধীরপদে এল কোন্ মালবিকা
লয়ে দীপশিখা
মহাকালমন্দিরের দ্বারে
যুগান্তের কোন্ পারে।
সদ্যস্নান-পরে
সিক্ত বেণী গ্রীবা তার জড়াইয়া ধরে,
চন্দনের মৃদু গন্ধ আসে

অঙ্গের বাতাসে।
মনে হয়, এই পূজারিনী—
এরে আমি বারবার চিনি,
আসে মৃদুমন্দ পদে
চিরদিবসের বেদিতলে
তুলি ফুল শুচিশুভ্র বসন-অঞ্চলে।
শান্ত স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে
সেই বাণী নিয়ে আসে এ যুগের ভাষার সৃষ্টিতে।
সুললিত বাহুর কঙ্কণে
প্রিয়জন-কল্যাণের কামনা বহিছে সযতনে।
প্রীতি আত্মহারা
আদি সূর্যোদয় হতে
বহি আনে আলোকের ধারা।
দূর কাল হতে-তারি
হস্ত দুটি লয়ে সেবারস
আতপ্ত ললাট মোর আজো ধীরে করিছে পরশ।

উদয়ন
২ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৪

যখন বীণায় মোর আনমনা সুরে
গান বেঁধেছিনু বসি একা
তখনো যে ছিলে তুমি দূরে,
দাও নাই দেখা;
কেমনে জানিব, সেই গান
অপরিচয়ের তীরে তোমারেই করিছে সন্ধান।
দেখিলাম, কাছে তুমি আসিলে যেমনি
তোমারি গতির তালে বাজে মোর এ ছন্দের ধ্বনি;
মনে হল, সুরের সে মিলে
উচ্ছ্বসিল আনন্দের নিশ্বাস নিখিলে।

বর্ষে বর্ষে পুষ্পবনে পুষ্পগুলি ফুটে আর ঝরে
এ মিলের তরে।
কবির সংগীতে বাণী অঞ্জলি পাতিয়া আছে জাগি
অনাগত প্রসাদের লাগি।
চলে লুকাচুরি খেলা বিশ্বে অনিবার
অজানার সাথে অজানার।

উদয়ন
২ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৫

যেমন ঝড়ের পরে
আকাশের বক্ষতল করে অবারিত
উদয়াচলের জ্যোতিঃপথ
গভীর নিস্তব্ধ নীলিমায়,
তেমনি জীবন মোর মুক্ত হোক
অতীতের বাষ্পজাল হতে,
সদ্যনব জাগরণ দিক শঙ্খধ্বনি
এ জন্মের নবজন্মদ্বারে।
প্রতীক্ষা করিয়া আছি—
আলো হতে মুছে যাক রঙের প্রলেপ,
ঘুচে যাক ব্যর্থ খেলা আপনারে খেলেনা করিয়া,
নিরাসক্ত ভালোবাসা আপন দাক্ষিণ্য হতে
শেষ মূল্য পায় যেন তার।
আয়ুস্রোতে ভাসি যবে আঁধারে আলোতে,
তীরে তীরে অতীত কীর্তির পানে
ফিরে ফিরে না যেন তাকাই;
সুখে দুঃখে নিরন্তর
লিপ্ত হয়ে আছে যে আপনা
আপন-বাহিরে তারে স্থাপন করিতে যেন পারি
সংসারের শতলক্ষ ভাসমান ঘটনার সমান শ্রেণীতে,

নিঃশঙ্ক নিস্পৃহ চোখে দেখি যেন তারে
অনাত্মীয় নির্বাসনে।
এই শেষ কথা মোর,
সম্পূর্ণ করুক মোর পরিচয় অসীম শুভ্রতা।

উদয়ন
৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৬

যাহা-কিছু চেয়েছিনু একান্ত আগ্রহে
তাহার চৌদিক হতে বাহুর বেষ্টন
অপসৃত হয় যবে,
তখন সে বন্ধনের মুক্তক্ষেত্রে
যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
প্রভাত-আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।
শূন্য, তবু সে তো শূন্য নয়।
তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—
আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

উদয়ন
৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৭

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত,
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা;
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক

বরের চরম দান মরণের বধূ ;
দক্ষিণবাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে

উদয়ন
৪ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৮

ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা।
ভেবেছি পীড়িত মনে, পথভ্রষ্ট পথিক গ্রহের
অকস্মাৎ অপঘাতে একটি বিপুল চিতানলে
আগুন জ্বলে না কেন মহা এক সহমরণের।
তার পরে ভাবি মনে,
দুঃখে দুঃখে পাপ যদি নাহি পায় ক্ষয়
প্রলয়ের ভস্মক্ষেত্রে বীজ তার রবে সুপ্ত হয়ে,
নূতন সৃষ্টির বক্ষে
কণ্টকিয়া উঠিবে আবার

উদয়ন
৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৯

তোমারে দেখি না যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়,
পৃথিবী পায়ের নীচে চুপিচুপি করিছে মন্ত্রণা
সরে যাবে বলে।
আঁকড়ি ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠায় শূন্য আকাশেরে
দুই বাহু তুলি।
চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে ;
দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।

উদয়ন
৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

আরোগ্য

কল্যাণীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে—
কেহ বা খেলার সাথি, কেহ কৌতূহলী,
কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধা।
আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়স্পর্শ দিতে
তোমরা পথিকবন্ধু,
যেমন রাত্রির তারা
অন্ধকারে লুপ্তপথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে।

উদয়ন
৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

আরোগ্য

১

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।

উদয়ন
১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২

পরম সুন্দর
আলোকের স্নানপুণ্য প্রাতে।
অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রসমূর্তি করিছে রচনা,
প্রতিদিন
চিরনূতনের অভিষেক

চিরপুরাতন বেদিতলে।
মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।
আকাশের হৃৎস্পন্দন
পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।
প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।
পাখিদের অকারণ গান
সাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলক্ষ্মীরে।
সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

উদয়ন
১২ জানুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

৩

নির্জন রোগীর ঘর।
খোলা দ্বার দিয়ে
বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।
শীতের মধ্যাহ্নতাপে তন্দ্রাতুর বেলা
চলেছে মন্থরগতি
শৈবালে দুর্বলস্রোত নদীর মতন।
মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস
শস্যহীন মাঠে।

মনে পড়ে কতদিন
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা

কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া
ফেনায় ফেনায়।
স্পর্শ করি শূন্যের কিনারা
জেলেডিঙি চলে পাল তুলে,
যূথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।
আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘট কাঁখে পল্লীমেয়েদের
ঘোমটায় গুন্ঠিত আলাপে
গুঞ্জরিত বাঁকা পথে আম্রবনচ্ছায়ে
কোকিল কোথায় ডাকে ক্ষণে ক্ষণে নিভৃত শাখায়,
ছায়ায় কুণ্ঠিত পল্লীজীবনযাত্রার
রহস্যের আবরণ কাঁপাইয়া তোলে মোর মনে।
পুকুরের ধারে ধারে সর্ষেখেতে পূর্ণ হয়ে যায়
ধরণীর প্রতিদান রৌদ্রের দানের,
সূর্যের মন্দিরতলে পুষ্পের নৈবেদ্য থাকে পাতা।

আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে
পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা
সেই সবিতারে যাঁর জ্যোতিরূপে প্রথম মানুষ
মর্তের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ;
মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।
ভাষা নাই, ভাষা নাই;
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

উদয়ন
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

৪

ঘণ্টা বাজে দূরে।
শহরের অভ্রভেদী আত্মঘোষণার
মুখরতা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল,
আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এল চোখে
জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।

গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর-পানে
নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে।
প্রাচীন অশথতলা,
খেয়ার আশায় লোক ব'সে
পাশে রাখি হাটের পসরা।
গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি,
চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর।
ভিড় করে মাছি।
রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি
পাটের বোঝাই ভরা,
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন্
আড়তের আঙিনায়।
বাঁধা-খোলা বলদেরা
রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে,
লেজের চামর হানে পিঠে।
সর্ষে আছে স্তূপাকার
গোলায় তোলার অপেক্ষায়।
জেলেনৌকো এল ঘাটে,
ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি ;
মাথার উপরে ওড়ে চিল।
মহাজনী নৌকোগুলো ঢালুতটে বাঁধা পাশাপাশি
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে।

আঁকড়ি মোষের গলা সাঁতারিয়া চাষী ভেসে চলে
ওপারে ধানের খেতে।
অদূরে বনের ঊর্দ্ধে মন্দিরের চূড়া
ঝলিছে প্রভাত-রৌদ্রালোকে।
মাঠের অদৃশ্য পারে চলে রেলগাড়ি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনিরেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে,
পশ্চাতে ধোঁয়ায় মেলি
দূরত্বজয়ের দীর্ঘ বিজয়পতাকা।

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে,
দু'পহর রাত্তি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্যতীরে-তীরে,
ক্বচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের,
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরন;
চাঁদের-মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্বাক্ হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।

পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষ প্রান্তে বাসা,
দূরপ্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।
হেথা হোথা চরে গরু শস্যশেষ বাজরার খেতে;
তর্মুজের লতা হতে

ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ-বালক।
কোথাও বা একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁখে।
কভু বহু দূরে চলে নদীর রেখার পাশে পাশে
নতপৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুণটানা মাল্লা একসারি।
জলে স্থলে সজীবের আর চিহ্ন নাই সারাবেলা।
গোলকচাঁপার গাছ অনাদৃত কাছের বাগানে ;
তলায়-আসন-গাঁথা বৃদ্ধ মহানিম,
নিবিড় গম্ভীর তার আভিজাত্যচ্ছায়া।
রাত্রে সেথা বকের আশ্রয়।
ইঁদারায় টানা জল
নালা বেয়ে সারাদিন কুলুকুলু চলে
ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ।
ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে।
মধ্যাহ্ন আবিষ্ট করে একটানা সুর।

পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;
এইসব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।

উদয়ন
৩১ জানুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

৫

মুক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশূন্য ঘরে
বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে,
বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান ;
অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে।
কার পানে পাঠাইবে স্তুতি
ব্যগ্র এই মনের আকূতি,
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খুঁজিয়া বাণীরূপ,
করে থাকে চুপ,
বলে, আমি আনন্দিত— ছন্দ যায় থামি—
বলে, ধন্য আমি।

উদয়ন
২৮ জানুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

৬

অতি দূরে আকাশের সুকুমার পাণ্ডুর নীলিমা।
অরণ্য তাহারি তলে উর্ধ্বে বাহু মেলি
আপন শ্যামল অর্ঘ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন।
মাঘের তরুণ রৌদ্র ধরণীর 'পরে
বিছাইল দিকে দিকে স্বচ্ছ আলোকের উত্তরীয়।
এ কথা রাখিনু লিখে
উদাসীন চিত্রকর এই ছবি মুছিবার আগে।

উদয়ন
২৪ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

৭

হিংস্র রাত্রি আসে চুপে চুপে,
গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ভেঙে দিয়ে
অন্তরে প্রবেশ করে,

হরণ করিতে থাকে জীবনের গৌরবের রূপ
কালিমার আক্রমণে হার মানে মন।
এ পরাভবের লজ্জা এ অবসাদের অপমান
যখন ঘনিয়ে ওঠে, সহসা দিগন্তে দেখা দেয়
দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের রেখা-আঁকা ;
আকাশের যেন কোন্ দূর কেন্দ্র হতে
উঠে ধ্বনি 'মিথ্যা মিথ্যা' বলি।
প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখবিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণদেহদুর্গের শিখরে।

উদয়ন
২৭ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

৮

একা ব'সে সংসারের প্রান্ত-জানালায়
দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি।
বাজে মনে--- নহে দূর, নহে বহু দূর।
পথরেখা লীন হল অস্তগিরিশিখর-আড়ালে,
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা-দ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষতীর্থমন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহু দূর।

উদয়ন
৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

৯

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা লয়ে
যুগযুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।
প্রস্থানের অঙ্কে আজ এসেছি যেমনি
দীপশিখা ম্লান হয়ে এল,
ছায়াতে পড়িল ধরা এ খেলার মায়ার স্বরূপ,
শ্লথ হয়ে এল ধীরে
সুখ দুঃখ নাট্যসজ্জাগুলি।
দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

উদয়ন
৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

১০

অলস সময়-ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।
সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে
কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।

এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল ;
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।
শূন্যপথে চাই,
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।
নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো
যুগে যুগে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের আলো।
আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ,
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল ;
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।

ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরুগুরু গর্জন গুন্‌গুন্‌ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্ত্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

উদয়ন
১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

১১

পলাশ আনন্দমূর্তি জীবনের ফাল্গুনদিনের,
আজ এই সম্মানহীনের
দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা
যেথা আমি সাথিহীন একা
উৎসবের প্রাঙ্গণ-বাহিরে
শস্যহীন মরুময় তীরে।
যেথানে এ ধরণীর প্রফুল্ল প্রাণের কুঞ্জ হতে
অনাদৃত দিন মোর নিরুদ্দেশ স্রোতে
ছিন্নবৃন্ত চলিয়াছে ভেসে
বসন্তের শেষে।

তবুও তো কৃপণতা নাই তব দানে,
যৌবনের পূর্ণ মূল্য দিলে মোর দীপ্তিহীন প্রাণে,
অদৃষ্টের অবজ্ঞারে কর নি স্বীকার—
ঘুচাইলে অবসাদ তার ;
জানাইলে চিত্তে মোর লভি অনুক্ষণ
সুন্দরের অভ্যর্থনা, নবীনের আসে নিমন্ত্রণ।

উদয়ন
১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

১২

দ্বার খোলা ছিল মনে, অসতর্কে সেথা অকস্মাৎ
লেগেছিল কী লাগিয়া কোথা হতে দুঃখের আঘাত ;
সে লজ্জায় খুলে গেল মর্মতলে প্রচ্ছন্ন যে বল
জীবনের নিহিত সম্বল।
ঊর্ধ্ব হতে জয়ধ্বনি
অন্তরে দিগন্তপথে নামিল তখনি,
আনন্দের বিচ্ছুরিত আলো
মুহূর্তে আঁধার-মেঘ দীর্ণ করি হৃদয়ে ছড়ালো।
ক্ষুদ্র কোটরের অসম্মান
লুপ্ত হল, নিখিলের আসনে দেখিনু নিজ স্থান,
আনন্দে আনন্দময়
চিত্ত মোর করি নিল জয়,
উৎসবের পথ
চিনে নিল মুক্তিক্ষেত্রে সগৌরবে আপন জগৎ।
দুঃখ-হানা গ্লানি যত আছে,
ছায়া সে, মিলালো তার কাছে।

উদয়ন
১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

১৩

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে
নির্ঝরের প্রলোপকল্লোলে,
অজানা শিখর হতে
সহসা বিস্ময় বহি আনি
ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ
লঙ্ঘিয়া উচ্ছল পরিহাসে,
বাতাসেরে করি' ধৈর্যহারা,
পরিচয়ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের
অভাবিত রহস্যের ভাষা,
চারি দিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত
তারি মধ্যে মুক্ত করি' ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।

আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
চারি দিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে,
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

উদয়ন
৩০ জানুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

১৪

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে।
এটুকু স্বীকৃতি লাভ করি
সর্বাঙ্গে তরঙ্গি উঠে আনন্দপ্রবাহ।

বাক্যহীন প্রাণীলোক-মাঝে
এই জীব শুধু
ভালো মন্দ সব ভেদ করি
দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে ;
দেখেছে আনন্দে যারে প্রাণ দেওয়া যায়,
যারে ঢেলে দেওয়া যায় অহেতুক প্রেম,
অসীম চৈতন্যলোকে
পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা।
দেখি যবে মূক হৃদয়ের
প্রাণপণ আত্মনিবেদন
আপনার দীনতা জানায়ে,
ভাবিয়া না পাই ও যে কী মূল্য করেছে আবিষ্কার
আপন সহজ বোধে মানবস্বরূপে ;
ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না,
আমারে বুঝায়ে দেয় সৃষ্টি-মাঝে মানবের সত্য পরিচয়

উদয়ন
৭ পৌষ, ১৩৪৭। সকাল

১৫

খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে জীবনের এসেছি প্রদোষে,
বিদায়ের ঘাটে আছি বসে।
আপনার দেহটারে অসংশয়ে করেছি বিশ্বাস,
জরার সুযোগ পেয়ে নিজেরে সে করে পরিহাস,
সকল কাজেই দেখি কেবলি ঘটায় বিপর্যয়,
আমার কর্তৃত্ব করে ক্ষয় ;
সেই অপমান হতে বাঁচাতে যাহারা
অবিশ্রাম দিতেছে পাহারা,
পাশে যারা দাঁড়ায়েছে দিনান্তের শেষ আয়োজনে,
নাম না'ই বলিলাম তাহারা রহিল মনে মনে।

তাহারা দিয়েছে মোরে সৌভাগ্যের শেষ পরিচয়,
ভুলায়ে রাখিছে তারা দুর্বল প্রাণের পরাজয় ;
এ কথা স্বীকার তারা করে—
খ্যাতি প্রতিপত্তি যত সুযোগ্য সক্ষমদের তরে ;
তাহারাই করিছে প্রমাণ
অক্ষমের ভাগ্যে আছে জীবনের শ্রেষ্ঠ যেই দান।
সমস্ত জীবন ধরে খ্যাতির খাজনা দিতে হয়,
কিছু সে সহে না অপচয় ;
সব মূল্য ফুরাইলে যে দৈন্য প্রেমের অর্ঘ্য আনে
অসীমের স্বাক্ষর সেখানে।

উদয়ন
৯ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

১৬

দিন পরে যায় দিন, স্তব্ধ বসে থাকি ;
ভাবি মনে, জীবনের দান যত কত তার বাকি
চুকায়ে সঞ্চয় অপচয়।
অযত্নে কী হয়ে গেছে ক্ষয়,
কী পেয়েছি প্রাপ্য যাহা, কী দিয়েছি যাহা ছিল দেয়,
কী রয়েছে শেষের পাথেয়।
যারা কাছে এসেছিল, যারা চলে গিয়েছিল দূরে,
তাদের পরশখানি রয়ে গেছে মোর কোন্ সুরে।
অন্যমনে কারে চিনি নাই,
বিদায়ের পদধ্বনি প্রাণে আজ বাজিছে বৃথাই,
হয়তো হয় নি জানা ক্ষমা করে কে গিয়েছে চলে
কথাটি না ব'লে।
যদি ভুল করে থাকি তাহার বিচার
ক্ষোভ কি রাখিবে তবু যখন রব না আমি আর।
কত সূত্র ছিন্ন হল জীবনের আস্তরণময়,
জোড়া লাগাবারে আর রবে না সময়।

জীবনের শেষপ্রান্তে যে প্রেম রয়েছে নিরবধি
মোর কোনো অসম্মান তাহে ক্ষতচিহ্ন দেয় যদি,
আমার মৃত্যুর হস্ত আরোগ্য আনিয়া দিক তারে,
এ কথাই ভাবি বারে বারে।

উদয়ন
১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

১৭

যখন এ দেহ হতে রোগে ও জরায়
দিনে দিনে সামর্থ্য ঝরায়,
যৌবন এ জীর্ণ নীড় পিছে ফেলে দিয়ে যায় ফাঁকি,
কেবল শৈশব থাকে বাকি।
বদ্ধ ঘরে কর্মক্ষুব্ধ সংসার বাহিরে
অশক্ত সে শিশু চিত্ত মা খুঁজিয়া ফিরে।
বিত্তহারা প্রাণ লুব্ধ হয়
বিনা মূল্যে স্নেহের প্রশ্রয়
কারে কাছে করিবারে লাভ,
যার আবির্ভাব
ক্ষীণজীবিতেরে করে দান
জীবনের প্রথম সম্মান।
"থাকো তুমি" মনে নিয়ে এইটুকু চাওয়া
কে তারে জানাতে পারে তার প্রতি নিখিলের দাওয়া
শুধু বেঁচে থাকিবার।
এ বিস্ময় বারবার
আজি আসে প্রাণে,
প্রাণলক্ষ্মী ধরিত্রীর গভীর আহ্বানে
মা দাঁড়ায় এসে
যে মা চিরপুরাতন নূতনের বেশে

উদয়ন
২১ জানুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

১৮

ফসল কাটা হলে সারা মাঠ হয়ে যায় ফাঁক ;
অনাদরের শস্য গজায়, তুচ্ছ দামের শাক ।
আঁচল-ভরে তুলতে আসে গরিব-ঘরের মেয়ে,
খুশি হয়ে বাড়িতে যায় যা জোটে তাই পেয়ে ।
আজকে আমার চাষ চলে না, নাই লাঙলের বালাই ;
পোড়ো মাঠের কুঁড়েমিতে মন্থর দিন চালাই ।
জমিতে রস কিছু আছে, শক্ত যায় নি আঁটি ;
ফলায় না সে ফল তবুও সবুজ রাখে মাটি ।
শ্রাবণ আমার গেছে চলে, নাই বাদলের ধারা ;
অঘ্রান সে সোনার ধানের দিন করেছে সারা ।
চৈত্র আমার রোদে পোড়া, শুকনো যখন নদী,
বুনো ফলের ঝোপের তলায় ছায়া বিছায় যদি,
জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয় নি ফাঁকি,
শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি ।

উদয়ন
১০ জানুয়ারি, ১৯৪১ । সকাল

১৯

দিদিমণি—
অফুরান সান্ত্বনার খনি ।
কোনো ক্লান্তি কোনো ক্লেশ
মুখে চিহ্ন দেয় নাই লেশ ।
কোনো ভয় কোনো ঘৃণা কোনো কাজে কিছুমাত্র গ্লানি
সেবার মাধুর্যে ছায়া নাহি দেয় আনি ।
এ অখণ্ড প্রসন্নতা ঘিরে তারে রয়েছে উজ্জ্বলি,
রচিতেছে শান্তির মণ্ডলী ;
ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপে
চারি দিকে স্বস্তি দেয় ব্যেপে ;

আশ্বাসের বাণী সুমধুর
অবসাদ করি দেয় দূর।
এ স্নেহমাধুর্যধারা
অক্ষম রোগীরে ঘিরে আপনার রচিছে কিনারা;
অবিরাম পরশ চিন্তার
বিচিত্র ফসলে যেন উর্বর করিছে দিন তার।
এ মাধুর্য করিতে সার্থক
এতখানি নির্বলের ছিল আবশ্যক।
অবাক হইয়া তারে দেখি,
রোগীর দেহের মাঝে অনন্ত শিশুরে দেখেছে কি।

উদয়ন
২ জানুয়ারি, ১৯৪১

২০

বিশুদাদা—
দীর্ঘবপু, দৃঢ়বাহু, দুঃসহ কর্তব্যে নাহি বাধা,
বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চিত্ত তার
সর্বদেহে তৎপরতা করিছে বিস্তার।
তন্দ্রার আড়ালে
রোগক্লিষ্ট ক্লান্ত রাত্রিকালে
মূর্তিমান শক্তির জাগ্রত রূপ প্রাণে
বলিষ্ঠ আশ্বাস বহি আনে,
নির্নিমেষ নক্ষত্রের মাঝে
যেমন জাগ্রত শক্তি নিঃশব্দ বিরাজে
অমোঘ আশ্বাসে
সুপ্ত রাত্রে বিশ্বের আকাশে।
যখন শুধায় মোরে, দুঃখ কি রয়েছে কোনোখানে
মনে হয়, নাই তার মানে—
দুঃখ মিছে ভ্রম,
আপন পৌরুষে তারে আপনি করিব অতিক্রম।

সেবার ভিতরে শক্তি দুর্বলের দেহে করে দান
বলের সম্মান।

উদয়ন
৯ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২১

চিরদিন আছি আমি অকেজোর দলে ;
বাজে লেখা, বাজে পড়া, দিন কাটে মিথ্যা বাজে ছলে।
যে গুণী কাটাতে পারে বেলা তার বিনা আবশ্যকে
তারে "এসো এসো" বলে যত্ন করে বসাই বৈঠকে।
কেজো লোকদের করি ভয়,
কব্জিতে ঘড়ি বেঁধে শক্ত করে বেঁধেছে সময়—
বাজে খরচের তরে উদ্‌বৃত্ত কিছুই নেই হাতে,
আমাদের মতো কুঁড়ে লজ্জা পায় তাদের সাক্ষাতে।
সময় করিতে নষ্ট আমরা ওস্তাদ,
কাজের করিতে ক্ষতি নানামতো পেতে রাখি ফাঁদ।
আমার শরীরটা যে ব্যস্তদের তফাতে ভাগায়—
আপনার শক্তি নেই, পরদেহে মাশুল লাগায়।
সরোজদাদার দিকে চাই—
সব তাতে রাজি দেখি, কাজকর্ম যেন কিছু নাই,
সময়ের ভাণ্ডারেতে দেওয়া নেই চাবি,
আমার মতন এই অক্ষমের দাবি
মেটাবার আছে তার অক্ষুণ্ণ উদার অবসর,
দিতে পারে অকৃপণ অক্লান্ত নির্ভর।
দ্বিপ্রহর রাত্রিবেলা স্তিমিত আলোকে
সহসা তাহার মূর্তি পড়ে যবে চোখে
মনে ভাবি, আশ্বাসের তরী বেয়ে দূত কে পাঠালে,
দুর্যোগের দুঃস্বপ্ন কাটালে।

দায়হীন মানুষের অভাবিত এই আবির্ভাব
দয়াহীন অদৃষ্টের বন্দীশালে মহামূল্য লাভ।

উদয়ন
৯ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২২

নগাধিরাজের দূর নেবু-নিকুঞ্জের
রসপাত্রগুলি
আনিল এ শয্যাতলে
জনহীন প্রভাতের রবির মিত্রতা,
অজানা নির্ঝরিণীর
বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটার
হিরণ্ময় লিপি,
সুনিবিড় অরণ্যবীথির
নিঃশব্দ মর্মরে বিজড়িত
স্নিগ্ধ হৃদয়ের দৌত্যখানি।
রোগপঙ্গু লেখনীর বিরল ভাষার
ইঙ্গিতে পাঠায় কবি আশীর্বাদ তার।

২৩

নারী তুমি ধন্যা--
আছে ঘর, আছে ঘরকন্না।
তারি মধ্যে রেখেছ একটুখানি ফাঁক।
সেথা হতে পশে কানে বাহিরের দুর্বলের ডাক
নিয়ে এসো শুশ্রূষার ডালি,
স্নেহ দাও ঢালি।
যে জীবলক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি বহমান,
নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান।
সৃষ্টিবিধাতার
নিয়েছ কর্মের ভার,

তুমি নারী
তাঁহারি আপন সহকারী।
উন্মুক্ত করিতে থাক আরোগ্যের পথ,
নবীন করিতে থাক জীর্ণ যে-জগৎ,
শ্রীহারা যে তার 'পরে তোমার ধৈর্যের সীমা নাই,
আপন অসাধ্য দিয়ে দয়া তব টানিছে তারাই।
বুদ্ধিভ্রষ্ট অসহিষ্ণু অপমান করে বারে বারে,
চক্ষু মুছে ক্ষমা কর তারে।
অকৃতজ্ঞতার দ্বারে আঘাত সহিছ দিনরাতি,
লও শির পাতি।
যে অভাগ্য নাহি লাগে কাজে,
প্রাণলক্ষ্মী ফেলে যারে আবর্জনা-মাঝে,
তুমি তারে আনিছ কুড়ায়ে,
তার লাঞ্ছনার তাপ স্নিগ্ধ হস্তে দিতেছ জুড়ায়ে।
দেবতারে যে পূজা দেবার
দুর্ভাগারে কর দান সেই মূল্য তোমার সেবার।
বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্যে বহ চুপে চুপে
মাধুরীর রূপে।
ভ্রষ্ট যেই, ভগ্ন যেই, বিরূপ বিকৃত,
তারি লাগি সুন্দরের হাতের অমৃত।

উদয়ন
১৩ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২৪

অলস শয্যার পাশে জীবন মন্থরগতি চলে,
রচে শিল্প শৈবালের দলে।
মর্যাদা নাইক তার, তবু তাহে রয়
জীবনের স্বল্পমূল্য কিছু পরিচয়।

উদয়ন
২৩ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২৫

বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণীপুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকাসম।
সে আমার মনঃসীমানার
সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে
আকারে হয়েছে ঘনীভূত,
আবর্তন করিতেছে আমার রচনাকক্ষপথে

উদয়ন
৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০। সকাল

২৬

এ কথা সে কথা মনে আসে,
বর্ষাশেষে শরতের মেঘ যেন ফিরিছে বাতাসে।
কাজের বাঁধনহারা শূন্যে করে মিছে আনাগোনা;
কখনো রুপালি আঁকে, কখনো ফুটায়ে তোলে সোনা।
অদ্ভুত মূর্তি সে রচে দিগন্তের কোণে,
রেখার বদল করে পুনঃ পুনঃ যেন অন্যমনে।
বাষ্পের সে শিল্পকাজ যেন আনন্দের অবহেলা—
কোনোখানে দায় নেই, তাই তার অর্থহীন খেলা।
জাগার দায়িত্ব আছে, কাজ নিয়ে তাই ওঠাপড়া।
ঘুমের তো দায়-নেই, এলোমেলো স্বপ্ন তাই গড়া।
মনের স্বপ্নের ধাত চাপা থাকে কাজের শাসনে,
বসিতে পায় না ছুটি স্বরাজ-আসনে।
যেমনি সে পায় ছাড়া খেয়ালে খেয়ালে করে ভিড়,
স্বপ্ন দিয়ে রচে যেন উড়ুক্কু পাখির কোন্ নীড়।
আপনার মাঝে তাই পেতেছি প্রমাণ—
স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান।

তাহারে দমনে রাখে, ধ্রুব করে সৃষ্টির প্রণালী
কর্তৃত্ব প্রচণ্ড বলশালী।
শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে শৃঙ্খলিত করা,
অধরাকে ধরা।

উদয়ন
২৩ জানুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

২৭

বাক্যের যে ছন্দোজাল শিখেছি গাঁথিতে
সেই জালে ধরা পড়ে
অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া
অগোচরে মনের গহনে।
নামে বাঁধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়।
মূল্য তার থাকে যদি
দিনে দিনে হয় তাহা জানা
হাতে হাতে ফিরে।
অকস্মাৎ পরিচয়ে বিস্ময় তাহার
ভুলায় যদি বা,
লোকালয়ে নাহি পায় স্থান,
মনের সৈকততটে বিকীর্ণ সে রহে কিছুকাল,
লালিত যা গোপনের
প্রকাশ্যের অপমানে
দিনে দিনে মিশায় বালুতে।
পণ্যহাটে অচিহ্নিত পরিত্যক্ত রিক্ত এ জীর্ণতা
যুগে যুগে কিছু কিছু দিয়ে গেছে অখ্যাতের দান
সাহিত্যের ভাষা-মহাদ্বীপে
প্রাণহীন প্রবালের মতো।

উদয়ন
৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

২৮

মিলের চুমকি গাঁথি ছন্দের পাড়ের মাঝে মাঝে
অকেজো অলস বেলা ভরে ওঠে শেলাইয়ের কাজে।
অর্থভরা কিছুই-না চোখে করে ওঠে ঝিল্‌মিল্‌
ছড়াটার ফাঁকে ফাঁকে মিল।
গাছে গাছে জোনাকির দল
করে ঝলমল;
সে নহে দীপের শিখা, রাত্রি খেলা করে আঁধারেতে
টুকরো আলোক গেঁথে গেঁথে।
মেঠো গাছে ছোটো ছোটো ফুলগুলি জাগে;
বাগান হয় না তাহে, রঙের ফুটকি ঘাসে লাগে।
মনে থাকে, কাজে লাগে, সৃষ্টিতে সে আছে শত শত;
মনে থাকবার নয়, সেও ছড়াছড়ি যায় কত।
ঝরনায় জল ঝ'রে উর্বরা করিতে চলে মাটি;
ফেনাগুলো ফুটে ওঠে, পরক্ষণে যায় ফাটি ফাটি।
কাজের সঙ্গেই খেলা গাঁথা—
ভার তাহে লঘু রয়, খুশি হন সৃষ্টির বিধাতা।

উদয়ন
২৩ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২৯

এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর আশীর্বাদ,
মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি সুধার আস্বাদ!
দুঃসহ দুঃখের দিনে
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে।
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয় নি দুর্বল পরাভব।
মহত্তম মানুষের স্পর্শ হতে হই নি বঞ্চিত,
তাঁদের অমৃতবাণী অন্তরেতে করেছি সঞ্চিত।

জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে
তাহারি স্মরণলিপি রাখিলাম সকৃতজ্ঞমনে।

উদয়ন
২৮ জানুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

৩০

ধীরে সন্ধ্যা আসে, একে একে গ্রন্থি যত যায় স্খলি
প্রহরের কর্মজাল হতে। দিন দিল জলাঞ্জলি
খুলি পশ্চিমের সিংহদ্বার
সোনার ঐশ্বর্য তার
অন্ধকার-আলোকের সাগরসংগমে।
দূর প্রভাতের পানে নত হয়ে নিঃশব্দে প্রণমে।
চক্ষু তার মুদে আসে, এসেছে সময়
গভীর ধ্যানের তলে আপনার বাহ্য পরিচয়
করিতে মগন।
নক্ষত্রের শান্তিক্ষেত্র অসীম গগন
যেথা ঢেকে রেখে দেয় দিনশ্রীর অরূপ সত্তারে,
সেথায় করিতে লাভ সত্য আপনারে
খেয়া দেয় রাত্রি পারাবারে।

উদয়ন
১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

৩১

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এল,
বিদায়দিনের 'পরে আবরণ ফেলো
অপ্রগল্‌ভ সূর্যাস্ত-আভার ;
সময় যাবার
শান্ত হোক, স্তব্ধ হোক, স্মরণসভার সমারোহ
না রচুক শোকের সম্মোহ।
বনশ্রেণী প্রস্থানের দ্বারে
ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক মৌন পল্লবসম্ভারে।
নামিয়া আসুক ধীরে রাত্রির নিঃশব্দ আশীর্বাদ,
সপ্তর্ষির জ্যোতির প্রসাদ।

৩২

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই,
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই
এক আদি জ্যোতি-উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী ;
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।

৩৩

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক ;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্বমানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।
সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি,
জীবনের জটিল যা বহু নিরর্থক,
মিথ্যার বাহন যাহা সমাজের কৃত্রিম মূল্যেই,
তাই নিয়ে কাঙালের অশান্ত জনতা
দূরে ঠেলে দিয়ে
এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরোবার আগে।

উদয়ন
১১ মাঘ, ১৩৪৭। সন্ধ্যা

জন্মদিনে

১৯৪০ রবীন্দ্রনাথ শ্রীনবীন গান্ধী গৃহীত

জন্মদিনে

১

সেদিন আমার জন্মদিন।
প্রভাতের প্রণাম লইয়া
উদয়দিগন্ত-পানে মেলিলাম আঁখি,
দেখিলাম সত্যস্নাত উষা
আঁকি দিল আলোকচন্দনলেখা
হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে।
যে মহাদূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে
তারি আজ দেখিনু প্রতিমা
গিরীন্দ্রের সিংহাসন-'পরে।
পরম গাম্ভীর্যে যুগে যুগে
ছায়াঘন অজানারে করিছে পালন
পথহীন মহারণ্য-মাঝে,
অভ্রভেদী সুদূরকে রেখেছে বেষ্টিয়া
দুর্ভেদ্য দুর্গমতলে
উদয় অস্তের চক্রপথে।
আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প-মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।

আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।

উদয়ন
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২

বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।
একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে
মোরে এনেছিল বহি
তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে
দিক হতে যেথা দিগন্তরে
শূন্য নীলিমার 'পরে শূন্য নীলিমায়
তটকে করিছে অস্বীকার।
সেদিন দেখিনু ছবি অবিচিত্র ধরণীর—
সৃষ্টির প্রথম রেখাপাতে
জলমগ্ন ভবিষ্যৎ যবে
প্রতিদিন সূর্যোদয়-পানে
আপনার খুঁজিছে সন্ধান।
প্রাণের রহস্য-ঢাকা
তরঙ্গের যবনিকা-'পরে
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম,
এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তূলির টানে টানে
ফোটে নি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।

শুধু করি অনুভব,
চারি দিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে।

উদয়ন
২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

৩

জন্মবাসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে।
একদা গিয়েছি চিন দেশে,
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' ব'লে।
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ;
দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ;
অভাবিত পরিচয়ে
আনন্দের বাঁধ দিল খুলে।
ধরিনু চিনের নাম, পরিনু চিনের বেশবাস।
এ কথা বুঝিনু মনে,
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।
বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে—
বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি,
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা।

উদয়ন
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

৪

আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন।
বসন্তের অজস্র সম্মান
ভরি দিল তরুশাখা কবির প্রাঙ্গণে
নব জন্মদিনের ডালিতে।
রুদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি—
এ বৎসরে বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি, গান গাই বসন্তবাহারে।
আসন্ন বিরহস্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।
জানি, জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।
পুষ্পবীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির ব্যথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া।

উদয়ন
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

৫

জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে—
লক্ষকোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।

এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি ;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রি-অবসানে
মন্থরগমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে ;
নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী ;
অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা—
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ—
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

মংপু
বৈশাখ, ১৩৪৭

২৫।৬

৬

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

মংপু
বৈশাখ, ১৩৪৭

৭

অপরাহ্ণে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।
একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরি
নমস্কারসহ।
ধরণী লভিয়াছিল কোন্ ক্ষণে
প্রস্তর আসনে বসি
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর,
এ পুষ্পের দান,
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি'।

সেই বর, মানুষেরে সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।
নক্ষত্রে-খচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান।

মংপু
বৈশাখ, ১৩৪৭

৮

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ ;
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।
সায়াহ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিমসীমায়।

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্ম মৃত্যু এক হয়ে আছে ;
সে মহিমা উদ্‌বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।

মংপু
বৈশাখ, ১৩৪৭

৯

মোর চেতনায়
আদিসমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায় ;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।

শুধু ছলছল কলকল ;
শুধু সুর, শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল ;
শুধু এ সাঁতার—
কখনো এ পারে চলা, কখনো ও পার,
কখনো বা অদৃশ্য গভীরে,
কভু বিচিত্রের তীরে তীরে।
ছন্দের তরঙ্গদোলে
কত যে ইঙ্গিত ভঙ্গী জেগে ওঠে, ভেসে যায় চলে।
স্তব্ধ মৌনী অচলের বহিয়া ইশারা
নিরন্তর স্রোতোধারা
অজানা সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ
কে জানে উদ্দেশ।
আলোছায়া ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে যায়
ফিরে ফিরে স্পর্শের পর্যায়।
কভু দূরে কখনো নিকটে
প্রবাহের পটে
মহাকাল দুই রূপ ধরে
পরে পরে
কালো আর সাদা।
কেবলি দক্ষিণে বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা
অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে,
গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে।

১০

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন ;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক—
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা-একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়
আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণমেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে;
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ -
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ
নিখিলের সংগীতের স্বাদ।

সব চেয়ে দুর্গম-যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।

এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক্ মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার—
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি।
সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

উদয়ন
২১ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

১১

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধরিল কায়া।
সত্তা আমার, জানি না, সে কোথা হতে
হল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ-মাঝে কেন্দ্র রচিল স্বীয়।

বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি,
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।
ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা,
নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাশের হেলা,
আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে,
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে মুখ-ঢাকা বধূ সেজে,
গলায় পরিয়া হার
বুদ্‌বুদ্‌ মণিকার।
সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ,
অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব।

১২

করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।
বহু ব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়
তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।
নিজেরে করিয়া অবহেলা
নিজেরে নিয়ে সে করে খেলা।
তবু জানি, অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।
সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম,
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

সেই সিন্ধু-মাঝে সূর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা,
সেথা হতে সন্ধ্যাতারা
রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ
যেথা তার রথ

চলেছে সন্ধান করিবারে
নূতন প্রভাত-আলো তমিস্রার পারে।
আজ সব কথা,
মনে হয়, শুধু মুখরতা।
তারা এসে থামিয়াছে
পুরাতন সে মন্ত্রের কাছে
ধ্বনিতেছে যাহা সেই নৈঃশব্দ্যচূড়ায়
সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়।
লোকখ্যাতি যাহার বাতাসে
ক্ষীণ হয়ে তুচ্ছ হয়ে আসে।
দিনশেষে কর্মশালা ভাষা রচনার
নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।
পড়ে থাক্ পিছে
বহু আবর্জনা, বহু মিছে।
বারবার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে।
এই বাহ্য আবরণ, জানি না তো, শেষে
নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন

শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকলকিছু-মাঝে।
প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।
পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি।
সুদূর সম্মুখে সিন্ধু, নিঃশব্দ রজনী,
তারি তীর হতে আমি আপনারি শুনি পদধ্বনি।
অসীম পথের পান্থ, এবার এসেছি ধরা-মাঝে
মর্তজীবনের কাজে।
সে পথের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে অগোচরে
সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।
মন বলে, আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।

উদয়ন
১৯ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

১৩

সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার,
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।

আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।
যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবায়ু,
ভস্মে যার দেহ অন্ত হবে,
যাত্রাপথে সে আপন না ফেলুক ছায়া
সত্যের ধরিয়া ছদ্মবেশ।
এ মর্তের লীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ
পেয়েছি তো ক্ষণে ক্ষণে,
বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।
বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে,
সেই সুন্দরের রূপে,
সে সংগীতে অনির্বচনীয়।
খেলাঘরে আজ যবে খুলে যাবে দ্বার
ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম,
দিয়ে যাব জীবনের সে নৈবেদ্যগুলি
মূল্য যার মৃত্যুর অতীত।

উদয়ন
১১ মাঘ, ১৩৪৭। সকাল

১৪

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ।

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে,
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত স্বরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢঙ ঢঙ,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ।

গৌরীপুরভবন। কালিম্পঙ
২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

১৫

মনে পড়ে, শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটির;
হিমাদ্রি যেথায় তার সমুচ্চ শান্তির
আসনে নিস্তব্ধ নিত্য, তুঙ্গ তার শিখরের সীমা
লঙ্ঘন করিতে চায় দূরতম শূন্যের মহিমা।
অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে;
নিশ্চল সবুজবন্যা, নিবিড় নৈঃশব্দ্যে রাখে ছেয়ে
ছায়াপুঞ্জ তার। শৈলশৃঙ্গ-অন্তরালে
প্রথম অরুণোদয়-ঘোষণার কালে
অন্তরে আনিত স্পন্দ বিশ্বজীবনের
সদ্যস্ফূর্ত চঞ্চলতা। নির্জন বনের
গূঢ় আনন্দের যত ভাষাহীন বিচিত্র সংকেতে
লভিতাম হৃদয়েতে
যে বিস্ময় ধরণীর প্রাণের আদিম সূচনায়।
সহসা নাম-না-জানা পাখিদের চকিত পাখায়
চিন্তা মোর যেত ভেসে
শুভ্রহিমরেখাঙ্কিত মহানিরুদ্দেশে।
বেলা যেত, লোকালয়
তুলিত ত্বরিত করি সুপ্তোত্থিত শিথিল সময়।

গিরিগাত্রে পথ গেছে বেঁকে,
বোঝা বহি চলে লোক, গাড়ি ছুটে চলে থেকে থেকে
পার্বত্য জনতা
বিদেশী প্রাণযাত্রার খণ্ড খণ্ড কথা
মনে যায় রেখে,
রেখা-রেখা অসংলগ্ন ছবি যায় এঁকে।
শুনি মাঝে মাঝে
অদূরে ঘণ্টার ধ্বনি বাজে,
কর্মের দৌত্য সে করে
প্রহরে প্রহরে।
প্রথম আলোর স্পর্শ লাগে,
আতিথ্যের সখ্য জাগে
ঘরে ঘরে। স্তরে স্তরে দ্বারের সোপানে
নানারঙা ফুলগুলি অতিথির প্রাণে
গৃহিণীর যত্ন বহি প্রকৃতির লিপি নিয়ে আসে
আকাশে বাতাসে।
কলহাস্যে মানুষের স্নেহের বারতা
যুগযুগান্তের মৌনে হিমাদ্রির আনে সার্থকতা।

উদয়ন
২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

১৬

দামামা ঐ বাজে,
দিন-বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়,
নইলে কেন এত অপব্যয়—
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়,
অন্যায়েরে টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত
ভবিষ্যতের দূত।

কৃপণতার পাথর-ঠেলা বিষম বন্যাধারা
লোপ করে দেয় নিঃস্ব মাটির নিষ্ফলা চেহারা।
জমে-ওঠা মৃত বালির স্তর
ভাসিয়ে নিয়ে ভর্তি করে লুপ্তির গহ্বর ;
পলিমাটির ঘটায় অবকাশ,
মরুকে সে মেরে মেরেই গজিয়ে তোলে ঘাস।
ডুব্‌লা খেতের পুরানো সব পুনরুক্তি যত
অর্থহারা হয় সে বোবার মতো।
অন্তরেতে মৃত
বাইরে তবু মরে না যে অন্ন ঘরে করেছে সঞ্চিত—
ওদের ঘিরে ছুটে আসে অপব্যয়ের ঝড়,
ভাঁড়ারে ঝাঁপ ভেঙে ফেলে, চালে ওড়ায় খড়।
অপঘাতের ধাক্কা এসে পড়ে ওদের ঘাড়ে,
জাগায় হাড়ে হাড়ে।
হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের তরে আনবে নূতন খেতে।
শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে—
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে, কী রইবে।
পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি,
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।

৩১ মে, ১৯৪০

১৭

সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে
সংবাদে ছিল না মুখরিত
নিস্তব্ধ খ্যাতির যুগে—
আজিকার এইমতো প্রাণযাত্রাকল্লোলিত প্রাতে
যাঁরা যাত্রা করেছেন
মরণশঙ্কিল পথে

আত্মার অমৃত-অন্ন করিবারে দান
দূরবাসী অনাত্মীয় জনে,
দলে দলে যাঁরা
উত্তীর্ণ হন নি লক্ষ্য, তৃষানিদারুণ
মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে,
সমুদ্র যাঁদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া,
অনারব্ধ কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা—
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে-
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজি এই প্রভাত-আলোকে,
তাঁহাদের করি নমস্কার।

উদয়ন
১২ ডিসেম্বর, ১৯৪০। সকাল

১৮

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

১৭

বয়স আমার বুঝি হয়তো তখন হবে বারো,
অথবা কী জানি হবে দুয়েক বছর বেশি আরো।
পুরাতন নীলকুঠি-দোতলার 'পর
ছিল মোর ঘর।
সামনে উধাও ছাত—
দিন আর রাত
আলো আর অন্ধকারে
সাথিহীন বালকের ভাবনারে
এলোমেলো জাগাইয়া যেত,
অর্থশূন্য প্রাণ তারা পেত,
যেমন সম্মুখে নীচে
আলো পেয়ে বাড়িয়া উঠিছে
বেতগাছ ঝোপঝাড়ে
পুকুরের পাড়ে
সবুজের আলপনায় রঙ দিয়ে লেপে।
সারি সারি ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে
নীলচাষ-আমলের প্রাচীন মর্মর
তখনো চলিছে বহি বৎসর বৎসর।
বৃদ্ধ সে গাছের মতো তেমনি আদিম পুরাতন
বয়স-অতীত সেই বালকের মন
নিখিল প্রাণের পেত নাড়া,
আকাশের অনিমেষ দৃষ্টির ডাকে দিত সাড়া,
তাকায়ে রহিত দূরে।
রাখালের বাঁশির করুণ সুরে
অস্তিত্বের যে বেদনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে,
নাড়ীতে উঠিত নেচে।
জাগ্রত ছিল না বুদ্ধি, বুদ্ধির বাহিরে যাহা তাই
মনের দেউড়ি-পারে দ্বারী-কাছে বাধা পায় নাই।

স্বপ্নজনতার বিশ্বে ছিল দ্রষ্টা কিংবা স্রষ্টা রূপে,
পণ্যহীন দিনগুলি ভাসাইয়া দিত চুপে চুপে
পাতার ভেলায়
নিরর্থ খেলায়।
টাট্টু ঘোড়া চড়ি
রথতলা মাঠে গিয়ে দুর্দাম ছুটাত তড়বড়ি,
রক্তে তার মাতিয়ে তুলিত গতি,
নিজেরে ভাবিত সেনাপতি
পড়ার কেতাবে যারে দেখে
ছবি মনে নিয়েছিল এঁকে।
যুদ্ধহীন রণক্ষেত্রে ইতিহাসহীন সেই মাঠে
এমনি সকাল তার কাটে।
জবা নিয়ে গাঁদা নিয়ে নিঙাড়িয়া রস
মিশ্রিত ফুলের রঙে কী লিখিত, সে লেখার যশ
আপন মর্মের মাঝে হয়েছে রঙিন—
বাহিরের করতালিহীন।
সন্ধ্যাবেলা বিশ্বনাথ শিকারীকে ডেকে
তার কাছ থেকে
বাঘশিকারের গল্প নিস্তব্ধ সে ছাতের উপর,
মনে হ'ত, সংসারের সব চেয়ে আশ্চর্য খবর।
দম্ করে মনে মনে ছুটিত বন্দুক,
কাঁপিয়া উঠিত বুক।
চারি দিকে শাখায়িত সুনিবিড় প্রয়োজন যত
তারি মাঝে এ বালক অর্কিড-তরুকার মতো
ডোরাকাটা খেয়ালের অদ্ভুত বিকাশে
দোলে শুধু খেলার বাতাসে।
যেন সে রচয়িতার হাতে
পুঁথির প্রথম শূন্য পাতে
অলংকরণ আঁকা, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কী লেখা,
বাকি সব আঁকাবাঁকা রেখা।

আজ যবে চলিতেছে সাংঘাতিক হিসাবনিকাশ,
দিগ্‌দিগন্তে ক্ষমাহীন অদৃষ্টের দশনবিকাশ,
বিধাতার ছেলেমানুষির
খেলাঘর যত ছিল ভেঙে সব হল চৌচির।
আজ মনে পড়ে সেই দিন আর রাত,
প্রশস্ত সে ছাত,
সেই আলো সেই অন্ধকারে
কর্মসমুদ্রের মাঝে নৈষ্কর্ম্যদ্বীপের পারে
বালকের মনখানা মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক যেন।
এ সংসারে কী হতেছে কেন
ভাগ্যের চক্রান্তে কোথা কী যে,
প্রশ্নহীন বিশ্বে তার জিজ্ঞাসা করে নি কভু নিজে
এ নিখিলে যে জগৎ ছেলেমানুষির
বয়স্কের দৃষ্টিকোণে সেটা ছিল কৌতুকহাসির,
বালকের জানা ছিল না তা।
সেইখানে অবাধ আসন তার পাতা।
সেথা তার দেবলোক, স্বকল্পিত স্বর্গের কিনারা,
বুদ্ধির ভর্ৎসনা নাই, নাই সেথা প্রশ্নের পাহারা,
যুক্তির সংকেত নাই পথে,
ইচ্ছা সঞ্চরণ করে বল্গামুক্ত রথে।

২০

মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী,
অবিশ্রাম সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে
উঠেছে অধীর হয়ে খেপে।
লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবদ্ধ ভাষণ,

ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খলপাশ
সাধুসাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গহাস্যে হানে পরিহাস।
সব ছেড়ে অধিকার করে শুধু শ্রুতি—
বিচিত্র তাদের ভঙ্গী, বিচিত্র আকৃতি।
বলে তারা, আমরা যে এই ধরণীর
নিশ্বসিত পবনের আদিম ধ্বনির
জন্মেছি সন্তান,
যখনি মানবকণ্ঠে মনোহীন প্রাণ
নাড়ীর দোলায় সদ্য জেগেছে নাচিয়া
উঠেছি বাঁচিয়া।
শিশুকণ্ঠে আদিকাব্যে এনেছি উচ্ছলি
অস্তিত্বের প্রথম কাকলি।
গিরিশিরে যে পাগল-ঝোরা
শ্রাবণের দূত, তারি আত্মীয় আমরা
আসিয়াছি লোকালয়ে
সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র লয়ে।
মর্মরমুখর বেগে
যে ধ্বনির কলোৎসব অরণ্যের পল্লবে পল্লবে,
যে ধ্বনি দিগন্তে করে ঝড়ের ছন্দের পরিমাপ,
নিশান্তে জাগায় যাহা প্রভাতের প্রকাণ্ড প্রলাপ,
সে ধ্বনির ক্ষেত্র হতে হরিয়া করেছে পদানত
বন্য ঘোটকের মতো
মানুষ শব্দেরে তার জটিল নিয়মসূত্রজালে
বার্তাবহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে।
বল্গাবদ্ধ শব্দ-অশ্বে চড়ি
মানুষ করেছে দ্রুত কালের মন্থর যত ঘড়ি।
জড়ের অচল বাধা তর্কবেগে করিয়া হরণ
অদৃশ্য রহস্যলোকে গহনে করেছে সঞ্চরণ,
ব্যূহে বাঁধি শব্দ-অক্ষৌহিণী
প্রতি ক্ষণে মূঢ়তার আক্রমণ লইতেছে জিনি।

কখনো চোরের মতো পশে ওরা স্বপ্নরাজ্যতলে,
ঘুমের ভাটার জলে
নাহি পায় বাধা—
যাহা-তাহা নিয়ে আসে, ছন্দের বাঁধনে পড়ে বাঁধা,
তাই দিয়ে বুদ্ধি অন্যমনা
করে সেই শিল্পের রচনা
সূত্র যার অসংলগ্ন স্খলিত শিথিল,
বিধির সৃষ্টির সাথে না রাখে একান্ত তার মিল ;
যেমন মাতিয়া উঠে দশ-বিশ কুকুরের ছানা—
এ ওর ঘাড়েতে চড়ে, কোনো উদ্দেশ্যের নাই মানা,
কে কাহারে লাগায় কামড়,
জাগায় ভীষণ শব্দে গর্জনের ঝড়,
সে কামড়ে সে গর্জনে কোনো অর্থ নাই হিংস্রতার,
উদ্দাম হইয়া উঠে শুধু ধ্বনি শুধু ভঙ্গী তার।
মনে মনে দেখিতেছি, সারা বেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি—
আকাশে আকাশে যেন বাজে,
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।

গৌরীপুরভবন, কালিম্পঙ
২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

২১

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগরগ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে ;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হতে,
রাজ্যসাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে
যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে

সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো,
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর ;
আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে,
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।
অসন্তুষ্ট বিধাতার
ওরা দূত বুঝি,
শত শত বর্ষের পাপের পুঁজি
ছড়াছড়ি করে দেয় এক সীমা হতে সীমান্তরে,
রাষ্ট্রমদমত্তদের মদ্যভাণ্ড চূর্ণ করে
আবর্জনাকুণ্ডতলে।
মানব আপন সত্তা ব্যর্থ করিয়াছে দলে দলে,
বিধাতার সংকল্পের নিত্যই করেছে বিপর্যয়
ইতিহাসময়।
সেই পাপে
আত্মহত্যা-অভিশাপে
আপনার সাধিছে বিলয়।
হয়েছে নির্দয়
আপন ভীষণ শত্রু আপনার 'পরে,
ধূলিসাৎ করে
ভূরিভোজী বিলাসীর
ভাণ্ডারপ্রাচীর।

শ্মশানবিহারবিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি

বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা,
শতস্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি' পান।
এ কুৎসিৎ লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্তমনে—
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

গৌরীপুরভবন, কালিম্পঙ
২২ মে, ১৯৪০।

২২

সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা,
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা।
হতভাগ্য যে রাজ্যের সুবিস্তীর্ণ দৈন্যজীর্ণ প্রাণ
রাজমুকুটেরে নিত্য করিছে কুৎসিত অপমান,
অসহ্য তাহার দুঃখ তাপ
রাজারে না যদি লাগে, লাগে তারে বিধাতার শাপ।
মহা-ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার

শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত—
সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহা দায়।
এক পাখা শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না স্থির,
সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন—
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।

উদয়ন
২৪ জানুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

২৩

জীবনবহনভাগ্য নিত্য আশীর্বাদে
ললাট করুক স্পর্শ
অনাদি জ্যোতির দান-রূপে—
নব নব জাগরণে প্রভাতে প্রভাতে
মর্ত এ আয়ুর সীমানায়।
ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্তলোকের দ্বারে
নিদ্রায়-জড়িত রাত্রিসম।
হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

উদয়ন
৭ পৌষ, ১৩৪৭। সকাল

২৪

পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান—
বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদন হুহু করে,
মরা-দিনের-কবর-দেওয়া ভিতের অন্ধকার
গুমরে ওঠে প্রেতের কণ্ঠে সারা দুপুরবেলা।
মাঠে মাঠে শুকনো পাতার ঘূর্ণিপাকে
হাওয়ার হাঁপানি।
হঠাৎ হানে বৈশাখী তার বর্বরতা
ফাগুনদিনের যাবার পথে।

সৃষ্টিপীড়া ধাক্কা লাগায়
শিল্পকারের তুলির পিছনে।
রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে
রূপের বেদনা
সাথিহারার তপ্ত রাঙা রঙে।
কখনো বা ঢিল লেগে যায় তুলির টানে ;
পাশের গলির চিক-ঢাকা ঐ ঝাপসা আকাশতলে
হঠাৎ যখন রণিয়ে ওঠে
সংকেতঝংকার,
আঙুলের ডগার 'পরে নাচিয়ে তোলে মাতালটাকে।
গোধূলির সিঁদুর ছায়ায় ঝ'রে পড়ে
পাগলা আবেগের
হাউই-ফাটা আগুনঝুরি।

বাধা পায়, বাধা কাটায় চিত্রকরের তুলি।
সেই বাধা তার কখনো বা হিংস্র অশ্লীলতায়,
কখনো বা মদির অসংযমে।
মনের মধ্যে ঘোলা স্রোতের জোয়ার ফুলে ওঠে,
ভেসে চলে ফেনিয়ে-ওঠা অসংলগ্নতা।

রূপের বোঝাই ডিঙি নিয়ে চলল রূপকার
রাতের উজান স্রোত পেরিয়ে
হঠাৎ-মেলা ঘাটে।
ডাইনে বাঁয়ে সুর-বেসুরের দাঁড়ের ঝাপট চলে,
তাল দিয়ে যায় ভাসান-খেলা শিল্পসাধনার।

শান্তিনিকেতন
২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯

২৫

জটিল সংসার,
মোচন করিতে গ্রন্থি জড়াইয়া পড়ি বারংবার।
গম্য নহে সোজা,
দুর্গম পথের যাত্রা স্কন্ধে বহি দুশ্চিন্তার বোঝা।
পথে পথে যথাতথা
শত শত কৃত্রিম বক্রতা।
অনুক্ষণ
হতাশ্বাস হয়ে শেষে হার মানে মন।
জীবনের ভাঙা ছন্দে ভ্রষ্ট হয় মিল,
বাঁচিবার উৎসাহ ধূলিতলে লুটায় শিথিল।

ওগো আশাহারা,
শুষ্কতার 'পরে আনো নিখিলের রসবন্যাধারা।
বিরাট আকাশে,
বনে বনে, ধরণীর ঘাসে ঘাসে,
সুগভীর অবকাশ পূর্ণ হয়ে আছে
গাছে গাছে,
অন্তহীন শান্তি-উৎসস্রোতে।
অন্তঃশীল যে রহস্য আঁধারে আলোতে
তারে সদ্য করুক আহ্বান
আদিম প্রাণের যজ্ঞে মর্মের সহজ সামগান।

আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি,
লুপ্ত হয়ে যাক শূন্যতলে
দ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে।

২৬

ফুলদানি হতে একে একে
আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি পড়িল ঝরে ঝরে
ফুলের জগতে
মৃত্যুর বিকৃতি নাহি দেখি।
শেষ ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের পানে অসুন্দর।
যে মাটির কাছে ঋণী
আপনার ঘৃণা দিয়ে অশুচি করে না তারে ফুল,
রূপে গন্ধে ফিরে দেয় ম্লান অবশেষ।
বিদায়ের সকরুণ স্পর্শ আছে তাহে ;
নাইকো ভৎ‍র্সনা।
জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টিবিনিময়—
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।

উদয়ন
২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

২৭

বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায়
সন্ধ্যা— তারি নীরব নির্দেশে
নিখিল গতির বেগ ধায় তারি পানে।
চৌদিকে ধূসরবর্ণ আবরণ নামে।

মন বলে, ঘরে যাব—
কোথা ঘর নাহি জানে।
দ্বার খোলে সন্ধ্যা নিঃসঙ্গিনী,
সম্মুখে নীরন্ধ্র অন্ধকার।
সকল আলোর অন্তরালে
বিস্মৃতির দূতী
খুলে নেয় এ মর্তের ঋণ-করা সাজসজ্জা যত—
প্রক্ষিপ্ত যা কিছু তার নিত্যতার মাঝে
ছিন্ন জীর্ণ মলিন অভ্যাস।
আঁধারে অবগাহন-স্নানে
নির্মল করিয়া দেয় নবজন্ম নগ্ন ভূমিকারে।
জীবনের প্রান্তভাগে
অন্তিম রহস্যপথে দেয় মুক্ত করি
সৃষ্টির নূতন রহস্যেরে।
নব জন্মদিন তারে বলি
আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে

২৮

নদীর পালিত এই জীবন আমার।
নানা গিরিশিখরের দান
নাড়ীতে নাড়ীতে তার বহে,
নানা পলিমাটি দিয়ে ক্ষেত্র তার হয়েছে রচিত,
প্রাণের রহস্যরস নানা দিক হতে
শস্যে শস্যে লভিল সঞ্চার।
পূর্বপশ্চিমের নানা গীতস্রোতজালে
ঘেরা তার স্বপ্ন জাগরণ।
যে নদী বিশ্বের দূতী
দূরকে নিকটে আনে,
অজানার অভ্যর্থনা নিয়ে আসে ঘরের দুয়ারে,

সে আমার রচেছিল জন্মদিন---
চিরদিন তার স্রোতে
বাঁধন-বাহিরে মোর চলমান বাসা
ভেসে চলে তীর হতে তীরে।
আমি ব্রাত্য, আমি পথচারী,
অবারিত আতিথ্যের অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে
বারে বারে নির্বিচারে মোর জন্মদিবসের থালি।

উদয়ন
২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

২৯

তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ।
তোমাদের আবেষ্টন, চলাফেরা, চারি দিকে ঢেউ ওঠা-পড়া,
সবই চেনা জগতের তবু তার আমন্ত্রণে দ্বিধা—
সবা হতে আমি দূরে, তোমাদের নাড়ীর যে ভাষা
সে আমার আপন প্রাণের, বিষণ্ণ বিস্ময় লাগে
যবে দেখি স্পর্শ তার সসংকোচ পরিচয় নিয়ে
আনে যেন প্রবাসীর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ আত্মীয়তা।
আমি কিছু দিতে চাই, তা না হলে জীবনে জীবনে
মিল হবে কী করিয়া—আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে—
ভয় হয়, রিক্ত পাত্র বুঝি, বুঝি তার রসস্বাদ
হারায়েছে পূর্বপরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে
রবে না সম্মান। তাই আশঙ্কার এ দূরত্ব হতে
এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা-মাঝে তোমাদের ডেকে বলি,
যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে

ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা ;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভশঙ্খধ্বনি।

উদয়ন
৯ মার্চ, ১৯৪১। সকাল

নাটক ও প্রহসন

শ্রাবণগাথা

শ্রাবণগাথা

নটরাজ। মহারাজ, আদেশ করেন যদি, বর্ষার অভ্যর্থনা দিয়ে আজ উৎসবের ভূমিকা করা যাক।

রাজা। ভূমিকার কী প্রয়োজন।

নটরাজ। ধুয়োর যে প্রয়োজন গানে। ঐ ধুয়োটাই অঙ্কুরের মতো ছোটো হয়ে দেখা দেয়, তার পরে শাখায় পল্লবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাজা। আচ্ছা, তা হলে বিলম্বে কাজ নেই।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব-হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
    শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে ;
    নিখিল চিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
    কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
    আনো বীণা মনোহারিকা,
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধুরা,
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে অয়ি ভাবাকুললোচনা
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা,
মেঘমল্লার রাগিণী ;
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিতবিকশিত বয়নে,
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে গন্ধমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত-শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা॥

নটরাজ। ওগো কমলিকা, এখন তবে শুরু করো তোমাদের পালা।

রাজা। কী দিয়ে শুরু করবে।

নটরাজ। বনভূমির আত্মনিবেদন দিয়ে।

রাজা। কার কাছে আত্মনিবেদন।

নটরাজ। আকাশপথে যিনি এসেছেন অতিথি— আবির্ভাব যাঁর অরণ্যের রাসমঞ্চে, পূর্বদিগন্তে উড়েছে যাঁর কেশকলাপ।

সভাকবি। ওহে নটরাজ, আমরা আধুনিক কালের কবি— ফুলকাটা বুলি দিয়ে আমরা কথা কই নে— তুমি যেটা অত করে ঘুরিয়ে বললে, আমরা সেটাকে সাদা ভাষায় বলে থাকি বাদলা।

নটরাজ। বাদলা নামে রাজপথের ধুলোয়, সেটাকে দেয় কাদা ক'রে। বাদলা নামে রাজপ্রহরীদের পাগড়ির 'পরে, তার পাকে পাকে জমিয়ে তোলে কফের প্রকোপ। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি নামেন ধরণীর প্রাণমন্দিরে, বিরহীর মর্মবেদনায়।

রাজা। তোমাদের দেশের লোক কথা জমাতে পারে বটে।

সভাকবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ, অর্থের বড়ো টানাটানি।

নটরাজ। নইলে রাজদ্বারে আসব কোন্ দুঃখে। এইবার শুরু করো।

বাকি আমি রাখব না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।
ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়
গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুঁই।
পুরব-সাগর পার হয়ে যে এলে পথিক তুমি,
আমার সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।
আমার কুলায়-ভরা রয়েছে গান,
সব তোমারেই করেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায় চরণ যখন ছুঁই॥

রাজা। দেখলুম, শুনলুম, লাগল ভালো, কিন্তু বুঝে পড়ে নিতে গেলে পুঁথির দরকার। আছে পুঁথি?

নটরাজ। এই নাও, মহারাজ।

রাজা। তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। এ কি চীনা অক্ষরে লেখা নাকি।

নটরাজ। বলতে পারেন অচিনা অক্ষরে।

রাজা। কিন্তু, রচনা যার সে গেল কোথায়।

নটরাজ। সে পালিয়েছে।

রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। পালাবার তাৎপর্য কী।

নটরাজ। পাছে এখানকার বুদ্ধিমানরা বলেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আরও দুঃখের বিষয়— যদি কিছু না বলে হাঁ করে থাকেন।

সভাকবি। এ তো বড়ো কৌতুক! পাঁজিতে লিখছে পূর্ণিমা, এ দিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ বলে বসে তাঁর আলোটা ঝাপসা।

নটরাজ। বিশল্যকরণীটারই দরকার, গন্ধমাদনটা বাদ দিলেও চলে! না'ই রইলেন কবি, গানগুলো রইল।

সভাকবি। একটা ভাবনার বিষয় রয়ে গেল। গানে স্বয়ং কবিই সুর বসিয়েছেন নাকি।

নটরাজ। তা নয় তো কী। ফুলে যিনি দিয়েছেন রঙ তিনিই লাগিয়েছেন গন্ধ।

সভাকবি। সর্বনাশ! নিজের অধিকারে পেয়ে এবার দেবেন রাগিণীর মাথা হেঁট ক'রে। বাণীকে উপরে চড়িয়ে দিয়ে বীণার ঘটাবেন অপমান।

নটরাজ। অপমান ঘটানো একে বলে না, এ পরিণয় ঘটানো। রাগিণী যতদিন অনূঢ়া ততদিন তিনি স্বতন্ত্র। কাব্যের সঙ্গে বিবাহ হলেই তিনি কবিত্বের ছায়েবানুগতা। সপ্তপদীগমনের সময় কাব্যই যদি রাগিণীর পিছন পিছন চলে, সেটাকে বলব স্ত্রৈণের লক্ষণ। সেটা তোমাদের গৌড়ীয় পারিবারিক রীতি হতে পারে, কিন্তু রসরাজ্যের রীতি নয়।

রাজা। ওহে কবি, কথাটা বোধ হচ্ছে যেন তোমাকেই লক্ষ্য করে। ঘরের খবর জানলে কী করে।

সভাকবি। জনশ্রুতির 'পরে ভার, বানানো কথায় লোকরঞ্জন করা।

রাজা। জনশ্রুতিকে তা হলে কবি আখ্যা দিলে হয়। অলমতিবিস্তরেণ। যথারীতি কাজ আরম্ভ করো।

সভাকবি। আমরা সহ্য করব ওঁদের স্বরবর্ষণ, মহাবীর ভীষ্মের মতো।

নটরাজ। ধরণীর তপস্যা সার্থক হয়েছে, প্রণতি। রুদ্র আজ বন্ধুরূপ ধরেছেন, তাঁর তৃতীয় নেত্রের জ্বলদগ্নি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে শ্যামল জটাভার— প্রসন্ন তাঁর মুখ। প্রথমে সেই বন্ধুদর্শনের আনন্দকে আজ মুখরিত করো।

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর করুণ স্পর্শ নে।
অঝোর-ঝরন শ্রাবণজলে
তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে।

ভরুক গগন, ভরুক কানন, ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলনস্বপন মধুর বেদনা-ভরা।
পরান-ভরানো ঘনছায়াজাল
বাহির আকাশ করুক আড়াল,
নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক পরম দর্শনে।

নমো নমো নম করুণাঘন নম হে।
নয়নস্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জনপরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারসবরষে,
তব দর্শনধনসার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে।
নম হে নম হে॥

সভাকবি। নটরাজ, মহারানী-মাতার কল্যাণে সেদিন রাজবাড়ি থেকে কিছু ভোজ্যপানীয় সংগ্রহ করে নিয়ে আসছিলেম গৃহিণীর ভাণ্ডার-অভিমুখে। মধ্যপথে বাহনটা পড়ল উঁচট খেয়ে, ছড়িয়ে পড়ল মোদক মিষ্টান্ন পথের পাঁকে, গড়িয়ে পড়ল পায়সান্ন ভাঙা হাঁড়ি থেকে নালার মধ্যে। তখন মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে— নৈবেদ্যটা শ্রাবণ স্বয়ং নিয়ে গেলেন ভাসিয়ে। তোমাদের এই প্রণামটাও দেখি সেইরকম। খুবই ছড়িয়েছ বটে, কিন্তু পৌঁছল কোথায় ভেবে পাচ্ছি নে।

নটরাজ। কবিবর, আমাদের প্রণামের রস তোমার হাঁড়িভাঙা পায়েসের রস নয়— ওকে নষ্ট করতে পারবে না কোনো পাঁকের অপদেবতা; সুরের পাত্রে রইল ও চিরকালের মতো, চিরকালের শ্যামল বঁধুর ভোগে বর্ষে বর্ষে ওর অক্ষয় উৎসর্গ।

রাজা। কিছু মনে কোরো না নটরাজ, আমাদের সভাকবি দুঃসহ আধুনিক। হাঁড়িভাঙা পায়েসের রস পাঁকে গড়ালে উনি সেটাকে নিয়ে চৌরপঞ্চশতক রচনা করতে পারেন, কিন্তু তৃপ্তি পান না সেই রসে যার সঙ্গে না আছে জঠরের যোগ, না আছে ভাণ্ডারের। তোমার কাজ অসংকোচে করে যাও, এখানে অন্য শ্রোতাও আছে।

নটরাজ। বনমালিনী, এবার তবে বর্ষাধারাস্নানের আমন্ত্রণ ঘোষণা করে দাও নূপুরের ঝংকারে, নৃত্যের হিল্লোলে। চেয়ে দেখো, শ্রাবণঘনশ্যামলার সিক্ত বেণীবন্ধন দিগন্তে স্খলিত, তার ছায়াবসনাঞ্চল প্রসারিত ঐ তমালতালীবনশ্রেণীর শিখরে শিখরে।

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—
কাজল নয়নে, যূথীমালা গলে,
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।
আজি খনে খনে হাসিখানি সখী,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বনমর্মরে—
ঘন বরিষনে জলকলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥

রাজা। উত্তম। কিন্তু চাঞ্চল্য যেন কিছু বেশি, বর্ষাঋতু তো বসন্ত নয়।

নটরাজ। তা হলে ভিতরে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে পুলক জেগেছে; সে পুলক গভীর, সে প্রশান্ত।

সভাকবি। ঐ তো মুশকিল। ভিতরের দিকে? ও দিকটাতে বাঁধা রাস্তা নেই তো।

নটরাজ। পথ পাওয়া যাবে সুরের স্রোতে। অন্তরাকাশে সজল হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস উঠেছে সেখানে— কার বিরহ জানা নেই। ওগো গীতরসিকা, বিশ্ববেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর,
বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় এ কী রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি॥

রাজা। কী বল হে, কী মনে হচ্ছে তোমার।

সভাকবি। সত্য কথা বলি, মহারাজ। অনেক কবিত্ব করেছি, অমরুশতক পেরিয়ে শান্তিশতকে পৌঁছবার বয়স হয়ে এল— কিন্তু এই যে এঁরা অশরীরী বিরহের কথা বলেন যা নিরবলম্ব, এটা কেমন যেন প্রেতলোকের ব্যাপার ব'লে মনে হয়।

রাজা। শুনলে তো, নটরাজ! একটু মিলনের আভাস লাগাও, অন্তত দূর থেকে আশা পাওয়া যায় এমন আয়োজন করতে দোষ কী।

সভাকবি। ঠিক বলেছেন, মহারাজ। পাত পেড়ে বসলে ওঁদের মতে যদি কবিত্ববিরুদ্ধ হয়, অন্তত রান্নাঘর থেকে গন্ধটা বাতাসে মেলে দিতে দোষ কী।

নটরাজ। বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যা। পেটভরা মিলনে সুর চাপা পড়ে, একটু ক্ষুধা বাকি রাখা চাই, কবিরাজরা এমন কথা ব'লে থাকেন। আচ্ছা, তবে মিলনতরীর সারিগান বিরহবন্যার ও পার থেকে আসুক সজল হাওয়ায়।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল-বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসবসভা-মাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া বরষনে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘনমন্দ্রে ॥

রাজা। এ গানটাতে একটু উৎসাহ আছে। দেখছি, তোমার মৃদঙ্গওয়ালার হাত দুটো অস্থির হয়ে উঠেছে— ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ। এবার তা হলে একটা অশ্রুত গীতচ্ছন্দের মূর্তি দেখা যাক।

সভাকবি। শুনলেন ভাষাটা! অশ্রুত গীত! নিরন্ন ভোজনের আয়োজন!

রাজা। দোষ দিয়ো না, যাদের যেমন রীতি। তোমাদের নিমন্ত্রণে আমিষের প্রাচুর্য।

সভাকবি। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, আমরা আধুনিক, আমিষলোলুপ।

নটরাজ। শ্যামলিয়া, দেহভঙ্গীর নিঃশব্দ গানের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নাচ

রাজা। অতি উত্তম। শূন্যকে পূর্ণ করেছ তুমি। এই নাও পুরস্কার। নটরাজ, তোমাদের পালাগানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি, এতে বিরহের অংশটাই

যেন বেশি। তাতে ওজন ঠিক থাকে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ এক দিকে, একটিমাত্র ফুল এক দিকে—তাতেও ওজন থাকে। অসীম অন্ধকার এক দিকে, একটি তারা এক দিকে—তাতেও ওজনের ভুল হয় না। বিরহের সরোবর হোক-না অকূল, তারই মধ্যে একটিমাত্র মিলনের পদ্মই যথেষ্ট।

সভাকবি। এঁদের দেশের লোক বাচালের সেরা, কথায় পেরে উঠবেন না। আমি বলি সন্ধি করা যাক— ক্ষণকালের জন্যে মিলনও ক্ষান্ত দিক, বিরহও চুপ মেরে থাক্। শ্রাবণ তো মেয়ে নয় মহারাজ, সে পুরুষ, ওঁর গানে সেই পুরুষের মূর্তি দেখিয়ে দিন্-না।

নটরাজ। ভালো বলেছ, কবি। তবে এসো উগ্রসেন, উন্মত্তকে বাঁধো কঠিন ছন্দে, বজ্রকে মঞ্জীর ক'রে নাচুক ভৈরবের অনুচর।

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু,
ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত।
হল রোমাঞ্চিত বনবনান্তর,
দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে
মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথি রে!
সঘনবর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব
করুণ কল্লোলে, কানন শঙ্কিত
ঝিল্লিঝংকৃত॥

রাজা। এই তো নৃত্য! কঠিনের বক্ষপ্লাবী আনন্দের নির্ঝর। এ তো মন ভোলাবার নয়, এ মন দোলাবার।

সভাকবি। কিন্তু এই দুর্দম আবেগ বেশিক্ষণ সইবে না। ঐ দেখুন, আপনার পারিষদের দল নেপথ্যের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কড়াভোগ ওদের গলা দিয়ে নামে না, একটু মিঠুয়া চাই।

রাজা। নটরাজ, শুনলে তো। অতএব কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ।

নটরাজ। প্রস্তুত আছি। তা হলে শ্রাবণপূর্ণিমার লুকোচুরির কথাটা ফাঁস করে দেওয়া যাক।

ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার
আজি রইলে আড়ালে।
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে।
আপনারি মনে জানি নে একেলা
হৃদয়-আঙিনায় করিছ কী খেলা,
তুমি আপনায় খুঁজে কি ফের'
কি তুমি আপনায় হারালে।
এ কি মনে রাখা, এ কি ভুলে যাওয়া,
এ কি স্রোতে ভাসা, এ কি কূলে বাওয়া।
কভু বা নয়ানে কভু বা পরানে
কর' লুকোচুরি কেন-যে কে জানে,
কভু বা ছায়ায় কভু বা আলোয়
কোন্ দোলায়-যে নাড়ালে॥

রাজা। বুঝতে পারলুম না এঁর মনোরঞ্জন হল কিনা। সে অসাধ্য চেষ্টায় প্রয়োজন নেই। আমার অনুরোধ এই, রসের ধারাবর্ষণ যথেষ্ট হয়েছে, এখন রসের ঝোড়ো হাওয়া লাগিয়ে দাও।

নটরাজ। মহারাজ, আপনার সঙ্গে আমারও মনের ভাব মিলছে। এবার শ্রাবণের ভেরীধ্বনি শোনা যাক। সুপ্তকে জাগিয়ে তুলুক, চেতিয়ে তুলুক অন্যমনাকে।

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে—
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্রনাচের তালে।
আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে॥

রাজা। আমার সভাকবিকে বিমর্ষ করে দিয়েছ। তোমাদের এই গানে গানকে

ছাড়িয়ে গানের কবিকে দেখা যাচ্ছে বেশি, ঐখানে ইনি দেখছেন ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। মনে মনে তর্ক করছেন, কী ক'রে আধুনিক ভাষায় এর খুব একটা কর্কশ জবাব দেওয়া যায়। আমি বলি— কাজ নেই, একটা সাদা ভাবের গান সাদা সুরে ধরো, যদি সম্ভব হয় ওঁর মনটা সুস্থ হোক।

নটরাজ। মহারাজের আদেশ পালন করব। আমাদের ভাষায় যতটা সম্ভব সহজ করেই প্রকাশ করব, কিন্তু যত্নেকৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্রদোষঃ। সকরুণা, এই বারিপতনশব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বিচ্ছেদের আশঙ্কাকে সুরের যোগে মধুর করে তোলো।

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে,
তাই ফাগুন-শেষে দিলেম বিদায়।
যখন গেলে তখন ভাসি নয়ননীরে,
এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়।
বাদল-সাঁঝের অন্ধকারে
আপনি কাঁদাই আপনারে,
একা ঝরো ঝরো বারিধারে
ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়।
যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভ'রে আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে
চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু তোমা-হারা বিজন রাতে
কেবল 'হারাই হারাই' বাজে হিয়ায়॥

সভাকবি। নটরাজ, আমার ধারণা ছিল বসন্ত ঋতুরই ধাতটা বায়ুপ্রধান— সেই বায়ুর প্রকোপেই বিরহমিলনের প্রলাপটা প্রবল হয়ে ওঠে। কফপ্রধান ধাত বর্ষার— কিন্তু তোমার পালায় তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। রক্ত হয়েছে তার চঞ্চল। তা হলে বর্ষায় বসন্তে প্রভেদটা কী।

নটরাজ। সোজা কথায় বুঝিয়ে দেব— বসন্তের পাখি গান করে, বর্ষার পাখি উড়ে চলে।

সভাকবি। তোমাদের দেশে এইটেকেই সোজা কথা বলে! আমাদের প্রতি কিছু দয়া থাকে যদি কথাটা আরও সোজা করতে হবে।

নটরাজ। বসন্তে কোকিল ডালপালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বনচ্ছায়াকে সকরুণ করে তোলে— আর বর্ষায় বলাকাই বল, হংসশ্রেণীই বল, উধাও হয়ে মুক্ত পথে চলে শূন্যে— কৈলাসশিখর থেকে বেরিয়ে পড়ে অকূল সমুদ্রতটের দিকে। ভাবনার এই দুই জাত আছে। মুখের তর্ক ছেড়ে সুরের ব্যাখ্যা ধরা যাক। পুরবিকা, ধরো গান।

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি ;
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি গাঁথি।
সুদূরের বাঁশির স্বরে
কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে ;
উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি।
ওদের ঘুম ছুটেছে, ভয় টুটেছে একেবারে ;
অলক্ষেতে লক্ষ্য ওদের, পিছন পানে তাকায় না রে।
যে বাসা ছিল জানা,
সে ওদের দিল হানা,
না জানার পথে ওদের নাই রে মানা ;
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি ॥

নটরাজ। আপনার ঐ সভাকবির মুখখানা কিছুক্ষণ বন্ধ রাখুন। ওঁর গোমুখীবিনিঃসৃত বাক্যনির্ঝর এ দেশের কঠোর শিলাখণ্ডের উপর পাক খেয়ে বেড়াক। আমরা এনেছি সুরলোকের ধারা— আলোকের সভাপ্রাঙ্গণ ধুয়ে দিতে হবে। কাজ শেষ হলেই বিদায় নেব।

রাজা। আচ্ছা নটরাজ, তোমার পথের উপদ্রবকে নিরস্ত রাখব। পাল তুলে চলে যাও।

নটরাজ। মঞ্জুলা, তা হলে হাওয়াটা শোধন করে নিয়ে আর-একবার আবাহন-গান ধরো।

তৃষ্ণার শান্তি,
সুন্দরকান্তি,
তুমি এলে নিখিলের সন্তাপভঞ্জন।

আঁক' ধরাবক্ষে
দিক্‌বধূচক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন।
এলে বীর, ছন্দে—
তব কটিবন্ধে
বিদ্যুৎ-অসিলতা বেজে ওঠে ঝঞ্জন।
তব উত্তরীয়ে
ছায়া দিলে ভরিয়ে
তমালবনশিখরে নবনীল-অঞ্জন।
ঝিল্লির মন্দ্রে
মালতীর গন্ধে
মিলাইলে চঞ্চল মধুকরগুঞ্জন।
নৃত্যের ভঙ্গে
এলে নবরঙ্গে,
সচকিত পল্লবে নাচে যেন খঞ্জন॥

রাজা। ওহে নটরাজ, সভাকবির মুখে আর শব্দমাত্র নেই। এর চেয়ে বড়ো সাধুবাদ আর আশা কোরো না।

সভাকবি। আছে মহারাজ, আছে, বলবার বিষয় আছে— হঠাৎ মুখ বন্ধ করে দেবেন না।

রাজা। আচ্ছা, বলো।

সভাকবি। আমি আধুনিক বটে, কিন্তু নাচ সম্বন্ধে আমি প্রাচীনপন্থী।

রাজা। কী বলতে চাও।

সভাকবি। নৃত্যকলায় দোষ আছে, ওটাকে হেয় করে রাখাই শ্রেয়।

রাজা। কাব্যে কোথাও কোনো দোষ সম্ভব নয় বুঝি! কত কালিদাস এবং অকালিদাস দেখা গেল, ওঁদের শ্লোকগুলোর মধ্যে পাঁক বাঁচিয়ে চলা দায় যে।

সভাকবি। কাব্য বলুন, গীতকলা বলুন, ওরা অভিজাতশ্রেণীয়, ওদের দোষকেও শিরোধার্য করতে হয়। কিন্তু ঐ নৃত্যকলার আভিজাত্য নেই, গৌড়দেশের ব্রাহ্মণরা ওকে অনাচরণীয়া ব'লে থাকেন।

নটরাজ। কবিবর, তোমার গৌড়দেশের সূচনা হবার বহু পূর্বে যখন আদিদেবের

আহ্বানে সৃষ্টি-উৎসব জাগল তখন তার প্রথম আরম্ভ হল আকাশে আকাশে বহ্নিমালার নৃত্যে। সূর্যচন্দ্রের নৃত্য আজও বিরাম পেল না, ষড়্‌ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সুরলোকে আলোক-অন্ধকারের যুগলনৃত্য, নরলোকে অশ্রান্ত নৃত্য জন্মমৃত্যুর, সৃষ্টির আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অগ্নিনটিনী। মানুষের অঙ্গে অঙ্গে স্বর্গের আনন্দকে তরঙ্গিত করবার ভার নিয়েছি আমরাই; তোমাদের মোহাচ্ছন্ন চোখে নির্মল দৃষ্টি জাগাব, নইলে বৃথা আমাদের সাধনা।

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
হাসিকান্না হীরা পান্না দোলে ভালে;
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে;
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ;
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ॥

রাজা। এর উপরে আর কথা চলে না। এখন আমার একটা অনুরোধ আছে। আমি ভালোবাসি কড়া পাকের রস। বর্ষার সবটাই তো কান্না নয়, ওতে আছে ঐরাবতের গর্জন, আছে উচ্চৈঃশ্রবার দৌড়।

নটরাজ। আছে বই কি। এসো তবে বিদ্যুন্ময়ী, শ্রাবণ যে স্বয়ং বজ্রপাণি মহেন্দ্রের সভাসদ্, নৃত্যে সুরে তোমরা তার প্রমাণ করে দাও।

দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা,
কাঁপাও ঝড়ের বুকে এ কী ব্যাকুলতা।
গগনে সে ঘুরে ঘুরে খোঁজে কাছে, খোঁজে দূরে;
সহসা কী হাসি হাস', নাহি কহ কথা।

আঁধার ঘনায় শূন্যে ; নাহি জানে নাম,
কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু দুলিছে দুর্দাম।
অরণ্য হতাশ প্রাণে আকাশে ললাট হানে ;
দিকে দিকে কেঁদে ফিরে কী দুঃসহ ব্যথা ॥

নটরাজ। ওহে ওস্তাদ, তোমার গানের পিছনে পিছনে ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল। গরজত বরখত চমকত বিজুরী। দুই পক্ষের পাল্লা চলুক। সুরে তালে কথায়, আর মেঘে বিদ্যুতে ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণগগন-অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।
দিক্-হারানো দুঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক খসে ;
কিসের বাধা ঘরের কোণে শাসনসীমালঙ্ঘনে।
বেদনা তোর বিজুলশিখা জলুক অন্তরে,
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্রমন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে হবে পথের বাহন ;
শেষ ক'রে দিস আপ্‌নারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে ॥

সভাকবি। ঐ রে ঘুরে ফিরে আবার এসে পড়ল—সেই অজানা, সেই নিরুদ্দেশের পিছনে-ছোটা পাগলামি।

নটরাজ। উজ্জয়িনীর সভাকবিরও ছিল ঐ পাগলামি। মেঘ দেখলেই তাঁকেও পেয়ে বসত অকারণ উৎকণ্ঠা ; তিনি বলেছেন, মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ— এখানকার সভাকবি কি তার প্রতিবাদ করবেন।

সভাকবি। এত বড়ো সাহস নেই আমার। কালিদাসকে নমস্কার ক'রে যথাসাধ্য চেষ্টা করব মেঘ-দেখা হাহুতাশটাকে মনে আনতে।

নটরাজ। আচ্ছা, তবে থাক্ কিছুক্ষণ হাহুতাশ, এখন অন্য কথা পাড়া যাক। মহারাজ, সব চেয়ে যারা ছোটো, উৎসবে সব চেয়ে সত্য তাদেরই বাণী। বড়ো বড়ো শাল তাল তমালের কথাই কবিরা বড়ো করে বলেন— যে কচিপাতাগুলি বন জুড়ে কোলাহল করে তাদের জন্যে স্থান রাখেন অল্পই।

রাজা। সত্য বলেছ, নটরাজ। ক্রিয়াকর্মের দিনে পাড়ার বুড়ো বুড়ো কর্তারা ভাঙা গলায় হাঁকডাক করে, কিন্তু উৎসব জমে ওঠে শিশুদের কলরবে।

নটরাজ। ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলুম। কিশলয়িনী, এসো তুমি শ্রাবণের আসরে।

ওরা অকারণে চঞ্চল ;
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে
নব পল্লবদল।
বাতাসে বাতাসে প্রাণভরা বাণী
শুনিতে পেয়েছে কখন কী জানি,
মর্মরতানে দিকে দিকে আনে কৈশোর-কোলাহল।
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি,
বনে বনে জানাজানি।
ওরা প্রাণ-ঝরনার উচ্ছল ধার
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল ॥

রাজা। সাধু সাধু! কিন্তু নটরাজ, এ হল ললিত চাঞ্চল্য— এবার একটা দুর্ললিত চাঞ্চল্য দেখিয়ে দাও।

নটরাজ। এমন চাঞ্চল্য আছে যাতে বাঁধন শক্ত করে, আবার এমন আছে যাতে শিকল ছেঁড়ে। সেই মুক্তির উদ্‌বেগ আছে শ্রাবণের অন্তরে। এসো তো বিজুলি, এসো বিপাশা।

হা রে, রে রে, রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে—
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণধারা যেমন বাঁধন-হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে।
হা রে, রে রে, রে রে, আমায় রাখবে ধ'রে কে রে—
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে,
বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন- বাধার বক্ষ চেরে ॥

সভাকবি। মহারাজ, আমাদের দুর্বল রুচি, ক্ষীণ আমাদের পরিপাকশক্তি। আমাদের প্রতি দয়ামায়া রাখবেন। জানেন তো, ব্রাহ্মণা মধুরপ্রিয়াঃ। রুদ্ররস রাজন্যদেরই মানায়।

নটরাজ। আচ্ছা, তবে শোনো। কিন্তু বলে রাখছি, রস জোগান দিলেই যে রস ভোগ করা যায় তা নয়, নিজের অন্তরে রসরাজের দয়া থাকা চাই।

মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে বিরহিণী
রক্তে তারি নূপুর বাজে রিনি রিনি।
দুরু দুরু করে হিয়া,
মেঘ উঠে গরজিয়া,
ঝিল্লি ঝনকে ঝিনি ঝিনি।
মন মন-উপবনে ঝরে বারিধারা,
গগনে নাহি শশী তারা।
বিজুলির চমকনে
মিলে আলো খনে খনে,
খনে খনে পথ ভোলে উদাসিনী॥

নটরাজ। অরণ্য আজ গীতহীন, বর্ষাধারায় নেচে চলেছে জলস্রোত বনের প্রাঙ্গণে— যমুনা, তোমরা তারই প্রচ্ছন্ন সুরের নৃত্য দেখিয়ে দাও মহারাজকে।

নাচ

রাজা। তোমার পালা বোধ হচ্ছে শেষের দিকে পৌঁছল— এইবার গভীরে নামো যেখানে শান্তি, যেখানে স্তব্ধতা, যেখানে জীবনমরণের সম্মিলন।

নটরাজ। আমারও মন তাই বলছে।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে,
সপ্তসিন্ধু দিক্‌-দিগন্ত জাগাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান॥

নটরাজ। মহারাজ, রাত্রি অবসানপ্রায়। গানে আপনার অভিনিবেশ কি ক্লান্ত হয়ে এল।

রাজা। কী বলো, নটরাজ! মন অভিষিক্ত হতে সময় লাগে। অন্তরে এখন রস প্রবেশ করেছে। আমার সভাকবির বিরস মুখ দেখে আমার মনের ভাব অনুমান কোরো না। প্রহর গণনা ক'রে আনন্দের সীমানির্ণয়! এ কেমন কথা!

সভাকবি। মহারাজ, দেশকালপাত্রের মধ্যে দেশও অসীম, কালও অসীম, কিন্তু আপনার পাত্রদের ধৈর্যের সীমা আছে। তোরণদ্বার থেকে চতুর্থ প্রহরের ঘণ্টা বাজল, এখন সভাভঙ্গ করলে সেটা নিন্দনীয় হবে না।

রাজা। কিন্তু তৎপূর্বে উষাসমাগমের একটা অভিনন্দন-গান হোক। নইলে ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ হবে। যে-অস্তগমন নব অভ্যুদয়ের আশ্বাস না রেখেই যায় সে তো প্রলয়সন্ধ্যা।

নটরাজ। এ কথা সত্য। তবে এসো অরুণিকা, জাগাও প্রভাতের আগমনী। বিশ্ববেদাতে শ্রাবণের রসদানযজ্ঞ সমাধা হল। শ্রাবণ তার কমণ্ডলু নিঃশেষ করে দিয়ে বিদায়ের মুখে দাঁড়িয়েছে। শরতের প্রথম উষার স্পর্শমণি লেগেছে আকাশে।

দেখো দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে—
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে
ঐ শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়—
আয় আয় আয়॥

নটরাজ। মহারাজ, শরৎ দ্বারের কাছে এসে পৌঁচেছে, এইবার বিদায়গান। রসলোক থেকে আপনার সভাকবি মুক্তি পেলেন বস্তুলোকে।

সভাকবি। অর্থাৎ, অপদার্থ থেকে পদার্থে।

বাদলধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর।

ছাড়ল খেয়া ও পার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,
দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গবন্ধুর।
কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনপথের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া, আকাশ আজি শিশির ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর॥

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

বিজ্ঞপ্তি

এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়

দৃশ্য

মণিপুর-অরণ্য

মণিপুর-প্রাসাদ

পাত্র

অর্জুন

চিত্রাঙ্গদা

সখীগণ

মদন

অর্জুনের বন্যপরিচর

গ্রামবাসীগণ

ভূমিকা

প্রভাতের আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে।
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।
তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে,
বর্ণবৈচিত্র্যে,
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত।
একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,
তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।

এই তত্ত্বটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।
এই নাট্যকাহিনীতে আছে—
প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়॥

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা অভিনয়

নিউ এম্পায়ার, ক
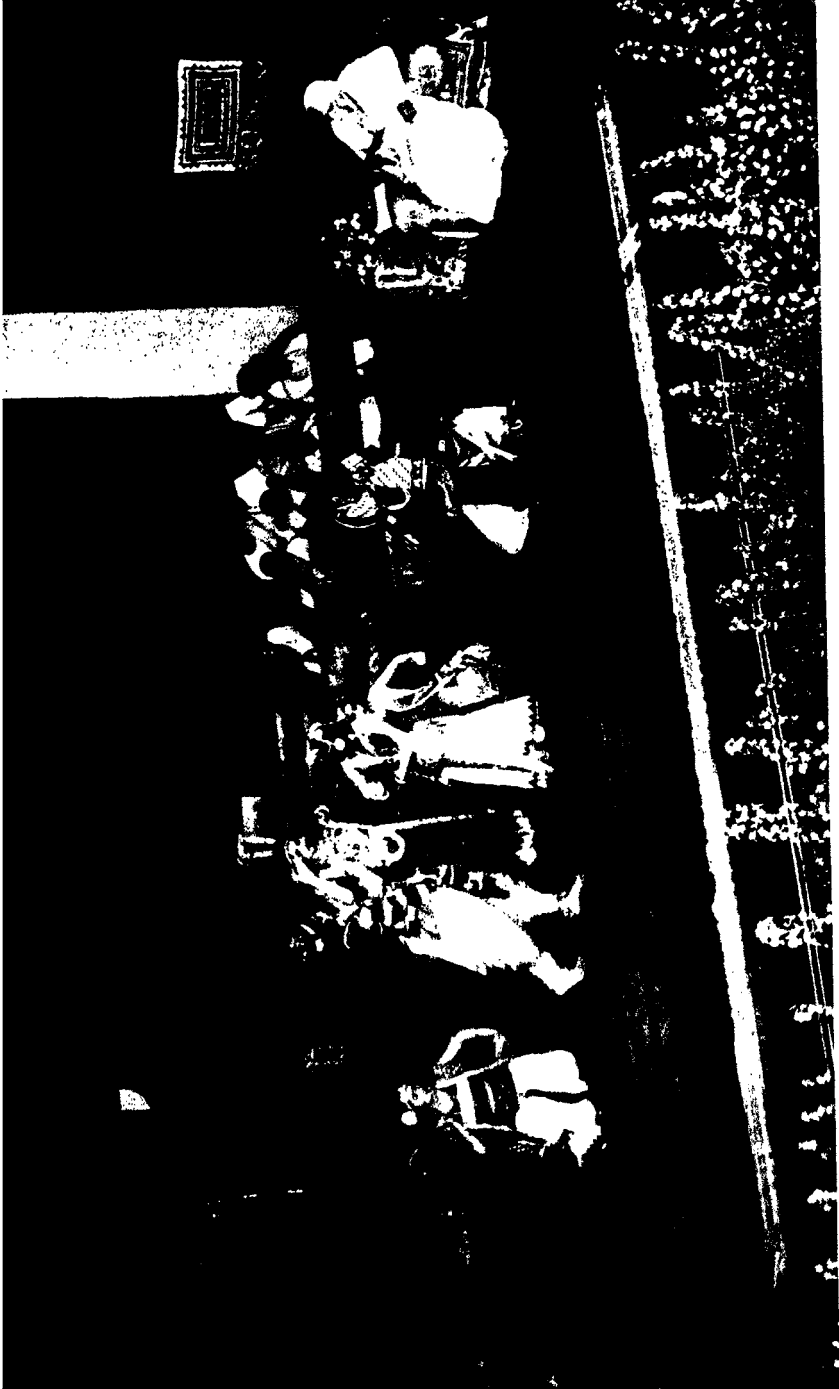
চিত্রাঙ্গদা

মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা; শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি।

অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ ক'রে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

মোহিনী মায়া এল,
এল যৌবনকুঞ্জবনে।
এল হৃদয়শিকারে,
এল গোপন পদসঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণবিজড়িত অন্ধকারে।
পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।
করে বীরের বীর্য-পরীক্ষা,
হানে সাধুর সাধনদীক্ষা,
সর্বনাশের বেড়াজাল বেষ্টিল চারি ধারে।
এসো সুন্দর নিরলংকার,
এসো সত্য নিরহংকার—
স্বপ্নের দুর্গ হানো,
আনো মুক্তি আনো,
ছলনার বন্ধন ছেদি
এসো পৌরুষ-উদ্ধারে॥

১

প্রথম দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার শিকার আয়োজন

গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে,
অরণ্যে তমশ্ছায়া।
মুখর নির্ঝরকলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীরু
হরিণদম্পতি।
চিত্রব্যাঘ্র পদনখচিহ্নরেখাশ্রেণী
রেখে গেছে ঐ পথপঙ্ক-'পরে,
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান।

বনপথে অর্জুন নিদ্রিত

শিকারের বাধা মনে করে চিত্রাঙ্গদার সখী তাঁকে তাড়না করলে

অর্জুন। অহো কী দুঃসহ স্পর্ধা,
অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা
কোথা তার আশ্রয়!

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!

বালকবেশীদের দেখে সকৌতুক অবজ্ঞায়

অর্জুন। হাহা হাহা হাহা হাহা, বালকের দল,
মা'র কোলে যাও চলে, নাই ভয়।
অহো কী অদ্ভুত কৌতুক!

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!
ফিরে এসো, ফিরে এসো,
ক্ষমা দিয়ে কোরো না অসম্মান,
যুদ্ধে করো আহ্বান!

বীর-হাতে মৃত্যুর গৌরব
করি যেন অনুভব—
অর্জুন! তুমি অর্জুন!

হা হতভাগিনী, এ কী অভ্যর্থনা মহতের,
এল দেবতা তোর জগতের,
গেল চলি,
গেল তোরে গেল ছলি—
অর্জুন! তুমি অর্জুন!

সখীগণ। বেলা যায় বহিয়া,
দাও কহিয়া
কোন্ বনে যাব শিকারে।
কাজল মেঘে সজল বায়ে
হরিণ ছুটে বেণুবনচ্ছায়ে।

চিত্রাঙ্গদা। থাক্ থাক্ মিছে কেন এই খেলা আর।
জীবনে হল বিতৃষ্ণা,
আপনার 'পরে ধিক্কার।

আত্ম-উদ্দীপনার গান

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার
শুকনো পাতার ডালে,
এই বরষায় নবশ্যামের
আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন,
যা আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রুধারায়
আজ হয়ে যাক সারা;
যাবার যাহা যাক সে চলে
রুদ্র নাচের তালে।
আসন আমার পাততে হবে
রিক্ত প্রাণের ঘরে,

নবীন বসন পরতে হবে
সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে
কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী
ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বুঝি
মরণ-অন্তরালে ॥

সখী। সখা, কী দেখা দেখিলে তুমি!
এক পলকের আঘাতেই
খসিল কি আপন পুরানো পরিচয়।
রবিকরপাতে
কোরকের আবরণ টুটি
মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে।

চিত্রাঙ্গদা। বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে!
বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যলোকে!
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি,
ছিল মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে,
জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে।
অস্ফুটমঞ্জরী কুঞ্জবনে,
সংগীতশূন্য বিষণ্ণ মনে
সঙ্গীরিক্ত চিরদুঃখরাতি
পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি!
সুন্দর হে, সুন্দর হে,
বরমাল্যখানি তব আনো বহে,
অবগুণ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে ॥

[প্রস্থান

বন্য অনুচরদের সঙ্গে অর্জুনের প্রবেশ ও নৃত্য

২

সখীদের গান

যাও যদি যাও তবে
তোমায় ফিরিতে হবে
ব্যর্থ চোখের জলে
আমি লুটাব না ধূলিতলে,
বাতি নিবায়ে যাব না যাব না
মোর জীবনের উৎসবে।
মোর সাধনা ভীরু নহে,
শক্তি আমার হবে মুক্ত
দ্বার যদি রুদ্ধ রহে।
বিমুখ মুহূর্তেরে করি না ভয়—
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়,
দিনে দিনে হৃদয়ের গ্রন্থি তব
খুলিব প্রেমের গৌরবে॥

সখীসহ স্নানে আগমন

চিত্রাঙ্গদা। শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
চঞ্চল প্রাণ।
ভাসায়ে দিব আপনারে
ভরা জোয়ারে,
সকল ভাবনা-ডুবানো ধারায়
করিব স্নান।
ব্যর্থ বাসনার দাহ
হবে নির্বাণ।
ঢেউ দিয়েছে জলে।
ঢেউ দিল আমার মর্মতলে।

এ কী ব্যাকুলতা আজি আকাশে,
এই বাতাসে
যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয়
করে রোমাঞ্চ দান,
দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে
গুঞ্জরতান ॥

সখীদের প্রতি

দে তোরা আমায় নূতন ক'রে দে
নূতন আভরণে।
হেমন্তের অভিসম্পাতে
রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি ;
বসন্তে হোক দৈন্যবিমোচন
নব লাবণ্যধনে।
শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক
পল্লব-আবরণে।

সখীগণ। বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে
পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে
চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।
আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক
হিল্লোলে হিল্লোলে,
যৌবন পাক্ সম্মান
বাঞ্ছিতসম্মিলনে ॥

[সকলের প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ ও ধ্যানে উপবেশন
তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে চিত্রাঙ্গদার নৃত্য

চিত্রাঙ্গদা। আমি তোমারে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন !

অর্জুন। ক্ষমা করো আমায়,
বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে,
ব্রহ্মচারী ব্রতধারী।

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। হায় হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ
দীর্ঘকাল জীবনে আমার।
ধিক্ ধনুঃশর!
ধিক্ বাহুবল!
মুহূর্তের অশ্রুবন্যাবেগে
ভাসায়ে দিল যে মোর পৌরুষসাধনা।
অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে
বসন্তেরে করিল ব্যাকুল ॥

—

রোদন-ভরা এ বসন্ত
কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো
কিংশুকরক্তিমরাগে।
সখীগণ। তোমার বৈশাখে ছিল
প্রখর রৌদ্রের জালা,
কখন্ বাদল
আনে আষাঢ়ের পালা,
হায় হায় হায়।
চিত্রাঙ্গদা। কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা
সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিখা
কার পথ চেয়ে জাগে।
সখীগণ। কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,
সহসা ঝরনা
নামিল অশ্রুঢালা।
হায় হায় হায়।

চিত্রাঙ্গদা। দক্ষিণসমীরে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত
আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।

সখীগণ। মৃগয়া করিতে
বাহির হল যে বনে
মৃগী হয়ে শেষে
এল কি অবলা বালা।
হায় হায় হায়।

চিত্রাঙ্গদা। আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে,
দেওয়া হল না যে আপনারে
এই ব্যথা মনে লাগে ॥

সখীগণ। যে ছিল আপন
শক্তির অভিমানে
কার পায়ে আনে
হার মানিবার ডালা।
হায় হায় হায় ॥

একজন সখী। ব্রহ্মচর্য!
পুরুষের স্পর্ধা এ যে!
নারীর এ পরাভবে
লজ্জা পাবে বিশ্বের রমণী।
পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয়।
জাগো হে অতনু,
সখীরে বিজয়দূতী করো তব,
নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র দাও তারে,
দাও তারে অবলার বল।

মদনকে চিত্রাঙ্গদার পূজানিবেদন

চিত্রাঙ্গদা। আমার এই রিক্ত ডালি
দিব তোমারি পায়ে।
দিব কাঙালিনীর আঁচল
তোমার পথে পথে বিছায়ে।
যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু
তারি ফুলে ফুলে হে অতনু,
আমার পূজা-নিবেদনের দৈন্য
দিয়ো ঘুচায়ে।
তোমার রণজয়ের অভিযানে
আমায় নিয়ো,
ফুলবাণের টিকা আমার ভালে
এঁকে দিয়ো!
আমার শূন্যতা দাও যদি
সুধায় ভরি
দিব তোমার জয়ধ্বনি
ঘোষণ করি;
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও
আমার কায়ে
দক্ষিণবায়ে॥

মদনের প্রবেশ

মদন। মণিপুরনৃপদুহিতা
তোমারে চিনি,
তাপসিনী।
মোর পূজায় তব ছিল না মন,
তবে কেন অকারণ
মোর দ্বারে এলে তরুণী,
কহো কহো শুনি॥

চিত্রাঙ্গদা। পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা
লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা–

কুসুমধনু,
অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু।
অর্জুন ব্রহ্মচারী
মোর মুখে হেরিল না নারী,
ফিরাইল, গেল ফিরে।
দয়া করো অভাগীরে—
শুধু এক বরষের জন্যে
পুষ্পলাবণ্যে
মোর দেহ পাক্ তব স্বর্গের মূল্য
মর্তে অতুল্য ॥

মদন। তাই আমি দিনু বর,
কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর,
মম পঞ্চম শর—
দিবে মন মোহি,
নারীবিদ্রোহী সন্ন্যাসীরে
পাবে অচিরে,
বন্দী করিবে ভুজপাশে
বিদ্রূপহাসে।
মণিপুররাজকন্যা
কান্তহৃদয়-বিজয়ে হবে ধন্যা।

৩

নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। এ কী দেখি!
এ কে এল মোর দেহে
পূর্ব-ইতিহাসহারা!
আমি কোন্ গত জনমের স্বপ্ন;
বিশ্বের অপরিচিত আমি

আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা,
আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল,
এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু,
তার পরে ধূলিশয্যা,
তার পরে ধরণীর চির-অবহেলা।

সরোবরতীরে

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।
পুষ্পবিকাশের সুরে
দেহ মন উঠে পূরে,
কী মাধুরী সুগন্ধ
বাতাসে যায় ভাসি।
সহসা মনে জাগে আশা,
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।
আজ মম রূপে বেশে
লিপি লিখি কার উদ্দেশে,
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি॥

মীনকেতু,
কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়েছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি।
এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত!
ক্ষণিক যৌবনবন্যা
রক্তস্রোতে তরঙ্গিয়া
উন্মাদ করেছে মোরে।

নূতন কান্তির উত্তেজনায় নৃত্য

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা,
জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা।

বহে মম শিরে শিরে
এ কী দাহ, কী প্রবাহ—
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা।
ঝড়ের পবনগর্জে হারাই আপনায়,
দুরন্ত যৌবনক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়।
তরঙ্গ উঠে প্রাণে
দিগন্তে কাহার পানে,
ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে—
নাহি নাহি কথা॥

[প্রস্থান

এরে ক্ষমা কোরো সখা,
এ যে এল তব আঁখি ভুলাতে,
শুধু ক্ষণকালতরে মোহ-দোলায় দুলাতে,
আঁখি ভুলাতে।
মায়াপুরী হতে এল নাবি,
নিয়ে এল স্বপ্নের চাবি,
তব কঠিন হৃদয়-দুয়ার খুলাতে,
আঁখি ভুলাতে॥

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। কাহারে হেরিলাম!
সে কি সত্য, সে কি মায়া,
সে কি কায়া,
সে কি সুবর্ণকিরণে-রঞ্জিত ছায়া!

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

এসো এসো যে হও সে হও,
বলো বলো তুমি স্বপন নও।
অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা
বহে সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা॥

চিত্রাঙ্গদা। তুমি অতিথি, অতিথি আমার।
বলো কোন্ নামে করি সংকার।
অর্জুন। পাণ্ডব আমি অর্জুন গাণ্ডীবধন্বা,
নৃপতিকন্যা।
লহো মোর খ্যাতি,
লহো মোর কীর্তি,
লহো পৌরুষ-গর্ব।
লহো আমার সর্ব॥
চিত্রাঙ্গদা। কোন্ ছলনা এ যে নিয়েছে আকার,
এর কাছে মানিবে কি হার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।
বীর তুমি বিশ্বজয়ী,
নারী এ যে মায়াময়ী,
পিঞ্জর রচিবে কি
এ মরীচিকার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।
লজ্জা, লজ্জা, হায় এ কী লজ্জা,
মিথ্যা রূপ মোর, মিথ্যা সজ্জা।
এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ,
এ যে শুধু ক্ষণিকের অর্ঘ্য,
এই কি তোমার উপহার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্!
অর্জুন। হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার
সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি।
পৌরুষের সে অধৈর্য
তাহারে গৌরব মানি আমি।
আমি তো আচারভীরু নারী নহি,
শাস্ত্রবাক্যে বাঁধা।
এসো সখা, দুঃসাহসী প্রেম
বহন করুক আমাদের
অজানার পথে।

চিত্রাঙ্গদা। তবে তাই হোক।
কিন্তু মনে রেখো,
কিংশুকদলের প্রান্তে এই যে দুলিছে
একটু শিশির— তুমি যারে করিছ কামনা
সে এমনি শিশিরের কণা
নিমিষের সোহাগিনী।

—

কোন্ দেবতা সে, কী পরিহাসে
ভাসালো মায়ার ভেলায়।
স্বপ্নের সাথি এসো মোরা মাতি
স্বর্গের কৌতুক-খেলায়।
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে
বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে,
নৃত্যবিভঙ্গে,
মাধবীবনের মধুগন্ধে
মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়।
যে ফুলমালা দুলায়েছ আজি
রোমাঞ্চিত বক্ষতলে,
মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া
মোহের মদির জলে।
নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে
বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে,
দিন গত হলে নূতন প্রভাতে
মিলাবে ধুলার তলে
কার অবহেলায়।

অর্জুন। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়।
শুধু একা পূর্ণ তুমি,
সর্ব তুমি,

বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি,
অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি,
এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান,
সব সাধনার তুমি
শেষ পরিণাম।

চিত্রাঙ্গদা। সে আমি যে আমি নই, আমি নই--
হায়, পার্থ, হায়,
সে যে কোন্ দেবের ছলনা।
যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও, বীর।
শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পায়ে—
যাও যাও ফিরে যাও।

[প্রস্থান

অর্জুন। এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ!
এ যে অগ্নিলতা, পাকে পাকে
ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ।
উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে
সর্বাঙ্গ টুটিয়া।

—

অশান্তি আজ হানল এ কী দহনজ্বালা।
বিঁধল হৃদয় নিদয় বাণে
বেদন-ঢালা।
বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা,
চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা,
মরণ-সুতোয় গাঁথল কে মোর
বরণমালা।

চেনা ভুবন হারিয়ে গেল
স্বপন-ছায়াতে,
ফাগুন-দিনের পলাশরঙের
রঙিন মায়াতে।
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা,
পথ-হারানোর লাগল নেশা,
অচিন দেশে এবার আমার
যাবার পালা ॥

৪

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন ;
এ খেলা খেলাবে, হে ভগবন,
আর কতখন।
শেষ যাহা হবেই হবে, তারে
সহজে হতে দাও শেষ।
সুন্দর যাক রেখে স্বপ্নের রেশ।
জীর্ণ কোরো না, কোরো না,
যা ছিল নূতন।

মদন। না না না সখী, ভয় নেই, ভয় নেই—
ফুল যবে সাঙ্গ করে খেলা
ফল ধরে সেই।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ
রেখে যাক মন্ত্রস্পর্শ
নবতর ছন্দস্পন্দন ॥

[প্রস্থান

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশকুসুম-চয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দুখানি নয়নে।
দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে
কি দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে
মোদের মিলিত নয়নে।
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে,
এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো
শুধু দুজনের আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরি বাণীর বেদনা
মিটিল দোঁহার নয়নে ॥

[প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। কেন রে ক্লান্তি আসে আবেশভার বহিয়া।
দেহ মন প্রাণ দিবানিশি জীর্ণ অবসাদে।
ছিন্ন করো এখনি বীর্যবিলোপী এ কুহেলিকা ;
এই কর্মহারা কারাগারে রয়েছ কোন্ পরমাদে।

গ্রামবাসীগণের প্রবেশ

গ্রামবাসীগণ। হো এল এল এল রে দস্যুর দল,
গর্জিয়া নামে যেন বন্যার জল।
চল্ তোরা পঞ্চগ্রামী,
চল্ তোরা কলিঙ্গধামী,

মল্লপল্লী হ'তে চল্,
'জয় চিত্রাঙ্গদা' বল্,
বল্ বল্ ভাই রে—
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে।

অর্জুন। জনপদবাসী, শোনো শোনো,
রক্ষক তোমাদের নাই কোনো?

গ্রামবাসী। তীর্থে গেছেন কোথা তিনি
গোপনব্রতধারিণী,
চিত্রাঙ্গদা তিনি রাজকুমারী।

অর্জুন। নারী! তিনি নারী!

গ্রামবাসীগণ। স্নেহবলে তিনি মাতা,
বাহুবলে তিনি রাজা।
তাঁর নামে ভেরী বাজা,
'জয় জয় জয়' বলো ভাই রে-
ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে॥

—

সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরি দিয়ো কঠিন পরিচয়।

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ !

অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
কেমন না জানি
আমি তাই ভাবি মনে মনে।
শুনি স্নেহে সে নারী
বীর্যে সে পুরুষ,
শুনি সিংহাসনা যেন সে
সিংহবাহিনী।
জান যদি বলো প্রিয়ে,
বলো তার কথা ॥

চিত্রাঙ্গদা। ছি ছি, কুৎসিৎ কুরূপ সে।
হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার,
হেন উজ্জ্বল কজ্জল-আঁখিতারা।
সন্ধিতে পারে লক্ষ্য
কীণাঙ্কিত তার বাহু,
বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ
কুটিল কটাক্ষশরে।
নাহি লজ্জা, নাহি শঙ্কা,
নাহি নিষ্ঠুর সুন্দর রঙ্গ,
নাহি নীরব ভঙ্গীর সংগীতলীলা
ইঙ্গিতছন্দমধুর ॥

অর্জুন। আগ্রহ মোর অধীর অতি—
কোথা সে রমণী বীর্যবতী।
কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা—
দারুণ সে, সুন্দর সে
উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে,
নহে সে ভোগীর লোচনলোভা,
ক্ষত্রিয়বাহুর ভীষণ শোভা ॥

সখীগণ। নারীর ললিত লোভন লীলায়
এখনি কেন এ ক্লান্তি।
এখনি কি সখা, খেলা হল অবসান।
যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল
সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি,
সে কি স্বপ্নের দান,
সে কি সত্যের অপমান।
দূর দুরাশায় হৃদয় ভরিছ,
কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ,
কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ
পৌরুষসন্ধান।
এও কি মায়ার দান।
সহসা মন্ত্রবলে
নমনীয় এই কমনীয়তারে
যদি আমাদের সখী একেবারে
পরের বসন-সমান ছিন্ন
করি ফেলে ধূলিতলে,
সবে না সবে না সে নৈরাশ্য—
ভাগ্যের সেই অট্টহাস্য
জানি জানি সখা, ক্ষুব্ধ করিবে
লুব্ধ পুরুষপ্রাণ,
হানিবে নিঠুর বাণ॥

অর্জুন। যদি মিলে দেখা
তবে তারি সাথে
ছুটে যাব আমি
আর্তত্রাণে।
ভোগের আবেশ হতে
ঝাঁপ দিব যুদ্ধস্রোতে।
আজি মোর চঞ্চল রক্তের মাঝে
ঝনন ঝনন ঝঞ্ঝনা বাজে

চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
একাধারে মিলিত পুরুষ নারী ॥

চিত্রাঙ্গদা। ভাগ্যবতী সে যে,
এত দিনে তার আহ্বান
এল তব বীরের প্রাণে।
আজ অমাবস্যার রাতি
হোক অবসান।
কাল শুভ শুভ্র প্রাতে
দর্শন মিলিবে তার,
মিথ্যায় আবৃত নারী
ঘুচাবে মায়া-অবগুণ্ঠন ॥

অর্জুনের প্রতি

সখী। রমণীর মন ভোলাবার ছলাকলা
দূর ক'রে দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াক নারী,
সরল উন্নত বীর্যবন্ত অন্তরের বলে
পর্বতের তেজস্বী তরুণ তরু-সম,
যেন সে সম্মান পায় পুরুষের।
রজনীর নর্মসহচরী,
যেন হয় পুরুষের কর্মসহচরী,
যেন বামহস্তসম
দক্ষিণহস্তের থাকে সহকারী।
তাহে যেন পুরুষের তৃপ্তি হয়, বীরোত্তম।

চিত্রাঙ্গদা ও মদন

চিত্রাঙ্গদা। লহো লহো ফিরে লহো
তোমার এই বর,
হে অনঙ্গদেব।
মুক্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও

এই মিথ্যার জাল,
হে অনঙ্গদেব।
চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে
তোমার পায়ে
আমার অঙ্গশোভা;
অধররক্ত-রাঙিমা যাক মিলায়ে
অশোকবনে, হে অনঙ্গদেব।
যাক যাক যাক এ ছলনা,
যাক এ স্বপন, হে অনঙ্গদেব॥

মদন। তাই হোক তবে তাই হোক,
কেটে যাক রঙিন কুয়াশা,
দেখা দিক শুভ্র আলোক।
মায়া ছেড়ে দিক পথ,
প্রেমের আসুক জয়রথ,
রূপের অতীত রূপ
দেখে যেন প্রেমিকের চোখ—
দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক
মোহনির্মোক॥

[প্রস্থান

বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে,
আভরণে আজি আবরণ কেন রবে।
ভালোবাসা যদি মেশে মায়াময় মোহে
আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে,
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে—
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে।
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে।
বাহির-বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধুরে।
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে—
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে॥

৬

চিত্রাঙ্গদার সহচর-সহচরীগণ

অর্জুনের প্রতি

এসো এসো পুরুষোত্তম,
এসো এসো বীর মম।
তোমার পথ চেয়ে
আছে প্রদীপ জ্বালা।
আজি পরিবে বীরাঙ্গনার হাতে
দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা।
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার
শক্তির অভিমান,
তোমার চরণে করিবে দান
আত্মনিবেদনের ডালা,
চরণে করিবে দান।
আজ পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার
দৃপ্ত ললাটে সখা,
বীরের বরণমালা।

সখী। হে কৌন্তেয়,
ভালো লেগেছিল ব'লে
তব করযুগে সখী দিয়েছিল ভরি
সৌন্দর্যের ডালি,
নন্দনকানন হতে পুষ্প তুলে এনে
বহু সাধনায়।
যদি সাঙ্গ হল পূজা,
তবে আজ্ঞা করো প্রভু,
নির্মাল্যের সাজি
থাক্ পড়ে মন্দির-বাহিরে।
এইবার প্রসন্ন নয়নে চাও
সেবিকার পানে

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী॥

অর্জুন। ধন্য ধন্য ধন্য আমি।

সমবেত নৃত্য

তৃষ্ণার শান্তি সুন্দরকান্তি
তুমি এসো বিরহের সন্তাপ-ভঞ্জন।
দোলা দাও বক্ষে,
এঁকে দাও চক্ষে
স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন।
এনে দাও চিত্তে
রক্তের নৃত্যে
বকুলনিকুঞ্জের মধুকরগুঞ্জন।
উদ্‌বেল উতরোল
যমুনার কল্লোল,
কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন

আনো নব পল্লবে
নর্তন উল্লোল,
অশোকের শাখা ঘেরি' বল্লরীবন্ধন ॥

—

এসো এসো বসন্ত, ধরাতলে—
আনো মুহু মুহু নব তান,
আনো নব প্রাণ,
নব গান,
আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,
আনো বিশ্বের অন্তরে অন্তরে
নিবিড় চেতনা।
আনো নব উল্লাসহিল্লোল,
আনো আনো আনন্দছন্দের হিন্দোলা
ধরাতলে।
ভাঙো ভাঙো বন্ধনশৃঙ্খল,
আনো আনো উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা
ধরাতলে।
এসো থরথর-কম্পিত
মর্মরমুখরিত
মধু সৌরভপুলকিত
ফুল-আকুল মালতীবল্লীবিতানে
সুখছায়ে মধুবায়ে।
এসো বিকশিত উন্মুখ,
এসো চিরউৎসুক,
নন্দনপথ-চিরযাত্রী।
আনো বাঁশরিমন্ত্রিত মিলনের রাত্রি,
পরিপূর্ণ সুধাপাত্র
নিয়ে এসো।
এসো অরুণচরণ কমলবরন
তরুণ উষার কোলে।

এসো জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
এসো নীরব কুঞ্জকুটীরে,
সুখসুপ্ত সরসানীরে।
এসো তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে,
সিন্ধুতরঙ্গদোলে।
এসো জাগরমুখর প্রভাতে,
এসো নগরে প্রান্তরে বনে,
এসো কর্মে বচনে মনে।
এসো মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে,
এসো গীতমুখর কলকণ্ঠে।
এসো মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে,
এসো কোমল কিশলয়বসনে।
এসো সুন্দর, যৌবনবেগে।
এসো দৃপ্ত বীর, নব তেজে।
ওহে দুর্মদ, করো জয়যাত্রা
জরাপরাভব-সমরে—
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে,
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে

অর্জুন। মা মিং কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিং।
যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্
এবা নিহন্মি তে মনঃ।
চিত্রাঙ্গদা। যথেমে দ্যাবা পৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি সূর্যঃ
এবা পর্যেমি তে মনঃ।
উভয়ে। অক্ষৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি॥

শান্তিনিকেতন
৮ ফাল্গুন, ১৩৪২

মন্ত্রের অনুবাদ

ফুল্ল শাখা যেমন মধুমতী
মধুরা হও তেমনি মোর প্রতি।
বিহঙ্গ যথা উড়িবার মুখে
পাখায় ভূমিরে হানে
তেমনি আমার অন্তরবেগ
লাগুক তোমার প্রাণে।

—

আকাশধরা রবিরে ঘিরি
যেমন করি ফেরে,
আমার মন ঘিরিবে ফিরি
তোমার হৃদয়েরে।

—

আমাদের আঁখি হোক্ মধুসিক্ত,
অপাঙ্গ হয় যেন প্রেমে লিপ্ত।
হৃদয়ের ব্যবধান হোক্ মুক্ত,
আমাদের মন হোক্ যোগযুক্ত।

———

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

চণ্ডালিকা

প্রথম দৃশ্য

একদল ফুলওয়ালি চলেছে ফুল বিক্রি করতে

ফুলওয়ালির দল। নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরি দ্বারে,
আয় আয় আয়,
পরিবি গলার হারে।
লতার বাঁধন হারায়ে মাধবী মরিছে কেঁদে—
বেণীর বাঁধনে রাখিবি বেঁধে,
অলকদোলায় দুলাবি তারে,
আয় আয় আয়।
বনমাধুরী করিবি চুরি
আপন নবীন মাধুরীতে—
সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের
দেহের বীণার তারে তারে,
আয় আয় আয়॥

—

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা
বসন্তের মন্ত্রলিপি।
এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ।
সাহানা রাগিণী এর
রাঙা রঙে রঞ্জিত,
মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুত ছন্দে
গন্ধে তার গুঞ্জরে।

আন্ গো ডালা, গাঁথ্ গো মালা,
আন্ মাধবী মালতী অশোকমঞ্জরী,
আয় তোরা আয়।
আন্ করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা
প্রফুল্ল মল্লিকা,
আয় তোরা আয়।
মালা পর্ গো মালা পর্ সুন্দরী,
ত্বরা কর্ গো ত্বরা কর্।
আজি পূর্ণিমা রাতে জাগিছে চন্দ্রমা,
বকুলকুঞ্জ
দক্ষিণবাতাসে দুলিছে কাঁপিছে
থরথর মৃদু মর্মরি।
নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চরে,
চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে।
দিস নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে
উদাসিনী, হায় রে।
শুভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা,
সুধাপসরা
ধুলায় দেবে শূন্য করি,
শুকাবে বঞ্জুলমঞ্জরী।
চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে
তন্দ্রাহারা পিক-বিরহকাকলী-কূজিত দক্ষিণবায়ে
মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো,
কিংশুকশাখা চঞ্চল হল দুলে দুলে গো॥

প্রকৃতি ফুল চাইতেই তাকে ঘৃণা করে চলে গেল

দইওয়ালার প্রবেশ

দইওয়ালা। দই চাই গো, দই চাই, দই চাই গো?
শ্যামলী আমার গাই,
তুলনা তাহার নাই।

কঙ্কণানদীর ধারে
ভোরবেলা নিয়ে যাই তারে—
দূর্বাদলঘন মাঠে তারে
সারা বেলা চরাই, চরাই গো।
দেহখানি তার চিক্কণ কালো,
যত দেখি তত লাগে ভালো।
কাছে বসে যাই ব'কে,
উত্তর দেয় সে চোখে,
পিঠে মোর রাখে মাথা—
গায়ে তার হাত বুলাই, হাত বুলাই গো॥

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি দই কিনতে চাইল
একজন মেয়ে সাবধান করে দিল

মেয়ে। ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি—
নষ্ট হবে যে দই
সে কথা জানো না কি।

[দইওয়ালার প্রস্থান

চুড়িওয়ালার প্রবেশ

চুড়িওয়ালা। ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে,
এসো এসো দেখো চেয়ে,
এনেছি কাঁকনজোড়া
সোনালি তারে মোড়া।
আমার কথা শোনো,
হাতে লহ প'রে,
যারে রাখিতে চাহ ধ'রে
কাঁকন দুটি বেড়ি হয়ে
বাঁধিবে মন তাহার—
আমি দিলাম কয়ে॥

প্রকৃতি চুড়ি নিতে হাত বাড়াতেই

মেয়েরা। ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।

[চুড়িওয়ালা প্রভৃতির প্রস্থান

প্রকৃতি। যে আমারে পাঠাল এই
অপমানের অন্ধকারে
পূজিব না, পূজিব না সেই দেবতারে পূজিব না।
কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল,
কেন দিব ফুল আমি তারে—
যে আমারে চিরজীবন
রেখে দিল এই ধিক্‌কারে।
জানি না হায় রে কী দুরাশায় রে
পূজাদীপ জ্বালি মন্দিরদ্বারে।
আলো তার নিল হরিয়া
দেবতা ছলনা করিয়া,
আঁধারে রাখিল আমারে॥

পথ বেয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ

ভিক্ষুগণ। যো সন্নিসিন্নো
বরবোধিমূলে,
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধি মাগঞ্ছি অনন্তঞ্ঞাণে
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।

[প্রস্থান

প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ

মা। কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে
নিষ্কারণে—
বেলা বহে যায়, বেলা বহে যায় যে।

রাজবাড়িতে ঐ বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং,
বেলা বহে যায়।
রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো
আঙিনা হয় নি যে নিকোনো,
তোলা হল না জল,
পাড়া হল না ফল,
কখন্ বা চুলো তুই ধরাবি।
কখন্ ছাগল তুই চরাবি।
ত্বরা কর্, ত্বরা কর্, ত্বরা কর্—
জল তুলে নিয়ে তুই চল্ ঘর।
রাজবাড়িতে ঐ বাজে ঘণ্টা
ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং,
ঐ যে বেলা বহে যায়।

প্রকৃতি। কাজ নেই, কাজ নেই মা,
কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়।
যাক ভেসে যাক
যাক ভেসে সব বন্যায়।
জন্ম কেন দিলি মোরে,
লাঞ্ছনা জীবন ভ'রে—
মা হয়ে আনিলি এই অভিশাপ!
কার কাছে বল্ করেছি কোন্ পাপ,
বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্যায়॥

মা। থাক্ তবে থাক্ তুই পড়ে,
মিথ্যা কান্না কাঁদ্ তুই
মিথ্যা দুঃখ গ'ড়ে॥

[প্রস্থান

প্রকৃতির জল তোলা

বুদ্ধশিষ্য আনন্দের প্রবেশ

আনন্দ। জল দাও আমায় জল দাও,
রৌদ্র প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ,
আমায় জল দাও।
আমি তাপিত পিপাসিত,
আমায় জল দাও।
আমি শ্রান্ত,
আমায় জল দাও।

প্রকৃতি। ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে—
আমি চণ্ডালের কন্যা,
মোর কূপের বারি অশুচি।
তোমারে দেব জল হেন পুণ্যের আমি
নহি অধিকারিণী,
আমি চণ্ডালের কন্যা।

আনন্দ। যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা।
সেই বারি তীর্থবারি
যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে,
যাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে
সেই তো পবিত্র বারি।
জল দাও আমায় জল দাও।

জল দান

কল্যাণ হোক তব, কল্যাণী॥

[প্রস্থান

প্রকৃতি। শুধু একটি গণ্ডূষ জল,
আহা নিলেন তাঁহার করপুটের কমলকলিকায়।
আমার কূপ যে হল অকূল সমুদ্র—
এই যে নাচে এই যে নাচে তরঙ্গ তাহার,
আমার জীবন জুড়ে নাচে—

টলোমলো করে আমার প্রাণ,
আমার জীবন জুড়ে নাচে।
ওগো কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরম মুক্তি!
একটি গণ্ডূষ জল—
আমার জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো
শুধু একটি গণ্ডূষ জল॥

মেয়ে পুরুষের প্রবেশ

ফসল কাটার আহ্বান

মাটি তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে—
মরি হায় হায় হায়।
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে,
দিগ্‌বধূরা ফসলখেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে ধরার আঁচলে—
মরি হায় হায় হায়।
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠল জেগে,
পাতায় পাতায় চমক লেগে
বনের খুশি ধরে না গো, ঐ যে উথলে—
মরি হায় হায় হায়॥

প্রকৃতি। ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না।
আমার কাজভোলা মন, আছে দূরে কোন্—
করে স্বপনের সাধনা।
ধরা দেবে না অধরা ছায়া,
রচি গেছে মনে মোহিনী মায়া—
জানি না এ কী দেবতারি দয়া,
জানি না এ কী ছলনা।

আঁধার অঙ্গনে প্রদীপ জ্বালি নি,
দগ্ধ কাননের আমি যে মালিনী,
শূন্য হাতে আমি কাঙালিনী
করি নিশিদিন যাপনা।
যদি সে আসে তার চরণছায়ে
বেদনা আমার দিব বিছায়ে,
জানাব তাহারে অশ্রুসিক্ত
রিক্ত জীবনের কামনা॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্ঘ্য নিয়ে বৌদ্ধনারীদের মন্দিরে গমন

স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নব চম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমুনীন্দ্রের পাদপদ্মতলে।
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বায়ু হল সুগন্ধিত,
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত॥

[প্রস্থান

প্রকৃতি। ফুল বলে, ধন্য আমি
ধন্য আমি মাটির 'পরে।
দেবতা ওগো, তোমার সেবা
আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে,
দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে।
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরোথরো।

চরণপরশ দিয়ো দিয়ো,
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়,
ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে ॥

মা। তুই অবাক ক'রে দিলি আমায় মেয়ে।
পুরাণে শুনি না কি তপ করেছেন উমা
রোদের জ্বলনে,
তোর কি হল তাই।

প্রকৃতি। হাঁ মা, আমি বসেছি তপের আসনে।

মা। তোর সাধনা কাহার জন্যে।

প্রকৃতি। যে আমারে দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে দিয়েছে বাক্।
যে আমারি জেনেছে নাম,
ওগো তারি নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্।
আমি তারি বিচ্ছেদদহনে
তপ করি চিত্তের গহনে।
দুঃখের পাবকে হয়ে যায় শুদ্ধ
অন্তরে মলিন যাহা আছে রুদ্ধ,
অপমান-নাগিনীর খুলে যায় পাক ॥

মা। কিসের ডাক তোর কিসের ডাক।
কোন্ পাতালবাসী অপদেবতার ইশারা
তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে,
আমি মন্ত্র প'ড়ে কাটাব তার মায়া।

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে—
জল দাও, জল দাও।

মা। পোড়া কপাল আমার!
কে বলেছে তোকে 'জল দাও'!
সে কি তোর আপন জাতের কেউ।

প্রকৃতি। হাঁ গো মা, সেই কথাই তো ব'লে গেলেন তিনি,
তিনি আমার আপন জাতের লোক।
আমি চণ্ডালী, সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা,

সে যে দারুণ মিথ্যা।
শ্রাবণের কালো যে মেঘ
তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল',
তা ব'লে কি জাত ঘুচিবে তার,
অশুচি হবে কি তার জল।
তিনি ব'লে গেলেন আমায়,—
নিজেরে নিন্দা কোরো না,
মানবের বংশ তোমার,
মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।
ছি ছি মা, মিথ্যা নিন্দা রটাস নে নিজের,
সে-যে পাপ।
রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য,
আমি সে দাসী নই।
দ্বিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে,
আমি নই চণ্ডালী।

মা। কী কথা বলিস তুই,
আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে।
তোর মুখে কে দিল এমন বাণী।
স্বপ্নে কি কেউ ভর করেছে তোকে
তোর গতজন্মের সাথি।
আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে।

প্রকৃতি। এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম,
নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা,
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায়
মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, জল দাও।

শিউরে উঠল দেহ আমার,
চমকে উঠল প্রাণ।
বল্ দেখি মা,
সারা নগরে কি কোথাও নেই জল !
কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,
আমাকে দিলেন সহসা
মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান।

বলে, দাও জল, দাও জল।
দেব আমি কে দিয়েছে হেন সম্বল।
কালো মেঘ-পানে চেয়ে
এল ধেয়ে
চাতক বিহ্বল—
বলে, দাও জল।
ভূমিতলে হারা
উৎসের ধারা
অন্ধকারে
কারাগারে।
কার সুগভীর বাণী
দিল হানি
কালো শিলাতল—
বলে, দাও জল॥

মা। বাছা, মন্ত্র করেছে কে তোকে,
তোর পথ-চাওয়া মন টান দিয়েছে কে।

প্রকৃতি। সে যে পথিক আমার,
হৃদয়পথের পথিক আমার।
হায় রে আর সে তো এল না এল না,
এ পথে এল না,
আর সে যে চাইল না জল।

আমার হৃদয় তাই হল মরুভূমি,
শুকিয়ে গেল তার রস—
সে যে চাইল না জল।

—

চক্ষে আমার তৃষ্ণা,
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন,
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।
ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়,
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়—
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।
যে ফুল কানন করত আলো,
কালো হয়ে সে শুকালো।
ঝরনারে কে দিল বাধা—
নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে॥

মা। বাছা, সহজ ক'রে বল আমাকে
মন কাকে তোর চায়।
বেছে নিস মনের মতন বর—
রয়েছে তো অনেক আপন জন।
আকাশের চাঁদের পানে
হাত বাড়াস নে।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁরে
আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সম্মান,
ঝরে-পড়া ধুতরো ফুল
ধুলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ করে।
ওগো প্রভু, ওগো প্রভু,
সেই ফুলে মালা গাঁথো,
পরো পরো আপন গলায়,
ব্যর্থ হতে তারে দিয়ো না দিয়ো না।

রাজবাড়ির অনুচরের প্রবেশ

অনুচর। সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো
শেষকালে এই ঠাঁই
ভাগ্যে দেখা পেলেম রক্ষা তাই।

মা। কেন গো কী চাই।

অনুচর। রানীমার পোষা পাখি কোথায় উড়ে গেছে—
সেই নিদারুণ শোকে
ঘুম নেই তাঁর চোখে,
ও চারণের বউ।
ফিরিয়ে এনে দিতেই হবে তোকে,
ও চারণের বউ।

মা। উড়োপাখি আসবে ফিরে
এমন কী গুণ জানি।

অনুচর। মিথ্যে ওজর শুনব না, শুনব না,
শুনবে না তোর রানী।
যাদু ক'রে মন্ত্র প'ড়ে ফিরে আনতেই হবে,
খালাস পাবি তবে,
ও চারণের বউ।

[প্রস্থান

প্রকৃতি। ওগো মা, ঐ কথাই তো ভালো।
মন্ত্র জানিস তুই,
মন্ত্র প'ড়ে
দে তাঁকে তুই এনে।

মা। ওরে সর্বনাশী, কী কথা তুই বলিস—
আগুন নিয়ে খেলা!
শুনে বুক কেঁপে ওঠে,
ভয়ে মরি।

প্রকৃতি। আমি ভয় করি নে মা,
ভয় করি নে।
ভয় করি মা, পাছে

সাহস যায় নেমে,
পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি।
এত বড়ো স্পর্ধা আমার,
এ কী আশ্চর্য!
এই আশ্চর্য সে'ই ঘটিয়েছে—
তারো বেশি ঘটবে না কি,
আসবে না আমার পাশে,
বসবে না আধো-আঁচলে ?

মা। তাঁকে আনতে যদি পারি
মূল্য দিতে পারবি কি তুই তার।
জীবনে কিছুই যে তোর
থাকবে না বাকি।

প্রকৃতি। না, কিছুই থাকবে না, কিছুই থাকবে না,
কিছুই না, কিছুই না।
যদি আমার সব মিটে যায়
সব মিটে যায়,
তবেই আমি বেঁচে যাব যে
চিরদিনের তরে
যখন কিছুই থাকবে না।
দেবার আমার আছে কিছু
এই কথাটাই যে
ভুলিয়ে রেখেছিল সবাই মিলে—
আজ জেনেছি, আমি নই-যে অভাগিনী ;
দেবই আমি, দেবই আমি, দেব,
উজাড় করে দেব আমারে।
কোনো ভয় আর নেই আমার।
পড়্ তোর মন্তর, পড়্ তোর মন্তর,
ভিক্ষুরে নিয়ে আয় অমানিতার পাশে,
সে'ই তারে দিবে সম্মান—
এত মান আর কেউ দিতে কি পারে

মা। বাছা, তুই যে আমার বুকচেরা ধন।
তোর কথাতেই চলেছি
পাপের পথে, পাপীয়সী।
হে পবিত্র মহাপুরুষ,
আমার অপরাধের শক্তি যত
ক্ষমার শক্তি তোমার
আরো অনেক গুণে বড়ো।
তোমারে করিব অসম্মান—
তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম।

প্রকৃতি। আমায় দোষী করো।
ধুলায়-পড়া ম্লান কুসুম
পায়ের তলায় ধরো।
অপরাধে ভরা ডালি
নিজ হাতে করো খালি,
তার পরে সেই শূন্য ডালায়
তোমার করুণা ভরো—
আমায় দোষী করো।
তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ
ধরব তোমায় ফাঁদে
আমার অপরাধে।
আমার দোষকে তোমার পুণ্য
করবে তো কলঙ্কশূন্য—
ক্ষমায় গেঁথে সকল ত্রুটি
গলায় তোমার পরো॥

মা। কী অসীম সাহস তোর, মেয়ে।

প্রকৃতি। আমার সাহস!
তাঁর সাহসের নাই তুলনা।
কেউ যে কথা বলতে পারে নি
তিনি ব'লে দিলেন কত সহজে—
জল দাও।

ঐ একটু বাণী—
তার দীপ্তি কত ;
আলো ক'রে দিল আমার সারা জন্ম।
বুকের উপর কালো পাথর চাপা ছিল যে,
সেটাকে ঠেলে দিল—
উথলি উঠল রসের ধারা।

মা। ওরা কে যায়
পীতবসন-পরা সন্ন্যাসী।

বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল

ভিক্ষুগণ। নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়,
নমো নমো গোতমচন্দিমায়,
নমো নমো নন্তগুণণ্নবায়,
নমো নমো সাকিয়নন্দনায়।

প্রকৃতি। মা, ঐ যে তিনি চলেছেন
সবার আগে আগে!
ফিরে তাকালেন না, ফিরে তাকালেন না—
তাঁর নিজের হাতের এই নূতন সৃষ্টিরে
আর দেখিলেন না চেয়ে!
এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর
আপন রে!
হতভাগিনী, কে তোরে আনিল আলোতে
শুধু এক নিমেষের জন্যে!
থাকতে হবে তোকে মাটিতেই
সবার পায়ের তলায়।

মা। ওরে বাছা, দেখতে পারি নে তোর দুঃখ—
আনবই আনবই, আনবই তারে
মন্ত্র প'ড়ে।

প্রকৃতি। পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র,

পাকে পাকে দাগ দিয়ে
জড়ায়ে ধরুক ওর মনকে।
যেখানেই যাক,
কখনো এড়াতে আমাকে
পারবে না, পারবে না।

আকর্ষণীমন্ত্রে যোগ দেবার জন্যে মা
তার শিষ্যাদলকে ডাক দিল

মা। আয় তোরা আয়,
আয় তোরা আয়।

তাদের প্রবেশ
ও নৃত্য

যায় যদি যাক সাগরতীরে—
আবার আসুক, আসুক ফিরে।
রেখে দেব আসন পেতে
হৃদয়েতে।
পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব
অশ্রুনীরে।
যায় যদি যাক শৈলশিরে—
আসুক ফিরে, আসুক ফিরে।
লুকিয়ে রব গিরিগুহায়,
ডাকব উহায়—
আমার স্বপন ওর জাগরণ
রইবে ঘিরে॥

মায়ের মায়ানৃত্য

মা। ভাবনা করিস নে তুই—
এই দেখ্ মায়াদর্পণ আমার,
হাতে নিয়ে নাচবি যখন

দেখতে পাবি তাঁর কী হল দশা।
এইবার এসো এসো রুদ্রভৈরবের সন্তান,
জাগাও তাণ্ডবনৃত্য। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মায়ের মায়ানৃত্য

প্রকৃতি। ঐ দেখ্ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো,
মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে—
উড়ে যাবে শুষ্ক সাধনা সন্ন্যাসীর
শুকনো পাতার মতন।
নিববে বাতি, পথ হবে অন্ধকার,
ঝড়ে-বাসা-ভাঙা পাখি
ঘুরে ঘুরে পড়বে এসে মোর দ্বারে।
দুরু দুরু করে মোর বক্ষ,
মনের মাঝে ঝিলিক দিতেছে বিজুলি।
দূরে যেন ফেনিয়ে উঠেছে সমুদ্র—
তল নেই, কূল নেই তার।
মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে।

মা। এইবার আয়নার সামনে নাচ্ দেখি তুই,
দেখ্ দেখি কী ছায়া পড়ল।

প্রকৃতির নৃত্য

প্রকৃতি। লজ্জা ছি ছি লজ্জা!
আকাশে তুলে দুই বাহু
অভিশাপ দিচ্ছেন কাকে।
নিজেরে মারছেন বহ্নির বেত্র,
শেল বিঁধছেন যেন আপনার মর্মে।

মা। ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি যদি,
শেষে তোর কী হবে দশা।

প্রকৃতি। আমি দেখব না, আমি দেখব না,
আমি দেখব না তোর দর্পণ।
বুক ফেটে যায়, যায় গো,
বুক ফেটে যায়।
কী ভয়ংকর দুঃখের ঘূর্ণিঝঞ্ঝা—
মহান বনস্পতি ধুলায় কি লুটাবে,
ভাঙবে কি অভ্রভেদী তার গৌরব।
দেখব না, আমি দেখব না তোর দর্পণ।
না না না।

মা। থাক্ তবে থাক্ এই মায়া।
প্রাণপণে ফিরিয়ে আনব মোর মন্ত্র—
নাড়ী যদি ছিঁড়ে যায় যাক,
ফুরায়ে যায় যদি যাক নিশ্বাস।

প্রকৃতি। সেই ভালো মা, সেই ভালো।
থাক্ তোর মন্ত্র, থাক্ তোর—
আর কাজ নাই, কাজ নাই, কাজ নাই।

না না না, পড়্ মন্ত্র তুই, পড়্ তোর মন্ত্র—
পথ তো আর নেই বাকি।
আসবে সে, আসবে সে, আসবে,
আমার জীবনমৃত্যু-সীমানায় আসবে।
নিবিড় রাত্রে এসে পৌঁছবে পান্থ,
বুকের জ্বালা দিয়ে আমি
জ্বালিয়ে দিব দীপখানি—
সে আসবে।

—

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার।
স্নান করাব অতল জলে
বিপুল বেদনার।

মোর সংসার দিব যে জ্বালি,
শোধন হবে এ মোহের কালি—
মরণব্যথা দিব তোমার
চরণে উপহার ॥

মা। বাছা, মোর মন্ত্র আর তো বাকি নেই,
প্রাণ মোর এল কণ্ঠে।

প্রকৃতি। মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে যেন
টলেছে আসন তাঁহার।
ঐ আসছে, আসছে, আসছে।
যা বহু দূরে, যা লক্ষ যোজন দূরে,
যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে,
ঐ আসছে, আসছে, আসছে—
কাঁপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে।

মা। বল্ দেখি বাছা, কী তুই দেখছিস আয়নায়।

প্রকৃতি। ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে,
চারি দিকে বিদ্যুৎ চমকে।
অঙ্গ ঘিরে ঘিরে তাঁর
অগ্নির আবেষ্টন,
যেন শিবের ক্রোধানলদীপ্তি।
তোর মন্ত্রবাণী ধরি কালীনাগিনীমূর্তি
গর্জিছে বিষনিশ্বাসে,
কলুষিত করে তাঁর পুণ্যশিখা।

আনন্দের ছায়া-অভিনয়

মা। ওরে পাষাণী,
কী নিষ্ঠুর মন তোর,
কী কঠিন প্রাণ,
এখনো তো আছিস বেঁচে।

প্রকৃতি। ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া,
তার নাই ভয়, নাই লজ্জা।

নিষ্ঠুর পণ আমার,
আমি মানব না হার, মানব না হার—
বাঁধব তাঁরে মায়াবাঁধনে,
জড়াব আমারি হাসি-কাঁদনে।
ঐ দেখ্, ঐ নদী হয়েছেন পার—
একা চলেছেন ঘন বনের পথে।
যেন কিছু নাই তাঁর চোখের সম্মুখে—
নাই সত্য, নাই মিথ্যা ;
নাই ভালো, নাই মন্দ।

মাকে নাড়া দিয়ে

দুর্বল হোস নে হোস নে,
এইবার পড়্ তোর শেষনাগমন্ত্র—
নাগপাশ-বন্ধনমন্ত্র।
মা। জাগে নি এখনো জাগে নি
রসাতলবাসিনী নাগিনী।
বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাঁশি, বাজ্ রে
মহাভীমপাতালী রাগিণী,
জেগে ওঠ্ মায়াকালী নাগিনী—
ওরে মোর মন্ত্রে কান দে—
টান দে, টান দে, টান দে, টান দে।
বিষগর্জনে ওকে ডাক দে—
পাক দে, পাক দে, পাক দে, পাক দে।
গহ্বর হতে তুই বার হ,
সপ্তসমুদ্র পার হ।
বেঁধে তারে আন্ রে—
টান্ রে, টান্ রে, টান্ রে, টান্ রে।
নাগিনী জাগল, জাগল, জাগল—
পাক দিতে ঐ লাগল, লাগল, লাগল—
মায়াটান ঐ টানল, টানল, টানল।

বেঁধে আনল, বেঁধে আনল, বেঁধে আনল ॥

এইবার নৃত্যে করো আহ্বান—
ধর্ তোরা গান।
আয় তোরা যোগ দিবি আয়
যোগিনীর দল।
আয় তোরা আয়,
আয় তোরা আয়,
আয় তোরা আয়।

সকলে। ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন,
তেমনি উঠে এসো এসো।
শমীশাখার বক্ষ হতে যেমন জ্বলে অগ্নি,
তেমনি তুমি এসো এসো।
ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি
যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ,
তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে,
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো।
আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়,
যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো।
সুদূর হিমগিরির শিখরে
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ,
প্রখর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে
বন্যাধারা যেমন নেমে আসে—
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো ॥

মা। আর দেরি করিস নে, দেখ্ দর্পণ—
আমার শক্তি হল যে ক্ষয়।

প্রকৃতি। না, দেখব না আমি দেখব না,
আমি শুনব—

মনের মধ্যে আমি শুনব,
ধ্যানের মধ্যে আমি শুনব,
তাঁর চরণধ্বনি।
ঐ দেখ্ এল ঝড়, এল ঝড়,
তাঁর আগমনীর ঐ ঝড়—
পৃথিবী কাঁপছে থরো থরো থরো থরো,
গুরু গুরু করে মোর বক্ষ।

মা। তোর অভিশাপ নিয়ে আসে
হতভাগিনী।

প্রকৃতি। অভিশাপ নয় নয়,
অভিশাপ নয় নয়—
আনছে আমার জন্মান্তর,
মরণের সিংহদ্বার ঐ খুলছে।
ভাঙল দ্বার,
ভাঙল প্রাচীর,
ভাঙল এ জন্মের মিথ্যা।
ওগো আমার সর্বনাশ,
ওগো আমার সর্বস্ব,
তুমি এসেছ
আমার অপমানের চূড়ায়।
মোর অন্ধকারের ঊর্ধ্বে রাখো
তব চরণ জ্যোতির্ময়।

মা। ও নিষ্ঠুর মেয়ে,
আর যে সহে না, সহে না, সহে না।

প্রকৃতি। ওমা, ওমা, ওমা,
ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র
এখনি এখনি এখনি।
ও রাক্ষুসী, কী করলি তুই,
কী করলি তুই—
মরলি নে কেন, পাপীয়সী।

কোথা আমার সেই দীপ্ত সমুজ্জ্বল
শুভ্র সুনির্মল
সুদূর স্বর্গের আলো।
আহা কী ম্লান, কী ক্লান্ত—
আত্মপরাভব কী গভীর।
যাক যাক যাক,
সব যাক, সব যাক—
অপমান করিস নে বীরের,
জয় হোক তাঁর,
জয় হোক তাঁর,
জয় হোক।

আনন্দের প্রবেশ

প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়,
দিলে তার এত মূল্য,
নিলে তার এত দুঃখ।
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—
মাটিতে টেনেছি তোমারে,
এনেছি নীচে,
ধূলি হতে তুলি নাও আমায়
তব পুণ্যলোকে।
ক্ষমা করো।
জয় হোক তোমার জয় হোক।

আনন্দ। কল্যাণ হোক তব, কল্যাণী।

সকলে বুদ্ধকে প্রণাম

সকলে। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো,
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর ঞানলোচনো
লোকস্স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেণ তং॥

শ্যামা

২৫।১৩

শ্যামা

প্রথম দৃশ্য

বজ্রসেন ও তাহার বন্ধু

বন্ধু। তুমি ইন্দ্রমণির হার
এনেছ সুবর্ণ দ্বীপ থেকে—
রাজমহিষীর কানে যে তার খবর
দিয়েছে কে।
দাও আমায়, রাজবাড়িতে দেব বেচে
ইন্দ্রমণির হার—
চিরদিনের মতো তুমি যাবে বেঁচে।

বজ্রসেন। না না না বন্ধু,
আমি অনেক করেছি বেচাকেনা,
অনেক হয়েছে লেনাদেনা—
না না না,
এ তো হাটে বিকোবার নয় হার—
না না না।
কণ্ঠে দিব আমি তারি
যারে বিনা মূল্যে দিতে পারি—
ওগো আছে সে কোথায়,
আজো তারে হয় নাই চেনা।
না না না, বন্ধু।

বন্ধু। জান না কি
পিছনে তোমার রয়েছে রাজার চর।

বজ্রসেন। জানি জানি, তাই তো আমি
চলেছি দেশান্তর।

এ মানিক পেলেম আমি অনেক দেবতা পূজে,
বাধার সঙ্গে যুঝে—
এ মানিক দেব যারে অমনি তারে পাব খুঁজে,
চলেছি দেশ-দেশান্তর ॥

বন্ধু দূরে প্রহরীকে দেখতে পেয়ে বজ্রসেনকে মালা-সমেত পালাতে বলল

কোটালের প্রবেশ

কোটাল। থামো থামো,
কোথায় চলেছ পালায়ে
সে কোন্ গোপন দায়ে।
আমি নগর-কোটালের চর।

বজ্রসেন। আমি বণিক, আমি চলেছি
আপন ব্যবসায়ে,
চলেছি দেশান্তর।

কোটাল। কী আছে তোমার পেটিকায়।

বজ্রসেন। আছে মোর প্রাণ, আছে মোর শ্বাস।

কোটাল। খোলো, খোলো, বৃথা কোরো না পরিহাস।

বজ্রসেন। এই পেটিকা আমার বুকের পাঁজর যে রে—
সাবধান! সাবধান! তুমি ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না এরে।
তোমার মরণ, নয় তো আমার মরণ—
যমের দিব্য করো যদি এরে হরণ—
ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।

[বজ্রসেনের পলায়ন

সেই দিকে তাকিয়ে

কোটাল। ভালো ভালো তুমি দেখব পালাও কোথা।
মশানে তোমার শূল হয়েছে পোঁতা—
এ কথা মনে রেখে
তোমার ইষ্টদেবতারে স্মরিয়ো এখন থেকে ॥

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামার সভাগৃহে কয়েকটি সহচরী বসে আছে

নানা কাজে নিযুক্ত

সখীরা। হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব—
নীরবে জাগ একাকী শূন্য মন্দিরে,
কোন্ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া।
স্বপনরূপিণী অলোকসুন্দরী
অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী,
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়মাঝারে॥

উত্তীয়ের প্রবেশ

সখীরা। ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও
বহিয়া বিফল বাসনা।
চিরদিন আছ দূরে
অজানার মতো নিভৃত অচেনা পুরে।
কাছে আস তবু আস না,
বহিয়া বিফল বাসনা।
পারি না তোমায় বুঝিতে—
ভিতরে কারে কি পেয়েছ,
বাহিরে চাহ না খুঁজিতে।
না-বলা তোমার বেদনা যত
বিরহপ্রদীপে শিখার মতো,
নয়নে তোমার উঠেছে জ্বলিয়া
নীরব কী সম্ভাষণা॥

উত্তীয়। মায়াবনবিহারিণী হরিণী
গহনস্বপনসঞ্চারিণী,
কেন তারে ধরিবারে করি পণ
অকারণ।

থাক্ থাক্, নিজ-মনে দূরেতে,
আমি শুধু বাঁশরির সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন
অকারণ ॥

সখীরা। হতাশ হোয়ো না, হোয়ো না,
হোয়ো না, সখা।
নিজেরে ভুলায়ে লোয়ো না, লোয়ো না।
আঁধার গুহাতলে।

উত্তীয়। চমকিবে ফাগুনের পবনে,
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে,
চিত্ত আকুল হবে অনুখন
অকারণ।
দূর হতে আমি তারে সাধিব,
গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব—
বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন
অকারণ ॥

সখীরা। হবে সখা, হবে তব হবে জয়—
নাহি ভয়, নাহি ভয়, নাহি ভয়।
হে প্রেমিকতাপস, নিঃশেষে আত্ম-আহুতি
ফলিবে চরম ফলে ॥

[প্রস্থান

সখীসহ শ্যামার প্রবেশ

সখী। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
হে গরবিনী।
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা—
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি,
হে গরবিনী।
মনের মানুষ লুকিয়ে আসে,
দাঁড়ায় পাশে, হায়—

হেসে চলে যায় জোয়ারজলে
ভাসিয়ে ভেলা,
দুর্লভ ধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি,
হে গরবিনী।
ফাগুন্ যখন যাবে গো নিয়ে
ফুলের ডালা,
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার
বরণমালা।
বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায়
কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়পথে চরণ-ফেলা দিনযামিনী,
হে গরবিনী॥

শ্যামা। ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই—
কোথা সে যে আছে সংগোপনে,
প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে।
এসো মম সার্থক স্বপ্ন,
করো মোর যৌবন সুন্দর,
দক্ষিণবায়ু আনো পুষ্পবনে।
ঘুচাও বিষাদের কুহেলিকা,
নবপ্রাণমন্ত্রের আনো বাণী।
পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা
আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা—
শূন্যে পথহারা পবনের ছন্দে,
ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে॥

সখীদের নৃত্যচর্চা, শেষে শ্যামার সজ্জা-সাধন, এমন সময়

বজ্রসেন ছুটে এল। পিছনে কোটাল

কোটাল। ধর্ ধর্ ঐ চোর, ঐ চোর।

বজ্রসেন। নই আমি নই চোর, নই চোর, নই চোর—
অন্যায় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে
কোটাল। ঐ বটে, ঐ চোর, ঐ চোর, ঐ চোর।

[প্রস্থান

বজ্রসেন যে দিকে গেল শ্যামা সে দিকে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল

শ্যামা। আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।
শীঘ্র যা লো সহচরী, যা লো, যা লো—
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।
বন্দী সাথে লয়ে একবার
আসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি॥

[শ্যামা ও সখীদের প্রস্থান

সখী। সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
ঘুচাবে কে।
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে
মুছাবে কে।
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা—
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে,
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।

[সহচরীর প্রস্থান

বজ্রসেন ও কোটাল-সহ শ্যামার পুনঃ প্রবেশ

শ্যামা। তোমাদের এ কী ভ্রান্তি—
কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি,
প্রহরী, মরি মরি।

এমন করে কি ওকে বাঁধে।
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে।
কোটাল। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে,
চোর চাই যে করেই হোক।
হোক-না সে যেই-কোনো লোক, চোর চাই।
নহিলে মোদের যাবে মান!
শ্যামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,
দুই দিন মাগিনু সময়।
কোটাল। রাখিব তোমার অনুনয়;
দুই দিন কারাগারে রবে,
তার পর যা হয় তা হবে।
বজ্রসেন। এ কী খেলা হে সুন্দরী,
কিসের এ কৌতুক।
দাও অপমান-দুখ—
মোরে নিয়ে কেন, কেন এ কৌতুক।
শ্যামা। নহে নহে, এ নহে কৌতুক।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার
সঁপি দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে।
তব অপমানে মোর
অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

[বজ্রসেনকে নিয়ে প্রহরীর প্রস্থান

সঙ্গে শ্যামা কিছু দূর গিয়ে ফিরে এসে

শ্যামা। রাজার প্রহরী ওরা অন্যায় অপবাদে
নিরীহের প্রাণ বধিবে ব'লে কারাগারে বাঁধে।
ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো,
আছ কি বীর কোনো,

দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে।

উত্তীয়ের প্রবেশ

উত্তীয়। ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে,
শুধু তোমারে জানি
ওগো সুন্দরী।
চাও কি প্রেমের চরম মূল্য— দেব আনি,
দেব আনি ওগো সুন্দরী।
প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,
নেবে মোর প্রাণঋণ—
তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রব চিরদিন
মরণডোরে।
কেমনে ছাড়িবে মোরে,
ওগো সুন্দরী॥

শ্যামা। এতদিন তুমি সখা, চাহ নি কিছু;
নীরবে ছিলে করি নয়ন নিচু।
রাজ-অঙ্গুরী মম করিলাম দান,
তোমারে দিলাম মোর শেষ সম্মান।
তব বীর-হাতে এই ভূষণের সাথে
আমার প্রণাম যাক তব পিছু পিছু।

উত্তীয়। আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ।
রজনীগন্ধা অগোচরে
যেমন রজনী স্বপনে ভরে
সৌরভে,
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,

তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।

বিদায় নেবার সময় এবার হল—

প্রসন্ন মুখ তোলো,

মুখ তোলো, মুখ তোলো—

মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া স পিয়া যাব প্রাণ

চরণে।

যারে জান নাই, যারে জান নাই,

যারে জান নাই,

তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান॥

শ্যামা হাত ধ'রে উত্তীয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল

অল্পক্ষণ পরে হাত ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল

সখী। তোমার প্রেমের বীর্যে

তোমার প্রবল প্রাণ সখীরে করিলে দান।

তব মরণের ডোরে

বাঁধিলে বাঁধিলে ওরে

অসীম পাপে

অনন্ত শাপে।

তোমার চরম অর্ঘ্য

কিনিল সখীর লাগি নারকী প্রেমের স্বর্গ।

উত্তীয়। প্রহরী, ওগো প্রহরী,

লহো লহো লহো মোরে বাঁধি।

বিদেশী নহে সে তব শাসনপাত্র,

আমি একা অপরাধী।

কোটাল। তুমিই করেছ তবে চুরি ?

উত্তীয়। এই দেখো রাজ-অঙ্গুরী—

রাজ-আভরণ দেহে করেছি ধারণ আজি,

সেই পরিতাপে আমি কাঁদি।

[উত্তীয়কে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

সখী। বুক যে ফেটে যায়, হায় হায় রে।
তোর তরুণ জীবন দিলি নিষ্কারণে
মৃত্যুপিপাসিনীর পায় রে।
ওরে সখা,
মধুর দুর্লভ যৌবনধন ব্যর্থ করিলি
কেন অকালে
পুষ্পবিহীন গীতিহারা মরণমরুর পারে,
ওরে সখা।

[প্রস্থান

কারাগারে উত্তীয়। প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। নাম লহো দেবতার ; দেরি তব নাই আর,
দেরি তব নাই আর।
ওরে পাষণ্ড, লহো চরম দণ্ড ; তোর
অন্ত যে নাই আস্পর্ধার।

শ্যামার দ্রুত প্রবেশ

শ্যামা। থাম্ রে, থাম্ রে তোরা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—
দোষী ও-যে নয় নয়, মিথ্যা মিথ্যা সবই,
আমারি ছলনা ও যে—
বেঁধে নিয়ে যা মোরে
রাজার চরণে।

প্রহরী। চুপ করো, দূরে যাও, দূরে যাও নারী—
বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না।

[দুই হাতে মুখ ঢেকে শ্যামার প্রস্থান

প্রহরীর উত্তীয়কে হত্যা

সখী। কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো
দেখা দিল রে প্রলয়রাত্রি ভেদি
দুর্দিন দুর্যোগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাঁশি।

অকরুণ নির্মম ভুবনে
দেখিনু এ কী সহসা—
কোন্ আপনা-সমর্পণ, মুখে নির্ভয় হাসি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামা। বাজে গুরু গুরু শঙ্কার ডঙ্কা,
ঝঞ্ঝা ঘনায় দূরে
ভীষণ নীরবে।
কত রব সুখস্বপ্নের ঘোরে আপনা ভুলে,
সহসা জাগিতে হবে রে ॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

শ্যামা। হে বিদেশী এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
অভাগীরে করুণা করিয়ো, এসো এসো।
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
হে হৃদয়স্বামী,
জীবনে মরণে প্রভু।

বজ্রসেন। এ কী আনন্দ, আহা—
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতসুগন্ধ।
এলে কারাগারে
রজনীর পারে উষাসম,
মুক্তিরূপা অয়ি লক্ষ্মী দয়াময়ী।

শ্যামা। বোলো না, বোলো না, বোলো না
আমি দয়াময়ী।
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। বোলো না।
এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।

আমি দয়াময়ী !
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।

বজ্রসেন। জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে,
জেনো, প্রিয়ে।
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।
কলঙ্ক যাহা আছে,
দূর হয় তার কাছে,
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে॥

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা পিছনে চাব না,
পাল তুলে দাও, দাও দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল—
হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল,
পাগল হে নাবিক,
ভুলাও দিগ্‌বিদিক,
পাল তুলে দাও, দাও দাও॥

সখী। হায় হায় রে হায় পরবাসী,
হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি।
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে
কোন্ বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি।
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে
মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে
গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি॥

চতুর্থ দৃশ্য

কোটালের প্রবেশ

কোটাল। পুরী হতে পালিয়েছে যে পুরসুন্দরী
কোথা তারে ধরি, কোথা তারে ধরি।
রক্ষা রবে না, রক্ষা রবে না—
এমন ক্ষতি রাজার সবে না,
রক্ষা রবে না।
বন হতে কেন গেল অশোকমঞ্জরী
ফাল্গুনের অঙ্গন শূন্য করি।
ওরে কে তুই ভুলালি,
তারে কে তুই ভুলালি—
ফিরিয়ে দে তারে মোদের বনের দুলালী,
তারে কে তুই ভুলালি।

[প্রস্থান

মেয়েদের প্রবেশ। শেষে প্রহরীর প্রবেশ

সখীগণ। রাজভবনের সমাদর সম্মান ছেড়ে
এল আমাদের সখা।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না—
কেমনে যাবে অজানা পথে
অন্ধকারে দিক নিরখি।
অচেনা প্রেমের চমক লেগে
প্রণয়রাতে সে উঠেছে জেগে—
ধ্রুবতারাকে পিছনে রেখে
ধূমকেতুকে চলেছে লখি।
কাল সকালে পুরোনো পথে
আর কখনো ফিরিবে ও কি।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না।

প্রহরী। দাঁড়াও, কোথা চলো, তোমরা কে বলো বলো।

সখীগণ। আমরা আহিরিনী, সারা হল বিকিকিনি—

দূর গাঁয়ে চলি ধেয়ে আমরা বিদেশী মেয়ে।

প্রহরী। ঘাটে বসে হোথা ও কে।

সখীগণ। সাথি মোদের ও যে নেয়ে—

যেতে হবে দূর পারে,

এনেছি তাই ডেকে তারে।

নিয়ে যাবে তরী বেয়ে

সাথী মোদের ও যে নেয়ে—

ওগো প্রহরী, বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না,

মিনতি করি,

ওগো প্রহরী।

[প্রস্থান

সখী। কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল দুই অজানারে

এ কী সংশয়েরি অন্ধকারে।

দিশাহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায়

মিলনতরণীখানি ধায় রে

কোন্ বিচ্ছেদের পারে॥

বজ্রসেন ও শ্যামার প্রবেশ

বজ্রসেন। হৃদয়ে বসন্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল

সেই প্রেম সেই মালিকায় রূপ নিল, রূপ নিল।

এই ফুলহারে প্রেয়সী তোমারে

বরণ করি

অক্ষয় মধুর সুধাময়

হোক মিলনবিভাবরী।

প্রেয়সী তোমায় প্রাণবেদিকায়

প্রেমের পূজায় বরণ করি॥

—

কহো কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
অয়ি বিদেশিনী,
তোমার কাছে আমি কত ঋণে ঋণী।

শ্যামা। নহে নহে নহে— সে কথা এখন নহে।

সহচরী। নীরবে থাকিস সখী, ও তুই নীরবে থাকিস।
তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা
তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস।
দয়িতেরে দিয়েছিলি সুধা,
আজিও তাহে মেটে নি ক্ষুধা—
এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ।
যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে
কেন তারে বাহিরে ডাকিস॥

বজ্রসেন। কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত
কহো বিবরিয়া।
জানি যদি প্রিয়ে, শোধ দিব
এ জীবন দিয়ে এই মোর পণ॥

শ্যামা। তোমা লাগি যা করেছি
কঠিন সে কাজ,
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা।
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর;
মোর অনুনয়ে তব চুরি-অপবাদ
নিজ-'পরে লয়ে
সঁপেছে আপন প্রাণ।

বজ্রসেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে।

শ্যামা। ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত

হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।

তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো।

বজ্রসেন। এ জন্মের লাগি

তোর পাপমূল্যে কেনা

মহাপাপভাগী

এ জীবন করিলি ধিক্‌কৃত।

কলঙ্কিনী ধিক্ নিশ্বাস মোর

তোর কাছে ঋণী।

শ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই,

দোষ করি নাই।

দোষী আমি বিধাতার পায়ে,

তিনি করিবেন রোষ—

সহিব নীরবে।

তুমি যদি না করো দয়া

সবে না, সবে না, সবে না॥

বজ্রসেন। তবু ছাড়িবি না মোরে?

শ্যামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না।

তোমা লাগি পাপ নাথ,

তুমি করো মর্মাঘাত।

ছাড়িব না।

শ্যামাকে বজ্রসেনের আঘাত ও শ্যামার পতন

[বজ্রসেনের প্রস্থান

নেপথ্যে। হায় এ কী সমাপন!

অমৃতপাত্র ভাঙিলি,

করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ;

এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো

কলঙ্কে, অসম্মানে॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

পল্লীরমণীরা। তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা,

হায় বিদেশী পান্থ।
এই দারুণ রৌদ্রে, এই তপ্ত বালুকায়
তুমি কি পথভ্রান্ত।
দুই চক্ষুতে এ কী দাহ
জানি নে, জানি নে, জানি নে, কী যে চাহ।
চলো চলো আমাদের ঘরে,
চলো চলো ক্ষণেকের তরে,
পাবে ছায়া, পাবে জল।
সব তাপ হবে তব শান্ত।
কথা কেন নেয় না কানে,
কোথা চ'লে যায় কে জানে।
মরণের কোন্ দূত ওরে
করে দিল বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত।

[সকলের প্রস্থান

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন। এসো এসো এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন,
নীরস মম ভুবন,
শূন্য হৃদয় পূরণ করো
মাধুরীসুধা দিয়ে।

সহসা নূপুর দেখিয়া কুড়াইয়া লইল

হায় রে, হায় রে; নূপুর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি
কলগুঞ্জনসুর।
নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে
রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া
স্মরণ সুমধুর।
তার কোমল-চরণ-স্মরণ সুমধুর।

তোর ঝংকারহীন ধিক্কারে কাঁদে
প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥

[প্রস্থান

নেপথ্যে। সব কিছু কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।
আপনাতে কেন মিটাল না
যত কিছু দ্বন্দ্বেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা
সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে ॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন। এসো এসো এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। এসেছি প্রিয়তম, ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না গেল না কেন কঠিন পরান মম—
তব নিঠুর করুণ করে! ক্ষমো মোরে।
বজ্রসেন। কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে।
যাও যাও যাও যাও, চলে যাও।

শ্যামা চলে যাচ্ছে। বজ্রসেন চুপ করে দাঁড়িয়ে
শ্যামা একবার ফিরে দাঁড়াল। বজ্রসেন একটু এগিয়ে

বজ্রসেন। যাও যাও যাও যাও, চলে যাও।

[বজ্রসেনকে প্রণাম করে শ্যামার প্রস্থান

বজ্রসেন। ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা—
ক্ষমো হে মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু॥

পরিশিষ্ট

পরিশোধ

(নাট্যগীতি)

কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত "পরিশোধ" নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষ্যে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।

১

গৃহদ্বারে পথপার্শ্বে

শ্যামা। এখনো কেন সময় নাহি হল
নাম-না-জানা অতিথি,
আঘাত হানিলে না দুয়ারে
কহিলে না, দ্বার খোলো।
হাজার লোকের মাঝে
রয়েছি একেলা যে,
এসো আমার হঠাৎ আলো
পরান চমকি' তোলো ॥

আঁধার বাঁধা আমার ঘরে
জানি না কাঁদি কাহার তরে ॥

চরণসেবার সাধনা আনো,
সকল দেবার বেদনা আনো,
নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র
কানে কানে বোলো ॥

রাজপথে

প্রহরীগণ। রাজার আদেশ ভাই,
চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই,
কোথা তারে পাই ?
যারে পাও তারে ধরো
কোনো ভয় নাই ॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

প্রহরী। ধর্ ধর্, ঐ চোর, ঐ চোর।

বজ্রসেন। নই আমি, নই নই নই চোর।
অন্যায় অপবাদে
আমারে ফেলো না ফাঁদে।
নই আমি নই চোর।

প্রহরী। ঐ বটে ঐ চোর ঐ চোর।

বজ্রসেন। এ কথা মিথ্যা অতি ঘোর।
আমি পরদেশী
হেথা নেই স্বজন বন্ধু কেহ মোর;
নই চোর, নই আমি, নই চোর।

শ্যামা। আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে। বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন আমার আলয়ে
দয়া করি।

সহচরী। সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
ঘুচাবে কে;
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে
মুছাবে কে।
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা,
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে,
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।

প্রহরীদের প্রতি

শ্যামা। তোমাদের এ কী ভ্রান্তি,
কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি,

প্রহরী, মরি মরি।
এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে।
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে?

প্রহরী। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে
চোর চাই যে ক'রেই হোক্।
হোক-না সে যেই-কোনো লোক;
নহিলে মোদের যাবে মান।

শ্যামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,
দুই দিন মাগিনু সময়।

প্রহরী। রাখিব তোমার অনুনয়;
দুই দিন কারাগারে রবে
তার পর যা হয় তা হবে।

বজ্রসেন। এ কী খেলা, হে সুন্দরী,
কিসের এ কৌতুক।
কেন দাও অপমান-দুখ,
মোরে নিয়ে কেন,
কেন এ কৌতুক।

শ্যামা। নহে নহে, নহে এ কৌতুক।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার
সঁপি দিয়া, শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

বজ্রসেন। কোন্ অযাচিত আশার আলো
দেখা দিল রে তিমির রাত্রি ভেদি'
দুর্দিন দুর্যোগে,
কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি।
অচেনা নির্মম ভুবনে
দেখিনু এ কী সহসা
কোন্ অজানার সুন্দর মুখে সান্ত্বনা হাসি॥

২

কারাঘর

শ্যামার প্রবেশ

বজ্রসেন। এ কী আনন্দ
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃত সুগন্ধ।
এলে কারাগারে
রজনীর পারে উষাসম,
মুক্তিরূপা অয়ি, লক্ষ্মী দয়াময়ী।

শ্যামা। বোলো না, বোলো না, আমি দয়াময়ী।
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।
এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।
আমি দয়াময়ী!
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।

বজ্রসেন। জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে,
জেনো, প্রিয়ে,
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।
কলঙ্ক যাহা আছে
দূর হয় তার কাছে,
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে।

শ্যামা। হে বিদেশী, এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
এই কথা স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
হে হৃদয়স্বামী,
জীবনে মরণে প্রভু॥

বজ্রসেন। প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা পিছনে চাব না
পাল তুলে দাও, দাও দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল
হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল
পাগল হে নাবিক
ভুলাও দিগ্‌বিদিক
পাল তুলে দাও, দাও দাও॥

শ্যামা। চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে॥
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে॥
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমার করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

৩

বজ্রসেন ও শ্যামা

তরণীতে

শ্যামা। এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি॥
ফুল ফোটানো সারা ক'রে
বসন্ত যে গেল স'রে

নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা

বলো কী করি ॥

জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে ঢেউ উঠেছে দুলে,

মর্‌মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে,

শূন্যমনে কোথায় তাকাস

সকল বাতাস সকল আকাশ

ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে

উঠে শিহরি ॥

বজ্রসেন। কহো কহো মোরে প্রিয়ে

আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।

অয়ি বিদেশিনী,

তোমারি কাছে আমি কত ঋণে ঋণী।

শ্যামা। নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।

ঐ রে তরী দিল খুলে।

তোর বোঝা কে নেবে তুলে ॥

সামনে যখন যাবি ওরে,

থাক্ না পিছন পিছে প'ড়ে,

পিঠে তারে বইতে গেলে

একলা প'ড়ে রইবি কূলে ॥

ঘরের বোঝা টেনে টেনে

পারের ঘাটে রাখলি এনে

তাই যে তোরে বারে বারে

ফিরতে হল গেলি ভুলে।

ডাক্ রে আবার মাঝিরে ডাক্,

বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক,

জীবনখানি উজাড় ক'রে

সঁপে দে তার চরণমূলে ॥

বজ্রসেন। কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত

কহো বিবরিয়া।

জানি যদি প্রিয়ে,
শোধ দিব এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ ॥

শ্যামা। নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।
তোমা লাগি যা করেছি
কঠিন সে কাজ,
আরো সুকঠিন আজ
তোমারে সে কথা বলা।
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর।
মোর অনুনয়ে তব চুরি-অপবাদ
নিজ-'পরে লয়ে সঁপেছে আপন প্রাণ।
এ জীবনে মম ওগো সর্বোত্তম,
সর্বাধিক মোর এই পাপ
তোমার লাগিয়া ॥

বজ্রসেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে।
কোথা তুই লুকাবি মুখ মৃত্যু-আঁধারে ॥

শ্যামা। ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো।

বজ্রসেন। এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্‌কৃত। কলঙ্কিনী
ধিক্‌ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।

শ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই,
দোষ করি নাই,
দোষী আমি বিধাতার পায়ে;

তিনি করিবেন রোষ—
সহিব নীরবে।
তুমি যদি না কর দয়া
সবে না, সবে না, সবে না ॥

বজ্রসেন তবু ছাড়িবে নে মোরে ?

শ্যামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না।
তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি করো মর্মাঘাত।
ছাড়িব না।

শ্যামাকে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা

নেপথ্যে। হায়, এ কি সমাপন!
অমৃতপাত্র ভাঙিলি,
করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ।
এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো, হারালো,
কলঙ্কে, অসম্মানে ॥

৪

পথিক রমণী

সব কিছু কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা।
আপনাতে কেন মিটাল না যত কিছু দ্বন্দ্বেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা
সাগর-হৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দে রে ॥ [প্রস্থান

বজ্রসেন। ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা—
পাপীজনশরণ প্রভু।

মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা,
ক্ষমো হে মম দীনতা।
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি,
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা,
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা ॥

এসো এসো এসো প্রিয়ে
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন,
নীরস মম ভুবন
শূন্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরীসুধা দিয়ে ॥

নূপুর কুড়াইয়া লইয়া

হায় রে নূপুর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগুঞ্জনসুর।
নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে
রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া স্মরণ সুমধুর।
তোর ঝংকারহীন ধিক্কারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। এসেছি প্রিয়তম।
ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম
তব নিঠুর করুণ করে।
বজ্রসেন। কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে—
যাও যাও চলে যাও। [শ্যামার প্রণাম ও প্রস্থান

বজ্রসেন। ধিক্ ধিক্ ওরে মুগ্ধ,
কেন চাস্ ফিরে ফিরে।
এ যে দূষিত নিষ্ঠুর স্বপ্ন
এ যে মোহবাষ্পঘন কুজ্ঝটিকা,
দীর্ণ করিবি না কি রে।
অশুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে
নিদারুণ বিষ,
লোভ না রাখিস
প্রেতবাস তোর ভগ্ন মন্দিরে॥
নির্মম বিচ্ছেদসাধনায়
পাপ ক্ষালন হোক,
না করো মিথ্যা শোক,
দুঃখের তপস্বী রে,
স্মৃতিশৃঙ্খল করো ছিন্ন,
আয় বাহিরে
আয় বাহিরে॥

নেপথ্যে। কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে,
যাও চিরবিরহের সাধনায়,
ফিরো না, ফিরো না, ভুলো না মোহে।
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
জয়ী হও অন্তর বিদ্রোহে॥
যাক পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা,
যাক মিলায়ে কামনা-কুয়াশা।
স্বপ্ন-আবেশবিহীন পথে
যাও বাঁধন-হারা,
তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে ব'হে॥

আশ্বিন ১৩৪৩
শান্তিনিকেতন

উপন্যাস ও গল্প

তিন সঙ্গী

তিন সঙ্গী

রবিবার

আমার গল্পের প্রধান মানুষটি প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের ছেলে। বিষয়ব্যাপারে বাপ ওকালতি ব্যবসায়ে আঁটি পর্যন্ত পাকা, ধর্মকর্মে শাক্ত আচারের তীব্র জারক রসে জারিত। এখন আদালতে আর প্র্যাকটিস করতে হয় না। এক দিকে পূজা-অর্চনা আর-এক দিকে ঘরে বসে আইনের পরামর্শ দেওয়া, এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে তিনি ইহকাল পরকালের জোড় মিলিয়ে অতি সাবধানে চলেছেন। কোনো দিকেই একটু পা ফসকায় না।

এই রকম নিরেট আচারবাঁধা সনাতনী ঘরের ফাটল ফুঁড়ে যদি দৈবাৎ কাঁটাওয়ালা নাস্তিক ওঠে গজিয়ে, তা হলে তার ভিত-দেয়াল-ভাঙা মন সাংঘাতিক ঠেলা মারতে থাকে ইটকাঠের প্রাচীন গাঁথুনির উপরে। এই আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশে দুর্দান্ত কালাপাহাড়ের অভ্যুদয় হল আমাদের নায়কটিকে নিয়ে।

তার আসল নাম অভয়াচরণ। এই নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা দিল সে ঘষে উঠিয়ে। বদল ক'রে করলে অভীককুমার। তা ছাড়া ও জানে যে প্রচলিত নমুনার মানুষ ও নয়। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে-বাজারে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর রুচিতে বাধে।

অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ, চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সহ্য করেছে তারা একে শতহস্ত দূরে বর্জনীয় ব'লে গণ্য করত।

ছেলের নাস্তিকতা নিয়ে বাপ অম্বিকাচরণ বিশেষ উদ্‌বিগ্ন ছিলেন না। মস্ত তাঁর নজির ছিল প্রসন্ন ন্যায়রত্ন, তাঁর আপন জেঠামশায়। বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তর্কশাস্ত্রের গোলন্দাজ, চতুষ্পাঠীর মাঝখানে বসে অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা গোলা দাগেন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের উপরে। হিন্দুসমাজ হেসে বলে 'গোলা খা ডালা', দাগ পড়ে না সমাজের পাকা প্রাচীরের উপরে। আচারধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় ঝুলিয়ে রেখে

ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না। কিন্তু অভীক কথায় কথায় লোকাচারকে চালান দিত ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছাইয়ের গাদার উদ্দেশে। ঘরের চার দিকে মোরগদম্পতিদের অপ্রতিহত সঞ্চরণ সর্বদাই মুখরধ্বনিতে প্রমাণ করত তাদের উপর বাড়ির বড়োবাবুর আভ্যন্তরিক আকর্ষণ। এ-সমস্ত ম্লেচ্ছাচারের কথা ক্ষণে ক্ষণে বাপের কানে পৌঁচেছে, সে তিনি কানে তুলতেন না। এমন কি, বন্ধুভাবে যে ব্যক্তি তাঁকে খবর দিতে আসত, সগর্জনে দেউড়ির অভিমুখে তার নির্গমনপথ দ্রুত নির্দেশ করা হত। অপরাধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ না হলে সমাজ নিজের গরজে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু অবশেষে অভীক একবার এত বাড়াবাড়ি করে বসল যে তার অপরাধ অস্বীকার করা অসম্ভব হল। ভদ্রকালী ওদের গৃহদেবতা, তাঁর খ্যাতি ছিল জাগ্রত ব'লে। অভীকের সতীর্থ বেচারা ভজু ভারি ভয় করত ওই দেবতার অপ্রসন্নতা। তাই অসহিষ্ণু হয়ে তার ভক্তিকে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করবার জন্যে পুজোর ঘরে অভীক এমন-কিছু অনাচার করেছিল যাতে ওর বাপ আগুন হয়ে ব'লে উঠলেন, 'বেরো আমার ঘর থেকে, তোর মুখ দেখব না।' এতবড়ো ক্ষিপ্রবেগের কঠোরতা নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের চরিত্রেই সম্ভব।

ছেলে মাকে গিয়ে বললে, "মা, দেবতাকে অনেককাল ছেড়েছি, এমন অবস্থায় আমাকে দেবতার ছাড়াটা নেহাত বাহুল্য। কিন্তু জানি বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই। ওইখানে কোনো দেবতার দেবতাগিরি খাটে না, তা যত বড়ো জাগ্রত হোন-না তিনি।"

মা চোখের জল মুছতে মুছতে আঁচল থেকে খুলে ওকে একখানি নোট দিতে গেলেন। ও বললে, "ওই নোটখানায় যখন আমার অত্যন্ত বেশি দরকার আর থাকবে না তখনই তোমার হাত থেকে নেব। অলক্ষ্মীর সঙ্গে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাঙ্কনোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।"

অভীকের সম্বন্ধে আরও দুটো-একটা কথা বলতে হবে। জীবনে ওর দুটি উলটো জাতের শখ ছিল, এক কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া, আর-এক ছবি আঁকা। ওর বাপের ছিল তিনখানা মোটরগাড়ি, তাঁর মফস্বল-অভিযানের বাহন। যন্ত্রবিদ্যায় ওর হাতেখড়ি সেইগুলো নিয়ে। তা ছাড়া তাঁর ক্লায়েন্টের ছিল মোটরের কারখানা, সেইখানে ও শখ ক'রে বেগার খেটেছে অনেকদিন।

অভীক ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিল সরকারী আর্টস্কুলে। কিছুকালের মধ্যেই ওর এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, আর বেশিদিন শিখলে ওর হাত হবে কলে-তৈরি, ওর মগজ হবে ছাঁচে-ঢালা। ও আর্টিস্ট, সেই কথাটা প্রমাণ করতে লাগল নিজের জোর

আওয়াজে। প্রদর্শনী বের করলে ছবির, কাগজের বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় বেরল আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট অভীককুমার, বাঙালি টিশিয়ান। ও যতই গর্জন করে বললে 'আমি আর্টিস্ট', ততই তার প্রতিধ্বনি উঠতে থাকল একদল লোকের ফাঁকা মনের গুহায়, তারা অভিভূত হয়ে গেল। শিষ্য এবং তার চেয়ে বেশি সংখ্যক শিষ্যা জমল ওর পরিমণ্ডলীতে। তারা বিরুদ্ধদলকে আখ্যা দিল ফিলিস্টাইন। বলল বুর্জোয়া।

অবশেষে দুর্দিনের সময় অভীক আবিষ্কার করলে যে তার ধনী পিতার তহবিলের কেন্দ্র থেকে আর্টিস্টের নামের 'পরে যে রজতচ্ছটা বিচ্ছুরিত হত তারই দীপ্তিতে ছিল তার খ্যাতির অনেকখানি উজ্জ্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে সে আর-একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল যে অর্থভাগ্যের বঞ্চনা উপলক্ষ্য করে মেয়েদের নিষ্ঠায় কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি। উপাসিকারা শেষ পর্যন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে উচ্চমধুর কণ্ঠে তাকে বলছে আর্টিস্ট। কেবল নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে সন্দেহ করেছে যে স্বয়ং তারা দুই-একজন ছাড়া বাকি সবাই আর্টের বোঝে না কিছুই, ভণ্ডামি করে, গা জ্বলে যায়।

অভীকের জীবনে এর পরবর্তী ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং অস্পষ্ট। ময়লা টুপি আর তেলকালিমাখা নীলরঙের জামা-ইজের প'রে বার্নকোম্পানির কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি ও পরে হেডমিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে। মুসলমান খালাসিদের দলে মিশে চার পয়সার পরোটা আর তার চেয়ে কম দামের শাস্ত্রনিষিদ্ধ পশুমাংস খেয়ে ওর দিন কেটেছে সস্তায়। লোকে বলেছে, ও মুসলমান হয়েছে ; ও বলেছে, মুসলমান কি নাস্তিকের চেয়েও বড়ো। হাতে যখন কিছু টাকা জমল তখন অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে আবার সে পূর্ণ পরিস্ফুট আর্টিস্টরূপে বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল। শিষ্য জুটল, শিষ্যা জুটল। চশমাপরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বে-আব্রু রীতিতে যে-সব নগ্নমনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত ও অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললে, পজিটিভ্‌লি ভাল্‌গর।

বিভা ছিল এই দলের একেবারে বাইরে। কলেজের প্রথম ধাপের কাছেই অভীকের সঙ্গে ওর আলাপ শুরু। অভীকের বয়স তখন আঠারো, চেহারায় নবযৌবনের তেজ ঝক্‌ঝক্‌ করছে, আর তার নেতৃত্ব বড়োবয়সের ছেলেরাও স্বভাবতই নিয়েছে স্বীকার করে।

ব্রাহ্মসমাজে মানুষ হয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেশবার সংকোচ বিভার ছিল না। কিন্তু কলেজে বাধা ঘটল। তার প্রতি কোনো কোনো ছেলের অশিষ্টতা হাসিতে কটাক্ষে

ইঙ্গিতে আভাসে স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু একদিন একটি শহুরে ছেলের অভদ্রতা বেশ একটু গায়ে-পড়া হয়ে প্রকাশ পেল। সেটা অভীকের চোখে পড়তেই সেই ছেলেটাকে বিভার কাছে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে এসে বললে, 'মাপ চাও'। মাপ তাকে চাইতেই হল নতশিরে আমতা আমতা করে। তার পর থেকে অভীক দায় নিল বিভার রক্ষাকর্তার। তা নিয়ে সে অনেক বক্রোক্তির লক্ষ্য হয়েছে, সমস্তই ঠিকরে পড়েছে তার চওড়া বুকের উপর থেকে। সে গ্রাহ্যই করে নি। বিভা লোকের কানাকানিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেছে কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে একটা রোমাঞ্চকর আনন্দও দিয়েছিল।

বিভার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়ো। কেমন করে মন টানে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। অভীক ওকে একদিন বলেছিল, "অনাহূতের ভোজে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের; লিওনার্দো ডা ভিঞ্চির ছবির সঙ্গেই মেলে, ইনস্ক্রুটেব্‌ল্‌।"

একদা কলেজের পরীক্ষায় বিভা অভীককে ডিঙিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে তার অজস্র কান্না আর বিষম রাগ। এ যেন তার নিজের অসম্মান। বললে, "তুমি দিনরাত কেবল ছবি এঁকে এঁকে পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়, আমার লজ্জা করে।"

কথাটা দৈবাৎ পাশের বারান্দা থেকে কানে যেতেই বিভার এক সখী চোখ টিপে বলেছিল, "মরি মরি, তোমারি গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমারি রূপে।"

অভীক বললে, "মুখস্থ বিদ্যার দিগ্‌গজেরা জানেই না আমি কোন্‌ মার্কাশূন্য পরীক্ষায় পাশ করে চলেছি। আমার ছবি আঁকা নিয়ে তোমার চোখে জল পড়ে, আর তোমার শুকনো পণ্ডিতি দেখে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। কিছুতেই বুঝবে না, কেননা তোমরা নামজাদা দলের পায়ের তলায় থাক চোখ বুজে, আর আমরা থাকি বদনামি দলের শিরোমণি হয়ে।"

এই ছবির ব্যাপারে দুজনের মধ্যে তীব্র একটা দ্বন্দ্ব ছিল। বিভা অভীকের ছবি বুঝতেই পারত না সেকথা সত্যি। অন্য মেয়েরা যখন ওর আঁকা যা-কিছু নিয়ে হই-হই করত, সভা করে গলায় মালা পরাত, সেটাকে বিভা অশিক্ষিতের ন্যাকামি মনে করে লজ্জা পেত। কিন্তু তীব্র ক্ষোভে ছট্‌ফট্‌ করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। দেশের লোকে ওর ছবিকে পাগলামি বলে গণ্য করছে, বিভাও যে মনে মনে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিতে পারলে এইটেই ওর কাছে অসহ্য। কেবলই এই কল্পনা ওর মনে জাগে যে, একদিন ও য়ুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।

রবিবার সকালবেলা। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা থেকে ফিরে এসেই বিভা দেখতে পেলে অভীক বসে আছে তার ঘরে। বইয়ের পার্সেলের ব্রাউন মোড়ক ছিল আবর্জনার ঝুড়িতে। সেইটে নিয়ে কালি-কলমে একখানা আঁচড়কাটা ছবি আঁকছিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ এখানে যে।"

অভীক বললে, "সংগত কারণ দেখাতে পারি, কিন্তু সেটা হবে গৌণ, মুখ্য কারণটা খুলে বললে সেটা হয়তো সংগত হবে না। আর যাই হোক, সন্দেহ কোরো না যে চুরি করতে এসেছি।"

বিভা তার ডেস্কের চৌকিতে গিয়ে বসল, বললে, "দরকার যদি হয় না-হয় চুরি করলে, পুলিসে খবর দেব না।"

অভীক বললে, "দরকারের হাঁ-করা মুখের সামনে তো নিত্যই আছি। পরের ধন হরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই পুণ্যকর্ম, পারি নে পাছে অপবাদটা দাগা দেয় পবিত্র নাস্তিক মতকে। ধার্মিকদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি সাবধানে চলতে হয় আমাদের নেতি দেবতার ইজ্জত বাঁচাতে।"

"অনেকক্ষণ তুমি বসে আছ ?

"তা আছি, বসে বসে সাইকলজির একটা দুঃসাধ্য প্রব্লেম মনে মনে নাড়াচাড়া করছি যে তুমি পড়াশুনো করেছ, আর বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু আছে, তবু ভগবানকে বিশ্বাস কর কী করে। এখনও সমাধান করতে পারি নি। বোধ হয় বার বার তোমার এই ঘরে এসে এই রিসর্চের কাজটা আমাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।"

"আবার বুঝি আমার ধর্মকে নিয়ে লাগলে ?"

"তার কারণ তোমার ধর্ম যে আমাকে নিয়ে লেগেছে। আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে সেটা মর্মঘাতী। সে আমি ক্ষমা করতে পারি নে। তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, যেহেতু তুমি যাকে বিশ্বাস কর আমি তাকে করি নে বুদ্ধি আছে ব'লে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই তুমি অবুঝের মতো সত্য মিথ্যে যাই বিশ্বাস কর-না কেন। তুমি তো নাস্তিকের জাত মারতে পার না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে। সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য, এ কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যে একটি দেবতাও নেই আমার সামনে।"

বিভা চুপ করে বসে রইল। খানিকবাদে অভীক বলে উঠল, "তোমার ভগবান কি আমার বাবারই মতো। আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন ?"

"আঃ কী বকছ।"

অভীক জানে বিয়ে না করবার শক্ত কারণটা কোন্‌খানে। কথাটা বিভাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চায়, বিভা চুপ করে থাকে।

জীবনের আরম্ভ থেকেই বিভা তার বাবারই মেয়ে সম্পূর্ণরূপে। এত ভালোবাসা, এত ভক্তি সে আর-কোনো মানুষকে দিতে পারে নি। তার বাপ সতীশও এই মেয়েটির উপরে তাঁর অজস্র স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। তাই নিয়ে ওর মার মনে একটু ঈর্ষা ছিল। বিভা হাঁস পুষেছিল, তিনি কেবলই খিট্‌খিট্‌ করে বলেছিলেন, 'ওগুলো বড্ড বেশি কাঁ্যাক্‌ কাঁ্যাক্‌ করে।' বিভা আসমানি রঙের শাড়ি জ্যাকেট করিয়েছিল, মা বলেছিলেন, 'এ কাপড় বিভার রঙে একটুও মানায় না।' বিভা তার মামাতো বোনকে খুব ভালোবাসত। তার বিয়েতে যেতে চাইলেই মা বলে বসলেন, 'সেখানে ম্যালেরিয়া।'

মায়ের কাছ থেকে পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে বাপের উপরে বিভার নির্ভর আরও গভীর এবং মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

মার মৃত্যু হয় প্রথমেই। তার পরে ওর বাপের সেবা অনেকদিন পর্যন্ত ছিল বিভার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই স্নেহশীল বাপের সমস্ত ইচ্ছাকে সে নিজের ইচ্ছা করে নিয়েছে। সতীশ তাঁর বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মেয়েকে। কিন্তু ট্রাস্টীর হাতে। নিয়মিত মাসহারা বরাদ্দ ছিল। মোট টাকাটা ছিল উপযুক্ত পাত্রের উদ্দেশে বিভার বিবাহের অপেক্ষায়। বাপের আদর্শে এই উপযুক্ত পাত্র কে তা বিভা জানত। অন্তত অনুপযুক্ত যে কে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। একদিন অভীক এ কথা তুলেছিল, বলেছিল, "যাঁকে তুমি কষ্ট দিতে চাও না, তিনি তো নেই, আর কষ্ট যাকে নিষ্ঠুর ভাবে বাজে, সেই লোকটাই আছে বেঁচে। হাওয়ায় তুমি ছুরি মারতে ব্যথা পাও, আর দরদ নেই এই রক্তমাংসের বুকের 'পরে।" শুনে বিভা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। অভীক বুঝেছিল, ভগবানকে নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু বাবাকে নিয়ে নয়।

বেলা প্রায় দশটা। বিভার ভাইঝি সুস্মি এসে বললে, "পিসিমা বেলা হয়েছে।" বিভা তার হাতে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বললে, "তুই ভাঁড়ার বের করে দে। আমি এখনি যাচ্ছি।"

বেকারদের কাজের বাঁধা সীমা না থাকাতেই কাজ বেড়ে যায়। বিভার সংসারও সেইরকম। সংসারের দায়িত্ব আত্মীয়পক্ষে হালকা ছিল বলেই অনাত্মীয়পক্ষে হয়েছে বহুবিস্তৃত। এই ওর আপনগড়া সংসারের কাজ নিজের হাতে করাই ওর অভ্যাস, চাকরবাকর পাছে কাউকে অবজ্ঞা করে। অভীক বললে, "অন্যায় হবে তোমার এখনই

যাওয়া, কেবল আমার 'পরে নয়, সুস্মির 'পরেও। ওকে স্বাধীন কর্তৃত্বের সময় দাও না কেন। ডোমিনিয়ন স্টাটস্, অন্তত আজকের মতো। তা ছাড়া আমি তোমাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করতে চাই, কখনও তোমাকে কাজের কথা বলি নি। আজ বলে দেখব। নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

বিভা বললে, "তাই হোক, বাকি থাকে কেন।"

পকেট থেকে অভীক চামড়ার কেস বের করে খুলে দেখালে। একটা কবজিঘড়ি। ঘড়িটা প্লাটিনমের, সোনার মণিবন্ধ, হীরের টুকরোর ছিট দেওয়া। বললে, "তোমাকে বেচতে চাই।"

"অবাক করেছ, বেচবে ?"

"হাঁ, বেচব, আশ্চর্য হও কেন।"

বিভা মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বললে, "এই ঘড়ি যে মনীষা তোমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। মনে হচ্ছে তার বুকের ব্যথা এখনও ওর মধ্যে ধুক্‌ধুক্ করছে। জান সে কত দুঃখ পেয়েছিল, কত নিন্দে সয়েছিল আর কত দুঃসাধ্য অপব্যয় করেছিল উপহারটাকে তোমার উপযুক্ত করবার জন্যে ?"

অভীক বললে, "এ ঘড়ি সেই তো দিয়েছিল, কে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত জানতেই দেয় নি। কিন্তু আমি তো পৌত্তলিক নই যে বুকের পকেটে এই জিনিসটার বেদি বাঁধিয়ে মনের মধ্যে দিনরাত শাঁখঘণ্টা বাজাতে থাকব।"

"আশ্চর্য করেছ তুমি। এই ক'মাস হল সে টাইফয়েডে—"

"এখন সে তো সুখদুঃখের অতীত।"

"শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছিল যে তুমি তাকে ভালোবাসতে।"

"ভুল বিশ্বাস করে নি।"

"তবে ?"

"তবে আবার কী। সে নেই, কিন্তু তার ভালোবাসার দান আজও যদি আমাকে ফল দেয় তার চেয়ে আর কী হতে পারে।"

বিভার মুখে অত্যন্ত একটা পীড়ার লক্ষণ দেখা দিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "এত দেশ থাকতে আমার কাছে বেচতে এলে কেন।"

"কেননা জানি তুমি দর-কষাকষি করবে না।"

"তার মানে কলকাতার বাজারে আমিই কেবল ঠকবার জন্যে তৈরি হয়ে আছি ?"

"তার মানে ভালোবাসা খুশি হয়ে ঠকে।"

এমন মানুষের 'পরে রাগ করা শক্ত, জোরের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে ছেলেমানুষি।

কিছুতে যে লজ্জার কারণ আছে তা যেন ও জানেই না। এই ওর অকৃত্রিম অবিবেক, এই যে উচিত-অনুচিতের বেড়া অনায়াসে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলা, এতেই মেয়েদের স্নেহ ওকে এত করে টানে। ভর্ৎসনা করবার জোর পায় না। কর্তব্যবোধকে যারা অত্যন্ত সামলে চলে মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়। আর যে-সব দুর্দাম দুরন্তের কোনো বালাই নেই ন্যায়-অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহুবন্ধনে বাঁধে।

ডেস্কের ব্লটিংকাগজটার উপর খানিকক্ষণ নীল পেনসিলের দাগ-কাটাকাটি করে শেষকালে বিভা বললে, "আচ্ছা, যদি আমার হাতে টাকা থাকে তবে অমনি তোমাকে দেব। কিন্তু তোমার ওই ঘড়ি আমি কিছুতেই কিনব না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে অভীক বললে, "ভিক্ষা ? তোমার সমান ধনী যদি হতুম, তা হলে তোমার দান নিতুম উপহার বলে, দিতুম প্রত্যুপহার সমান দামের। আচ্ছা, পুরুষের কর্তব্য আমিই বরঞ্চ করছি। এই নাও এই ঘড়ি, এক পয়সাও নেব না।"

বিভা বললে, "মেয়েদের তো নেবারই সম্বন্ধ। তাতে কোনো লজ্জা নেই। তাই ব'লে এ ঘড়ি নয়। আচ্ছা শুনি, কেন তুমি ওটা বিক্রি করছ।"

"তবে শোনো, তুমি তো জান, আমার অত্যন্ত বেহায়া একটা ফোর্ড গাড়ি আছে। সেটার চালচলনের ঢিলেমি অসহ্য। কেবল আমি বলেই ওর দশম দশা ঠেকিয়ে রেখেছি। আটশো টাকা দিলেই ওর বদলে ওর বাপদাদার বয়সী একটা পুরোনো ক্রাইসলার পাবার আশা আছে। তাকে নতুন করে তুলতে পারব আমার নিজের হাতের গুণে।"

"কী হবে ক্রাইসলারের গাড়িতে।"

"বিয়ে করতে যাব না।"

"এমন ভদ্র কাজ তুমি করবে, এ সম্ভব নয়।"

"ধরেছ ঠিক। তা হলে প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি— শীলাকে দেখেছ, কুলদা মিস্ত্রিরের মেয়ে ?"

"দেখেছি তোমারই পাশে যখন-তখন যেখানে-সেখানে।"

"আমার পাশেই ও বুক ফুলিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আরও পাঁচজনকে ঠেকিয়ে। ও যে প্রগতিশীলা। ভদ্রসম্প্রদায়ের পিলে চমকে যাবে, এইটেতেই ওর আনন্দ।"

"শুধু কি তাই, মেয়ে-সম্প্রদায়ের বুকে শেল বিঁধবে, তাতেও আনন্দ কম নয়।"

"আমারও মনে ছিল ওই কথাটা, তোমার মুখে শোনাল ভালো। আচ্ছা মন খুলে বলো, ওই মেয়েটির সৌন্দর্য কি অন্যায় রকমের নয়, যাকে বলা যেতে পারে বিধাতার বাড়াবাড়ি।"

"সুন্দরী মেয়ের বেলাতেই বিধাতাকে মান বুঝি ?"

"নিন্দে করবার দরকার হলে যেমন করে হোক একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করতে হয়। দুঃখের দিনে যখন অভিমান করবার তাগিদ পড়েছিল, তখন রামপ্রসাদ মা'কে খাড়া করে বলেছিলেম, তোমাকে মা ব'লে আর ডাকব না। এতদিন ডেকে যা ফল হয়েছিল, না ডেকেও ফল তার চেয়ে বেশি হবে না, মাঝের থেকে নিন্দে করবার ঝাঁজটা ভক্ত মিটিয়ে নিলেন। আমিও নিন্দে করবার বেলায় বিধাতার নাম নিয়েছি।"

"নিন্দে কিসের।"

"বলছি। শীলাকে আমার গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলুম ফুটবলের মাঠ থেকে খড়্‌খড়্‌ শব্দ করতে করতে, পিছনের পদাতিকদের নাসারন্ধ্রে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে। এমনসময় পাকড়াশিগিন্নি— ওকে জান তো, লম্বা গজের অত্যুক্তিতেও ওকে চলনসই বলতে গেলে বিষম খেতে হয়— সে আসছিল কোথা থেকে তার নতুন একটা ফায়াট গাড়িতে। হাত তুলে আমাদের গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে পথের মধ্যে খানিকক্ষণ হাঁ-ভাই-ও-ভাই করে নিলে। আর ক্ষণে ক্ষণে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগল আমার রঙ-চটে-যাওয়া গাড়ির হুড্‌ আর জরাজীর্ণ পাদানটার দিকে। তোমাদের ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন, তা হলে মেয়েদের চেহারায় এত বেশি উঁচুনিচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এ রকম মনের আগুন জ্বালিয়ে দিতেন না।"

"তাই বুঝি তুমি—"

"হাঁ, তাই ঠিক করেছি, যত শিগ্‌গির পারি শীলাকে ক্রাইসলারের গাড়িতে চড়িয়ে পাকড়াশিগিন্নির নাকের সামনে দিয়ে শিঙা বাজিয়ে চলে যাব। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলো, তোমার মনে একটুখানি খোঁচা কি—"

"আমাকে এর মধ্যে টান কেন। বিধাতা আমার রূপ নিয়ে তো খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেন নি। আর আমার গাড়িখানাও তোমার গাড়িখানার উপর টেক্কা দেবার যোগ্য নয়।"

অভীক তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে উঠে মেঝের উপর বিভার পায়ের কাছে বসে তার হাত চেপে ধরে বললে, "কার সঙ্গে কার তুলনা। আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য, আমি বলছি, তুমি আশ্চর্য। আমি তোমাকে দেখি আর আমার ভয় হয় কোন্‌দিন ফস করে মেনে বসব তোমার ভগবানকে। শেষে কোনো কালে আর আমার পরিত্রাণ থাকবে না। তোমার ঈর্ষা আমি কিছুতেই জাগাতে পারলুম না। অন্তত সেটা জানতে দিলে না আমাকে। অথচ তুমি জান—"

"চুপ করো। আমি কিছু জানি নে। কেবল জানি অদ্ভুত, তুমি অদ্ভুত, সৃষ্টি-

কর্তার তুমি অট্টহাসি।"

অভীক বললে, "আমাকে তুমি মুখ ফুটে বলবে না, কিন্তু নিশ্চিত বুঝতে পারি, শীলার সম্বন্ধে তুমি আমার সাইকলজি জানতে চাও। ওকে আমার ঘোরতর অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। অল্পবয়সে যেমন করে সিগারেট অভ্যাস হয়েছিল। মাথা ঘুরত তবু ছাড়তুম না। মুখে লাগত তিতো, মনে লাগত গর্ব। ও জানে কী করে দিনে দিনে মৌতাত জমিয়ে তুলতে হয়। মেয়েদের ভালোবাসায় যে মদটুকু আছে, সেটাতে আমার ইন্‌স্‌পিরেশন। আমি আর্টিস্ট। ও যে আমার পালের হাওয়া। ও নইলে আমার তুলি যায় আটকে বালির চরে। বুঝতে পারি, আমার পাশে বসলে শীলার হৃৎপিণ্ডে একটা লালরঙের আগুন জ্বলতে থাকে, ডেন্‌জার সিগ্‌নাল, তার তেজ প্রবেশ করে আমার শিরায় শিরায়।— দোষ নিয়ো না তপস্বিনী, ভাবছ সেটাতে আমার বিলাস, না গো না, সেটাতে আমার প্রয়োজন।"

"তাই তোমার এত প্রয়োজন ক্রাইসলারের গাড়িতে।"

"তা স্বীকার করব। শীলার মধ্যে যখন গর্ব জাগে তখন ওর ঝলক বাড়ে। মেয়েদের এত গয়না কাপড় জোগাতে হয় সেইজন্যেই। আমরা চাই মেয়েদের মাধুর্য, ওরা চায় পুরুষের ঐশ্বর্য। তারই সোনালি পূর্ণতার উপরে ওদের প্রকাশের ব্যাক্‌-গ্রাউণ্ড্‌। প্রকৃতির এই ফন্দি পুরুষদের বড়ো করে তোলবার জন্যে। সত্যি কি না বলো।"

"সত্যি হতে পারে। কিন্তু কাকে বলে ঐশ্বর্য তাই নিয়ে তর্ক। ক্রাইসলারের গাড়িকে যারা ঐশ্বর্য বলে, আমি তো বলি, তারা পুরুষকে ছোটো করবার দিকে টানে।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "জানি জানি, তুমি যাকে ঐশ্বর্য বল তারই সর্বোচ্চ চূড়ায় তুমি আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারতে। তোমার ভগবান মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।"

অভীকের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিভা বললে, "ওই এক কথা বার বার বোলো না। আমি তো বরাবর উলটোই শুনেছি। বিয়েটা আর্টিস্টের পক্ষে গলার ফাঁস। ইন্‌স্‌পিরেশনের দম বন্ধ করে দেয়। তোমাকে বড়ো করতে যদি পারতুম, আমার যদি সে শক্তি থাকত তা হলে—"

অভীক ঝেঁকে উঠে বললে, "পারতুম কী, পেরেছ। আমার এই দুঃখু যে আমার সেই ঐশ্বর্য তুমি চিনতে পার নি। যদি পারতে তা হলে তোমার ধর্মকর্মের সব বাঁধন ছিঁড়ে আমার সঙ্গিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে; কোনো বাধা

মানতে না। তরী তীরে এসে পৌঁছয় তবু যাত্রী তীর্থে ওঠবার ঘাট খুঁজে পায় না। আমার হয়েছে সেই দশা। বী, আমার মধুকরী, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করবে বলো।"

"যখন আমাকে তোমার আর দরকার হবে না।"

"ও-সব অত্যন্ত ফাঁপা কথা। অনেকখানি মিথ্যের হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে তোলা। স্বীকার করো, 'আমাকে না হলে নয়' ব'লে জেনেই উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহমন। সে কি আমার কাছে লুকোবে।"

"এ কথা বলেই বা কী হবে, লুকোবই বা কেন। মনে যাই থাক্, আমি কাঙালপনা করতে চাই নে।"

"আমি চাই, আমি কাঙাল। আমি দিনরাত বলব, আমি চাই, আমি তোমাকেই চাই।"

"আর সেই সঙ্গে বলবে, আমি ক্রাইসলারের গাড়িও চাই।"

"ওই তো, ওটা তো জেলাসি। পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। মাঝে মাঝে ঘনিয়ে উঠুক ধোঁয়া জেলাসির, প্রমাণ হোক ভালোবাসার অন্তর্গূঢ় আগুন। নিবে-যাওয়া ভল্ক্যানো নয় তোমার মন। তাজা ভিসুভিয়স।" ব'লে দাঁড়িয়ে উঠে অভীক হাত তুলে বললে, "হুর্‌রে।"

"এ কী ছেলেমানুষি করছ। এইজন্যেই বুঝি আজ সকালবেলায় এসেছিলে আগে থাকতে প্ল্যান ক'রে?"

"হাঁ এইজন্যেই। মানছি সে কথা। নইলে এমন মুগ্ধ কেউ কেউ জানা আছে যাকে এ ঘড়ি এখনি বেচতে পারি বিনা ওজরে অন্যায় দামে। কিন্তু তোমার কাছে কেবল তো দাম চাইতে আসি নি, যেখানে তোমার ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে অঞ্জলি পাততে চেয়েছিলেম। কিন্তু হতভাগার ভাগ্যে না হল এটা, না হল ওটা।"

"কেমন করে জানলে। ভাগ্য তো সব সময় দেখাবিন্তি খেলে না। কিন্তু দেখো, একটা কথা তোমাকে বলি— তুমি মাঝে মাঝে আমাকে জিগ্‌গেসা করেছ তোমার লীলাখেলা দেখে আমার মনে খোঁচা লাগে কি না। সত্য কথা বলি, লাগে খোঁচা।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "এটা তো সুসংবাদ।"

বিভা বললে, "অত উৎফুল্ল হোয়ো না। এ জেলাসি নয়, এ অপমান। মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে-পড়া সখ্য, এই অসভ্য অসংকোচ, এতে সমস্ত মেয়েজাতের প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। আমার ভালো লাগে না।"

"এ তোমার কী রকম কথা হল। শ্রদ্ধার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নেই? জাতকে-

যাঁত যেখানে যাকেই দেখব শ্রদ্ধা করে করে বেড়াব? মাল যাচাই নেই, একেবারে wholesale শ্রদ্ধা? একে বলে protection, ব্যাবসাদারিতে বাইরে থেকে কৃত্রিম মাসুল চাপিয়ে দর-বাড়ানো।"

"মিথ্যে তর্ক কোরো না।"

"অর্থাৎ তুমি তর্ক করবে, আমি করব না। একেই বলে, 'দিন ভয়ংকর, মেয়েরা বাক্য কবে কিন্তু পুরুষরা রবে নিরুত্তর'।"

"অভী, তুমি কেবলই কথা-কাটাকাটি করবার অছিলা খুঁজছ। বেশ জান আমি বলতে চাইছিলুম, মেয়েদের থেকে স্বভাবত একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলাই পুরুষের পক্ষে ভদ্রতা।"

"স্বভাবত দূরত্ব বাঁচানো, না অস্বভাবত? আমরা মডার্ন্‌, মেকি ভদ্রতা মানি নে, খাঁটি স্বভাবকে মানি। শীলাকে পাশে নিয়ে ঝাঁকানি-দেওয়া ফোর্ডগাড়ি চালাই, স্বাভাবিকতা হচ্ছে তার পাশাপাশিটাই। ভদ্রতার খাতিরে মাঝখানে দেড়হাত জায়গা রাখলে অশ্রদ্ধা করা হত স্বভাবকে।"

"অভী, তোমরা নিজের থেকে মেয়েদের বিশেষ মূল্য দিয়ে দামী করে তুলেছিলে, তাদের খেলো কর নি নিজের গরজেই। সেই দাম আজ যদি ফিরিয়ে নাও নিজের খুশিকেই করবে সস্তা, ফাঁকি দেবে নিজের পাওনাকেই। কিন্তু মিথ্যে বকছি, মডার্ন্‌ কালটাই খেলো।"

অভীক জবাব দিলে, "খেলো বলব না, বলব বেহায়া। সেকালের বুড়োশিব চোখ বুজে বসেছেন ধ্যানে, একালের নন্দীভৃঙ্গী আয়না হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারাকে ব্যঙ্গ করছে— যাকে বলে debunking। জন্মেছি একালে, বোম্‌ভোলানাথের চেলা হয়ে কপালে চোখ তুলে বসে থাকতে পারব না; নন্দীভৃঙ্গীর বিদঘুটে মুখভঙ্গির নকল করতে পারলে আজকের দিনে নাম হবে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, যাও নাম করতে দশ দিককে মুখ ভেঙচিয়ে। কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলো, তোমার কাছে আশকারা পেয়ে রাজ্যের যত মেয়ে তোমাকে নিয়ে এই যে টানাটানি করে এতে কি তোমার ভালোলাগার ধার ভোঁতা হয়ে যায় না। তোমরা কথায় কথায় যাকে বল thrill, ঠেলাঠেলিতে তাকে কি পায়ের নীচে দ'লে ফেলা হয় না।"

"সত্যি কথাই বলি তবে, বী, যাকে বলে thrill, যাকে বলে ecstasy, সে হল পয়লা নম্বরের জিনিস, ভাগ্যে দৈবাৎ মেলে। কিন্তু তুমি যাকে বলছ ভিড়ের মধ্যে টানাটানি, সে হল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দোকানের মাল, কোথাও বা দাগী, কোথাও বা

ছেঁড়া, কিন্তু বাজারে সেও বিকোয়, অল্প দামে। সেরা জিনিসের পুরো দাম দিতে পারে ক'জন ধনী।"

"তুমি পার অভী, নিশ্চয় পার, পুরো মূল্য আছে তোমার হাতে। কিন্তু অদ্ভুত তোমার স্বভাব, ছেঁড়া জিনিসে, ময়লা জিনিসে তোমাদের আর্টিস্টের একটা কৌতুক আছে, কৌতূহল আছে। সুসম্পূর্ণ জিনিস তোমাদের কাছে picturesque নয়। থাক্ গে এ-সব বৃথা তর্ক। আপাতত ক্রাইসলারের পালাটা যতদূর সম্ভব এগিয়ে দেওয়া যাক।"

এই ব'লে চৌকি ছেড়ে বিভা পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এসে অভীকের হাতে একতাড়া নোট দিয়ে বললে, "এই নাও তোমার ইন্‌স্‌পিরেশন, কোম্পানি-বাহাদুরের মার্কামারা। কিন্তু তাই ব'লে তোমার ওই ঘড়ি আমাকে নিতে বোলো না।"

চৌকিতে মাথা রেখে অভীক মেঝের উপরে বসে রইল। বিভা দ্রুত পদে তার হাত টেনে নিয়ে বললে, "আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার অভাব ঘটেছে। আমার অভাব নেই এমন সুযোগে—"

বিভাকে থামিয়ে দিয়ে অভীক বললে, "অভাব আছে আমার, দারুণ অভাব। তোমার হাতেই রয়েছে সুযোগ, তা পূরণ করবার। কী হবে টাকায়।"

বিভা অভীকের হাতের উপরে স্নিগ্ধভাবে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "যা পারি নে তার দুঃখ রইল আমার মনে চিরদিন। যতটুকু পারি তার সুখ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করবে।"

"না না না, কিছুতেই না। তোমারই কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শীলাকে আমি গাড়ি চড়িয়ে বেড়াব? এ প্রস্তাবে ধিক্কার দেবে এই ভেবেছিলুম, রাগ করবে এই ছিল আশা।"

"রাগ করব কেন। তোমার দুষ্টুমি কতক্ষণের। এটা সাংঘাতিক শীলার পক্ষে, তোমার পক্ষে একটুও না। এমন ছেলেমানুষি কতবার তোমার দেখেছি, মনে মনে হেসেছি। জানি কিছুদিনের মতো এ খেলা না হলে তোমার চলে না। এও জানি স্থায়ী হলে আরও অচল হয়। হয়তো তুমি কিছু পেতে চাও, কিন্তু তোমাকে কিছু পাবে এ সইতে পার না।"

"বী, আমাকে তুমি অত্যন্ত বেশি জান তাই এমন ঘোরতর নিশ্চিন্ত থাক। জানতে পেরেছ আমার ভালো লাগে মেয়েদের কিন্তু সে ভালো-লাগা নাস্তিকেরই, তাতে বাঁধন নেই। পাথরে-গাঁথা মন্দিরে সে পূজাকে বন্দী করব না। বান্ধবীদের

সঙ্গে গলাগলির গদ্গদ্ দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখেছি, সেই বিহ্বল স্ত্রৈণতায় আমার গা কেমন করে। কিন্তু মেয়েরা আমার কাছে নাস্তিকের দেবতা, অর্থাৎ আর্টিস্টের। আর্টিস্ট খাবি খেয়ে মরে না, সে সাঁতার দেয়, দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যায়। আমি লোভী নই, আমাকে নিয়ে যে মেয়ে ঈর্ষা করে সে লোভী। তুমি লোভী নও, তোমার নিরাসক্ত মনের সব চেয়ে বড়ো দান স্বাধীনতা।"

বিভা হেসে বললে, "তোমার স্তব এখন রাখো। আর্টিস্ট, তোমরা নাবালক শিশু, এবার যে খেলাটা ফেঁদেছ তার খেলনাটি না-হয় আমার হাত থেকেই নেবে।"

"নৈব নৈব চ। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ট্রাস্টীদের মুঠো থেকে এ টাকা খসিয়ে নিলে কী করে।"

"খোলসা করে বললে হয়তো খুশি হবে না। তুমি জান অমরবাবুর কাছে আমি ম্যাথাম্যাটিক্স্ শিখছি।"

"সব-তাতেই আমাকে বহু দূরে এড়িয়ে যেতে চাও, বিদ্যেতেও?"

"বোকো না, শোনো। আমার ট্রাস্টীদের মধ্যে একজন আছেন আদিত্যমামা। নিজে তিনি গণিতে ফর্স্ট্ক্লাস মেডালিস্ট। তাঁর বিশ্বাস, যথেষ্ট সুযোগ পেলে অমরবাবু দ্বিতীয় রামানুজম্ হবেন। ওঁর কথা একটুখানি প্রব্লেম আইনস্টাইনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যা উত্তর পেয়েছিলেন সেটা আমি দেখেছি। এমন লোককে সাহায্য করতে হলে তাঁর মান বাঁচিয়ে করতে হয়। আমি তাই বললুম, ওঁর কাছে গণিত শিখব। মামা খুব খুশি। শিক্ষাখাতে ট্রাস্টফাণ্ড থেকে কিছু থোক টাকা আমার হাতে রেখে দিয়েছেন। তারই থেকে আমি ওঁকে বৃত্তি দিই।"

অভীকের মুখ কেমন একরকম হয়ে গেল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, "এমন আর্টিস্টও হয়তো আছে যে উপযুক্ত সুযোগ পেলে মিকেল আঞ্জেলোর অন্তত দাড়ির কাছটাতে পৌঁছতে পারত।"

"কোনো সুযোগ না পেলেও হয়তো পারবে পৌঁছতে। এখন বলো আমার কাছ থেকে টাকাটা নেবে কি না।"

"খেলনার দাম?"

"হাঁ গো, আমরা তো চিরকাল তোমাদের খেলনার দামই দিয়ে থাকি। তাতে দোষ কী। তার পরে আছে আঁস্তাকুড়।"

"ক্রাইসলারের আজ শ্রাদ্ধশান্তি হল এইখানেই। প্রগতিশীলার প্রগতিবেগ ভাঙা ফোর্ডেই নড়্নড়্ করতে করতে চলুক। এখন ও-সব কথা আর ভালো লাগছে না। অমরবাবু শুনেছি টাকা জমাচ্ছেন বিলেতে যাবার জন্যে, সেখান থেকে প্রমাণ করে

আসবেন তিনি সামান্য লোক নন।"

বিভা বললে, "একান্ত আশা করি, তাই যেন ঘটে। তাতে দেশের গৌরব।"

উচ্চকণ্ঠে বললে অভীক, "আমাকেও তাই প্রমাণ করতে হবে, তুমি আশা কর আর নাই কর। ওঁর প্রমাণ সহজ, লজিকের বাঁধা রাস্তায়, আর্টের প্রমাণ রুচির পথে, সে রসিক লোকের প্রাইভেট পথ। সে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নয়। আমাদের এই চোখে-ঠুলি-পরা ঘানি-ঘোরানোর দেশে আমার চলবে না। যাদের দেখবার স্বাধীন দৃষ্টি আছে, আমি যাবই তাদের দেশে। একদিন তোমার মামাকে যেন বলতে হয়, আমিও সামান্য লোক নই, আর তাঁর ভাগনীকেও—"

"ভাগনীর কথা বোলো না। তুমি মিকেল আঞ্জেলোর সমান মাপের কি না তা জানবার জন্যে তাকে সবুর করতে হয় নি। তার কাছে তুমি বিনা প্রমাণেই অসামান্য। এখন বলো, তুমি যেতে চাও বিলেতে ?"

"সে আমার দিনরাত্রির স্বপ্ন।"

"তা হলে নাও-না আমার এই দান। প্রতিভার পায়ে এই সামান্য আমার রাজকর।"

"থাক্ থাক্, ও কথা থাক্ ; কানে ঠিক সুর লাগছে না। সার্থক হোক গণিত-অধ্যাপকের মহিমা। আমার জন্যে এ যুগ না হোক পরযুগ আছে, অপেক্ষা করে থাকবে পস্টারিটি। এই আমি বলে দিচ্ছি, একদিন আসবে যেদিন অর্ধেক রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে তোমাকে বলতে হবে, নামের সঙ্গে নাম গাঁথা হতে পারত চিরকালের মতো, কিন্তু হল না।"

"পস্টারিটির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না অভী, নিষ্ঠুর শাস্তি আমার আরম্ভ হয়েছে।"

"কোন্ শাস্তির কথা তুমি বলছ জানি নে, কিন্তু জানি তোমার সব চেয়ে বড়ো শাস্তি তুমি বুঝতে পার নি আমার ছবি। এসেছে নতুন যুগ, সেই যুগের বরণসভায় আধুনিক বড়ো চৌকিটাতে আমার দেখা তোমার মিলল না।" বলেই অভীক উঠে চলল দরজার দিকে।

বিভা বললে, "যাচ্ছ কোথায়।"

"মিটিং আছে।"

"কিসের মিটিং।"

"ছুটির সময়কার ছাত্রদের নিয়ে দুর্গাপূজা করব।"

"তুমি পুজো করবে ?"

"আমিই করব। আমি যে কিছুই মানি নে। আমার সেই না-মানার ফাঁকার মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর অপদেবতার জায়গার টানাটানি হবে না। বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত ছেলেখেলা ধরাবার জন্যে আকাশ শূন্য হয়ে আছে।"

বিভা বুঝল বিভারই ভগবানের বিরুদ্ধে ওর এই বিদ্রূপ। কোনো তর্ক না করে সে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল।

অভীক দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বললে, "দেখো বী, তুমি প্রচণ্ড ন্যাশনালিস্ট। ভারতবর্ষে ঐক্যস্থাপনের স্বপ্ন দেখ। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতো নাস্তিকেরই। আমিই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।"

অভীকের নাস্তিকতা কেন যে এত হিংস্র হয়ে উঠেছে বিভা তা জানে। তাই তার উপরে রাগ করতে পারে না। কিছুতে ভেবে পায় না কী হবে এর পরিণাম। বিভার আর যা কিছু আছে সবই সে দিতে পারে, কেবল ঠেকেছে ওর পিতার ইচ্ছায়। সে ইচ্ছা তো মত নয়, বিশ্বাস নয়, তর্কের বিষয় নয়। সে ওর স্বভাবের অঙ্গ। তার প্রতিবাদ চলে না। বার বার মনে করেছে এই বাধা সে লঙ্ঘন করবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কিছুতে তার পা সরতে চায় না।

বেহারা এসে খবর দিলে, অমরবাবু এসেছেন। অভীক অবিলম্বে দুড়্‌দাড়্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল। বিভার বুকের মধ্যে মোচড়াতে লাগল। প্রথমটাতে ভাবলে, অধ্যাপককে বলে পাঠাই আজ পাঠ নেওয়া হবে না। পরক্ষণেই মনটাকে শক্ত করে বললে, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়। বসতে বল্‌। একটু বাদেই আসছি।"

শোবার ঘরে উপুড় হয়ে বিছানায় গিয়ে পড়ল। বালিশ আঁকড়ে ধরে কান্না। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে হাসিমুখে ঘরে এসে বললে, "আজ মনে করেছিলুম ফাঁকি দেব।"

"শরীর ভালো নেই বুঝি?"

"না, বেশ আছে। আসল কথা, কতকাল ধরে রবিবারের ছুটি রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, থেকে থেকে তার প্রকোপ প্রবল হয়ে ওঠে।"

অধ্যাপক বললেন, "আমার রক্তে এ পর্যন্ত ছুটির মাইক্রোব ঢোকবার সময় পায় নি। কিন্তু আমিও আজ ছুটি নেব। কারণটা বুঝিয়ে বলি। এ বছর কোপেন-হেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামেটিক্‌স্‌ কন্‌ফারেন্স্‌ হবে। আমার নাম কী করে ওদের নজরে পড়ল জানি নে। ভারতবর্ষের মধ্যে আমিই নিমন্ত্রণ পেয়েছি। এতবড়ো সুযোগ তো ব্যর্থ হতে দিতে পারি নে।"

বিভা উৎসাহের সঙ্গে বললে, "নিশ্চয় আপনাকে যেতে হবে।"

অধ্যাপক একটুখানি হেসে বললেন, "আমার উপরওয়ালা যাঁরা আমাকে ডেপুটেশনে পাঠাতে পারতেন তাঁরা রাজী নন, পাছে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। অতএব তাঁদের সেই উৎকণ্ঠা আমার ভালোর জন্যেই। তেমন কোনো বন্ধু যদি পাই যে লোকটা খুব বেশি সেয়ানা নয়, তারই সন্ধানে আজ বেরব। ধারের বদলে যা বন্ধক দেবার আশা দিতে পারি সেটাকে না পারব দাঁড়িপাল্লায় চড়াতে, না পারব কষ্টিপাথরে ঘষে দেখাতে। আমরা বিজ্ঞানীরা কিছু বিশ্বাস করবার পূর্বে প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজি, বিষয়বুদ্ধিওয়ালারাও খোঁজে— ঠকাবার জো নেই কাউকে।"

বিভা উত্তেজিত হয়ে বললে, "যেখান থেকে হোক, বন্ধু একজনকে বের করবই, হয়তো সে খুব সেয়ানা নয়, সেজন্যে ভাববেন না।"

দু-চার কথায় সমস্যার মীমাংসা হয় নি। সেদিনকার মতো একটা আধাখেঁচড়া নিষ্পত্তি হল। অমরবাবু লোকটি মাঝারি সাইজের, শ্যামবর্ণ, দেহটি রোগা, কপাল চওড়া, মাথার সামনেদিককার চুল ফুরফুরে হয়ে এসেছে। মুখটি প্রিয়দর্শন, দেখে বোঝা যায় কারও সঙ্গে শত্রুতা করবার অবকাশ পান নি। চোখদুটিতে ঠিক অন্যমনস্কতা নয়, যাকে বলা যেতে পারে দূরমনস্কতা— অর্থাৎ রাস্তায় চলবার সময় ওঁকে নিরাপদ রাখবার দায়িত্ব বাইরের লোকদেরই। বন্ধু ওঁর খুব অল্পই, কিন্তু যে কজন আছে তারা ওঁর সম্বন্ধে খুবই উচ্চ আশা রাখে, আর বাকি যে-সব চেনা লোক তারা নাক সিটকে ওঁকে বলে হাইব্রাউ। কথাবার্তা অল্প বলেন, সেটাকে লোকে মনে করে হৃদ্যতারই স্বল্পতা। মোটের উপর ওঁর জীবনযাত্রায় জনতা খুব কম। তার সাইকলজির পক্ষে আরামের বিষয় এই যে, দশজনে ওঁকে কী ভাবে সে উনি জানেনই না।

অভীকের কাছে বিভা আজ তাড়াতাড়ি যে আটশো টাকা এনে দিয়েছিল সে একটা অন্ধ আবেগে মরিয়া হয়ে। বিভার নিয়মনিষ্ঠার প্রতি তার মামার বিশ্বাস অটল। কখনও তার ব্যত্যয় হয় নি। মেয়েদের জীবনে নিয়মের প্রবল ব্যতিক্রমের ঝটকা হঠাৎ কোন্‌দিক থেকে এসে পড়ে, তিনি বিষয়ী লোক সেটা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই অকস্মাৎ অকাজের সমস্ত শাস্তি ও লজ্জা মনের মধ্যে স্পষ্ট করে দেখে নিয়েই একমুহূর্তের ঝড়ের ঝাপটে বিভা উপস্থিত করেছিল তার উৎসর্গ অভীকের কাছে। প্রত্যাখ্যাত সেই দান আবার নিয়মের পিল্‌পেগাড়ির মধ্যে

ফিরে এসেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ তার মনে নেই। স্বাধিকার লঙ্ঘন ক'রে কাউকে টাকা ধার দেবার কথা সে সাহস ক'রে মনে আনতে পারলে না। তাই বিভা প্ল্যান করেছে, মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দামী গয়না বেচে যা পাবে সেই টাকা অমরকে উপলক্ষ্য ক'রে দেবে আপন স্বদেশকে।

বিভার কাছে যে-সব ছেলেমেয়ে মানুষ হচ্ছে, ও তাদের পড়ায় সাহায্য করে। আজ রবিবার। খাওয়ার পরে এতক্ষণ ওর ক্লাস বসেছিল। সকাল-সকাল দিল ছুটি।

বাক্স বের করে মেঝের উপর একখানা কাঁথা পেতে তাতে একে একে বিভা গয়না সাজাচ্ছিল। ওদের পরিবারের পরিচিত জহুরীকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল অভীকের। প্রথমেই গয়নাগুলো তাড়াতাড়ি লুকোবার ঝোঁক হল, কিন্তু যেমন পাতা ছিল তেমনি রেখে দিলে। কোনো কারণেই অভীকের কাছে কোনো কিছু চাপা দেবে, সে ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে।

অভীক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বুঝল ব্যাপারখানা কী। বললে, "অসামান্যের পারানি কড়ি। আমার বেলায় তুমি মহামায়া, ভুলিয়ে রাখো ; অধ্যাপকের বেলায় তুমি তারা, তরিয়ে দাও। অধ্যাপক জানেন কি, অবলা নারী মৃণালভুজে তাঁকে পারে পাঠাবার উপায় করেছে ?"

"না, জানেন না।"

"জানলে কি এই বৈজ্ঞানিকের পৌরুষে ঘা লাগবে না।"

"ক্ষুদ্র লোকের শ্রদ্ধার দানে মহৎ লোকের অকুণ্ঠিত অধিকার, আমি তো এই জানি। এই অধিকার দিয়ে তাঁরা অনুগ্রহ করেন, দয়া করেন।"

"সে কথা বুঝলুম, কিন্তু মেয়েদের গায়ের গয়না আমাদেরই আনন্দ দেবার জন্যে, আমরা যত সামান্যই হই— কারও বিলেতে যাবার জন্যে নয়, তিনি যত বড়োই হোন-না। আমাদের মতো পুরুষদের দৃষ্টিকে এ তোমরা প্রথম থেকেই উৎসর্গ করে রেখেছ। এই হারখানি চুনির সঙ্গে মুক্তোর মিল করা, এ আমি একদিন তোমার গলায় দেখেছিলেম, যখন আমাদের পরিচয় ছিল অল্প। সেই প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিতে এই হারখানি এক হয়ে মিশিয়ে আছে। ওই হার কি একলা তোমার, ও যে আমারও।"

"আচ্ছা, ওই হারটা না-হয় তুমিই নিলে।"

"তোমার সত্তা থেকে ছিনিয়ে-দেওয়া হার একেবারেই যে নিরর্থক। সে যে হবে চুরি। তোমার সঙ্গে নেব ওকে সবসুদ্ধ, সেই প্রত্যাশা করেই বসে আছি।

ইতিমধ্যে ওই হার হস্তান্তর কর যদি, তবে ফাঁকি দেবে আমাকে।"

"গয়নাগুলো মা দিয়ে গেছেন আমার ভাবী বিবাহের যৌতুক। বিবাহটা বাদ দিলে ও গয়নার কী সংজ্ঞা দেব। যাই হোক, কোনো শুভ কিংবা অশুভ লগ্নে এই কন্যাটির সালংকারা মূর্তি আশা কোরো না।"

"অন্যত্র পাত্র স্থির হয়ে গেছে বুঝি?"

"হয়েছে বৈতরণীর তীরে। বরঞ্চ এক কাজ করতে পারি, তুমি যাকে বিয়ে করবে সেই বধূর জন্যে আমার এই গয়না কিছু রেখে যাব।"

"আমার জন্যে বুঝি বৈতরণীর তীরে বধূর রাস্তা নেই?"

"ও কথা বোলো না। সজীব পাত্রী সব আঁকড়ে আছে তোমার কুষ্ঠি।"

"মিথ্যে কথা বলব না। কুষ্ঠির ইশারাটা একেবারে অসম্ভব নয়। শনির দশায় সঙ্গিনীর অভাব হঠাৎ মারাত্মক হয়ে উঠলে, পুরুষের আসে ফাঁড়ার দিন।"

"তা হতে পারে, কিন্তু তার কিছুকাল পরেই সঙ্গিনীর আবির্ভাবটাই হয় মারাত্মক। তখন ওই ফাঁড়াটা হয়ে ওঠে মুশকিলের। যাকে বলে পরিস্থিতি।"

"ওই যাকে বলে বাধ্যতামুলক উদ্‌বন্ধন। প্রসঙ্গটা যদিচ হাইপথেটিক্যাল, তবু সম্ভাবনার এত কাছঘেঁষা যে এ নিয়ে তর্ক করা মিথ্যে। তাই বলছি, একদিন যখন লালচেলি-পরা আমাকে হঠাৎ দেখবে পরহস্তগতং ধনং তখন—"

"আর ভয় দেখিয়ো না, তখন আমিও হঠাৎ আবিষ্কার করব, পরহস্তের অভাব নেই।"

"ছি ছি মধুকরী, কথাটা তো ভালো শোনাল না তোমার মুখে। পুরুষেরা তোমাদের দেবী বলে স্তুতি করে, কেননা তাদের অন্তর্ধান ঘটলে তোমরা শুকিয়ে মরতে রাজি থাক। পুরুষদের ভুলেও কেউ দেবতা বলে না। কেননা অভাবে পড়লেই বুদ্ধিমানের মতো অভাব পূরণ করিয়ে নিতে তারা প্রস্তুত। সম্মানের মুশকিল তো ওই। একনিষ্ঠতার পদবিটা বাঁচাতে গিয়ে তোমাদের প্রাণে মরত হয়। সাইকলজি এখন থাক্‌, আমার প্রস্তাব এই, অমরবাবুর অমরত্বলাভের দায়িত্ব আমাদেরই উপরে দাও-না, আমরা কি ওর মূল্য বুঝি নে। গয়না বেচে পুরুষকে লজ্জা দাও কেন।"

"ও কথা বোলো না। পুরুষদের যশ মেয়েদেরই সব চেয়ে বড়ো সম্পদ। যে দেশে তোমরা বড়ো সে দেশে আমরা ধন্য।"

"এ দেশ সেই দেশই হোক। তোমাদের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবি প্রাণপণে। এ প্রসঙ্গে আমার কথাটা এখন থাক্‌, অন্য-এক সময় হবে। অমরবাবুর সফলতায় ঈর্ষা করে এমন খুদে লোক বাংলাদেশে অনেক আছে। এ দেশের

মানুষরা বড়োলোকের মড়ক। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে সেই বামনদের দলে ফেলো না। শোনো আমি কত বড়ো একটা ক্রিমিন্যাল্‌ পুণ্যকর্ম করেছি।— দুর্গাপূজার চাঁদার টাকা আমার হাতে ছিল। সে টাকা দিয়ে দিয়েছি অমরবাবুর বিলেতযাত্রার ফণ্ডে। দিয়েছি কাউকে না ব'লে। যখন ফাঁস হবে, জীববলি খোঁজবার জন্যে মায়ের ভক্তদের বাজারে দৌড়তে হবে না। আমি নাস্তিক, আমি বুঝি সত্যকার পূজা কাকে বলে। ওরা ধর্মপ্রাণ, ওরা কী বুঝবে।"

"এ কী কাজ করলে অভীক। তুমি যাকে বল তোমার পবিত্র নাস্তিকধর্ম এ কাজ কি তার যোগ্য, এ যে বিশ্বাসঘাতকতা।"

"মানি। কিন্তু আমার ধর্মের ভিত কিসে দুর্বল ক'রে দিয়েছিল তা বলি। খুব ধুম করে পূজা দেবে ব'লে আমার চেলারা কোমর বেঁধেছিল। কিন্তু চাঁদার যে সামান্য টাকা উঠল সে যেমন হাস্যকর তেমন শোকাবহ। তাতে ভোগের পাঁঠাদের মধ্যে বিয়োগান্ত নাট্য জমত না, পঞ্চমাঙ্কের লাল রঙটা হত ফিকে। আমার তাতে আপত্তি ছিল না। স্থির করেছিলেম নিজেরাই কাঠি হাতে ঢাকে ঢোলে বেতালা চাঁটি লাগাব অসহ্য উৎসাহে আর লাউকুমড়োর বক্ষ বিদীর্ণ করব স্বহস্তে খড়্গাঘাতে। নাস্তিকের পক্ষে এই যথেষ্ট, কিন্তু ধর্মপ্রাণের পক্ষে নয়। কখন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে না জানিয়ে ওদের একজন সাজল সাধুবাবা, পাঁচজন সাজল চেলা, কোনো একজন ধনী বিধবা বুড়িকে গিয়ে বললে, তার যে ছেলে রেঙ্গুনে কাজ করে, জগদম্বা স্বপ্ন দিয়েছেন, যথেষ্ট পাঁঠা আর পুরোবছরের পুজো না পেলে মা তাঁকে আস্ত খাবেন। তাঁর কাছ থেকে স্ক্রু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঁচ হাজার টাকা বের করেছে। যেদিন শুনলুম, সেইদিনই টাকাটার সংকার করেছি। তাতে আমার জাত গেল। কিন্তু টাকাটার কলঙ্ক ঘুচল। এই তোমাকে করলুম আমার কন্‌ফেশনাল। পাপ কবুল ক'রে পাপ ক্ষালন করে নেওয়া গেল। পাঁচ হাজার টাকার বাইরে আছে উনত্রিশটি মাত্র টাকা। সে রেখেছি কুমড়োর বাজারের দেনাশোধের জন্য।"

স্নিগ্ধ এসে বললে, "বচ্চু বেহারার জ্বর বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কাশি, ডাক্তারবাবু কী লিখে দিয়ে গেছেন, দেখে দাও 'সে।"

বিভার হাত চেপে ধরে অভীক বললে, "বিশ্বহিতৈষিণী, রোগতাপের তদ্‌বির করতে দিনরাত ব্যস্ত আছ, আর যে-সব হতভাগার শরীর অতি বিশ্রী রকমে সুস্থ তাদের মনে করবার সময় পাও না।"

"বিশ্বহিত নয় গো, কোনো একজন অতি সুস্থ হতভাগাকে ভুলে থাকবার জন্যেই

এত ক'রে কাজ বানাতে হয়। এখন ছাড়ো, আমি যাই, তুমি একটু বোসো, আমার গয়না সামলিয়ে রেখো।"

"আর আমার লোভ কে সামলাবে।"

"তোমার নাস্তিকধর্ম।"

কিছুকাল দেখা নেই অভীকের। চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায় নি। বিভার মুখ শুকিয়ে গেছে। কোনো কাজ করতে মন যাচ্ছে না। তার ভাবনাগুলো গেছে ঘুলিয়ে। কী হয়েছে, কী হতে পারে, তার ঠিক পাচ্ছে না। দিনগুলো যাচ্ছে পাঁজর-ভেঙে-দেওয়া বোঝার মতন। ওর কেবলই মনে হচ্ছে, অভীক ওর উপরেই অভিমান করে চলে গেছে। ও ঘরছাড়া ছেলে, ওর বাঁধন নেই, উধাও হয়ে চলে গেল; ও হয়তো আর ফিরবে না। ওর মন কেবলই বলতে লাগল, 'রাগ কোরো না, ফিরে এসো, আমি তোমাকে আর দুঃখ দেব না।' অভীকের সমস্ত ছেলেমানুষি, ওর অবিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল ততই জল পড়তে লাগল ওর দুই চক্ষু বেয়ে, কেবলই নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্কার দিলে।

এমন সময়ে এল চিঠি স্টীমারের ছাপমারা। অভীক লিখেছে—

জাহাজের স্টোকার হয়ে চলেছি বিলেতে। এঞ্জিনে কয়লা জোগাতে হবে। বলছি বটে ভাবনা কোরো না, কিন্তু ভাবনা করছ মনে করে ভালো লাগে। তবু বলে রাখি এঞ্জিনের তাতে পোড়া আমার অভ্যেস আছে। জানি তুমি এই বলে রাগ করবে যে, কেন পাথেয় দাবি করি নি তোমার কাছ থেকে। একমাত্র কারণ এই যে, আমি যে আর্টিস্ট এ পরিচয়ে তোমার একটুও শ্রদ্ধা নেই। এ আমার চিরদুঃখের কথা; কিন্তু এজন্যে তোমাকে দোষ দেব না। আমি নিশ্চয়ই জানি, একদিন সেই রসজ্ঞ দেশের গুণী লোকেরা আমাকে স্বীকার করে নেবে যাদের স্বীকৃতির খাঁটি মূল্য আছে।

অনেক মূঢ় আমার ছবির অন্যায় প্রশংসা করেছে। আবার অনেক মিথ্যুক করেছে ছলনা। তুমি আমার মন ভোলানোর জন্যে কোনোদিন কৃত্রিম স্তব কর নি। যদিও তোমার জানা ছিল, তোমার একটুখানি প্রশংসা আমার পক্ষে অমৃত। তোমার চরিত্রের অটল সত্য থেকে আমি অপরিমেয় দুঃখ পেয়েছি, তবু সেই সত্যকে দিয়েছি আমি বড়ো মূল্য। একদিন বিশ্বের কাছে যখন সম্মান পাব, তখন সব চেয়ে সত্য সম্মান আমাকে তুমিই দেবে, তার সঙ্গে হৃদয়ের সুধা মিশিয়ে। যতক্ষণ তোমার বিশ্বাস

অসন্দিগ্ধ সত্যে না পৌঁছবে ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করবে। এই কথা মনে রেখে আজ দুঃসাধ্য-সাধনার পথে চলেছি।

এতক্ষণে জানতে পেরেছ তোমার হারখানি গেছে চুরি। এ হার তুমি বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছ, এই ভাবনা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলুম না। তুমি পাঁজর ভেঙে সিঁধ কাটতে যাচ্ছিলে আমার বুকের মধ্যে। তোমার ওই হারের বদলে আমার একতাড়া ছবি তোমার গয়নার বাক্সের কাছে রেখে এসেছি। মনে মনে হেসো না। বাংলাদেশের কোথাও এই ছবিগুলো ছেঁড়া কাগজের বেশি দর পাবে না। অপেক্ষা কোরো বী, আমার মধুকরী, তুমি ঠকবে না, কখনোই না। হঠাৎ যেমন কোদালের মুখে গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁক করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগুলির দুর্মূল্য দীপ্তি হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে। তার আগে পর্যন্ত হেসো, কেননা সব মেয়ের কাছেই সব পুরুষ ছেলেমানুষ— যাদের তারা ভালোবাসে। তোমার সেই স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি আমার কল্পনায় ভরতি করে নিয়ে চললুম সমুদ্রের পারে। আর নিলুম তোমার সেই মধুময় ঘর থেকে একখানি মধুময় অপবাদ। দেখেছি তোমার ভগবানের কাছে তুমি কত দরবার নিয়ে প্রার্থনা কর, এবার থেকে এই প্রার্থনা কোরো, তোমার কাছ থেকে চলে আসার দারুণ দুঃখ যেন একদিন সার্থক হয়।

তুমি মনে মনে কখনও আমাকে ঈর্ষা করেছ কিনা জানি নে। এ কথা সত্য, মেয়েদের আমি ভালোবাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের আমার ভালো লাগে। তারা আমাকে ভালোবেসেছে, সেই ভালোবাসা আমাকে কৃতজ্ঞ করে। কিন্তু নিশ্চয় তুমি জান যে, তারা নীহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। তারা আভাস, তুমি সত্য। এ-সব কথা শোনাবে সেন্টিমেণ্টাল। উপায় নেই, আমি কবি নই। আমার ভাষাটা কলার ভেলার মতো, ঢেউ লাগলেই বাড়াবাড়ি করে দোলা দিয়ে। জানি বেদনার যেখানে গভীরতা সেখানে গম্ভীর হওয়া চাই, নইলে সত্যের মর্যাদা থাকে না। দুর্বলতা চঞ্চল, অনেকবার আমার দুর্বলতা দেখে হেসেছ। এই চিঠিতে তারই লক্ষণ দেখে একটু হেসে তুমি বলবে, এই তো ঠিক তোমার অভীর মতোই ভাবখানা। কিন্তু এবার হয়তো তোমার মুখে হাসি আসবে না। তোমাকে পাই নি ব'লে অনেক খুঁতখুঁত করেছি, কিন্তু হৃদয়ের দানে তুমি যে কৃপণ, এ কথার মতো এতবড়ো অবিচার আর কিছু হতে পারে না। আসলে এ জীবনে তোমার কাছে আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হতে পারল না। হয়তো কখনও হতে পারবে না। এই তীব্র অতৃপ্তি আমাকে এমন কাঙাল করে রেখেছে। সেইজন্যেই আর কিছু বিশ্বাস করি বা না করি, হয়তো জন্মান্তরে বিশ্বাস করতে হবে। তুমি স্পষ্ট করে আমাকে তোমার

ভালোবাসা জানাও নি কিন্তু তোমার স্তব্ধতার গভীর থেকে প্রতিক্ষণে যা তুমি দান করেছ, নাস্তিক তাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারে নি— বলেছে, অলৌকিক। এরই আকর্ষণে কোনো-এক ভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি। ঠিক জানি নে। হয়তো সবই বানানো কথা। কিন্তু হৃদয়ের একটা গোপন জায়গা আছে আমাদের নিজেরই অগোচরে, সেখানে প্রবল ঘা লাগলে কথা আপনি বানিয়ে বানিয়ে ওঠে, হয়তো সে এমন কোনো সত্য যা এতদিনে নিজে জানতে পারি নি।

বী, আমার মধুকরী, জগতে সব চেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালোবাসার কোনো একটা অসীম সত্য-ভূমিকা আছে বলে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে। আবার আমি ফিরব— তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে ; তুমি তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে বুদ্ধির বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ আর কখনও না ঘটে। তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে— আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।

তোমার নাস্তিক ভক্ত

অভীক

আশ্বিন, ১৩৪৬

শেষ কথা

জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-লর মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধ'রে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়কনায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আনে। পিছন থেকে সেই প্রাক্‌গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। তাই কিছু সময় নেব, আমি যে কে সেই কথাটাকে পরিষ্কার করবার জন্যে। কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে জানাশোনা মহলের জবাবদিহি সামলাতে পারব না। কী নাম নেব তাই ভাবছি, রোম্যান্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকেই

গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমস্বরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলে যেতে পারবে, ওর বাস্তবের শাম্‌লা রঙটা ধুয়ে ফেলে করা যেতে পারত নবারুণ সেনগুপ্ত; কিন্তু তা হলে খাঁটি শোনাত না, গল্পটা নামের বড়াই ক'রে লোকের বিশ্বাস হারাত, লোকে মনে করত ধারকরা জামিয়ার প'রে সাহিত্যসভায় বাবুয়ানা করতে এসেছে।

আমি বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আণ্ডামানতীরের খুব কাছাকাছি টান মেরেছিল। নানা বাঁকা পথে সি. আই. ডি.-র ফাঁস এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলুম আফগানিস্থান পর্যন্ত। অবশেষে পৌঁচেছি আমেরিকায় খালাসির কাজ নিয়ে। পূর্ববঙ্গীয় জেদ ছিল মজ্জায়, একদিনও ভুলি নি যে, ভারতবর্ষের হাতপায়ের শিকলে উখো ঘসতে হবে দিনরাত যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু বিদেশে কিছুদিন থাকতেই একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম, আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম, সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়ে নি ব্রিটিশ রাজতক্তে। আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলুম তখন বুঝতে পারি নি, সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না, জ্বালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল। ইতিমধ্যে য়ুরোপীয় মহাসমরের ভীষণ প্রলয়রূপ তার অতি বিপুল আয়োজন সমেত চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল— এই যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়োঘরের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করতে পারব সে দুরাশা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল; সমারোহ ক'রে আত্মহত্যা করবার মতোও আয়োজন ঘরে নেই। তখন ঠিক করলুম, ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, বাঁচতে যদি চাই আদিম যুগের হাত দুখানায় যে কটা নখ আছে তা দিয়ে লড়াই করা চলবে না। এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা; যেমন-তেমন করে মরা সহজ, কিন্তু বিশ্বকর্মার চেলাগিরি করা সহজ নয়। অধীর হয়ে ফল নেই, গোড়া থেকেই কাজ শুরু করতে হবে— পথ দীর্ঘ, সাধনা কঠিন।

দীক্ষা নিলুম যন্ত্রবিদ্যায়। ডেট্রয়েটে ফোর্ডের মোটর-কারখানায় কোনোমতে ঢুকে পড়লুম। হাত পাকাচ্ছিলুম, কিন্তু মনে হচ্ছিল না খুব বেশি দূর এগোচ্ছি। একদিন কী দুর্বুদ্ধি ঘটল, মনে হল, ফোর্ডকে যদি একটুখানি আভাস দিই যে, আমার উদ্দেশ্য নিজের উন্নতি করা নয়, দেশকে বাঁচানো, তা হলে স্বাধীনতাপূজারী আমেরিকার ধনসৃষ্টির জাদুকর বুঝি খুশি হবে, এমন কি আমার রাস্তা হয়তো করে দেবে প্রশস্ত। ফোর্ড চাপা হাসি হেসে বললে, 'আমার নাম হেন্‌রি ফোর্ড, পুরাতন ইংরেজি নাম। আমাদের ইংলণ্ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, তাদের আমি কেজো করব— এই

আমার সংকল্প।' আমি ভেবেছিলুম, ভারতীয়কেও কেজো ক'রে তুলতে উৎসাহ হতেও পারে। একটা কথা বুঝতে পারলুম, টাকাওয়ালার দরদ টাকাওয়ালাদেরই 'পরে। আর দেখলুম, এখানে চাকাতৈরির চক্রপথে শেখা বেশি দূর এগোবে না। এই উপলক্ষ্যে একটা বিষয়ে চোখ খুলে গেল, সে হচ্ছে এই যে, যন্ত্রবিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ গোড়ায় যাওয়া চাই ; যন্ত্রের মালমসলা-সংগ্রহ শিখতে হবে। ধরণী শক্তিমানদের জন্যে জমা করে রেখেছেন তাঁর দুর্গম জঠরে কঠিন খনিজ পদার্থ, এই নিয়ে দিগ্বিজয় করেছে তারা, আর গরিবদের জন্যে রয়েছে তার উপরের স্তরে ফসল—হাড় বেরিয়েছে তাদের পাঁজরায়, চুপসে গেছে তাদের পেট। আমি লেগে গেলুম খনিজবিদ্যা শিখতে। ফোর্ড বলেছে ইংরেজ অকেজো, তার প্রমাণ হয়েছে ভারতবর্ষে— একদিন হাত লাগিয়েছিল তারা নীলের চাষে আর-একদিন চায়ের চাষে— সিবিলিয়ানের দল দপ্তরখানায় তকমা-পরা 'ল অ্যাণ্ড অর্ডর'-এর ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু ভারতের বিশাল অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে পারে নি, কী মানবচিত্তের কী প্রকৃতির। ব'সে ব'সে পাটের চাষীর রক্ত নিংড়েছে। জামশেদ টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র ব'লেই মানব, 'দরিদ্রনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। প্রথম বয়সে এ রকম বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক খেলেছি— কবিদের কুমোরবাড়িতে স্বদেশের যে রাংতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয়, তারই সামনে বসে বসে অনেক চোখের জল ফেলেছি। কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রত বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গুপ্তধনের তল্লাসে, এই কাজটাকে কবির গদ্‌গদকণ্ঠের চেলারা দেশমাতৃকার পূজা বলে চিনতেই পারবে না।

ফোর্ডের কারখানাঘর ছেড়ে তার পরে ন'বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে। য়ুরোপের নানা কেন্দ্রে ঘুরেছি, হাতেকলমে কাজ করেছি, দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি— তাতে উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকদের কাছে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিক্‌কার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।

আমার ছোটোগল্পের সঙ্গে এই-সব বড়ো বড়ো কথার একান্ত যোগ নেই— বাদ দিলে চলত, হয়তো ভালোই হত। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলার দরকার ছিল, সেটা বলি। যৌবনের গোড়ার দিকে নারীপ্রভাবের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মে জীবনের

মেরুপ্রদেশের আকাশে যখন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে, তখন আমি ছিলুম অন্যমনস্ক, একেবারে কোমর বেঁধে অন্যমনস্ক। আমি সন্ন্যাসী, আমি কর্মযোগী— এই-সব বাণীর দ্বারা মনের আগল শক্ত করে আঁটা ছিল। কন্যাদায়িকরা যখন আশেপাশে আনাগোনা করেছিল, আমি স্পষ্ট করেই বলেছি, কন্যার কুষ্ঠিতে যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে, তবেই যেন কন্যার পিতা আমার কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চাত্য মহাদেশে নারীসঙ্গ ঠেকাবার বেড়া নেই। সেখানে আমার পক্ষে দুর্যোগের বিশেষ আশঙ্কা ছিল ; আমি যে সুপুরুষ, দেশে থাকতে নারীদের মুখে সে কথা চোখের মৌন ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় শোনবার সম্ভাবনা ছিল না, তাই এ তথ্যটা আমার চেতনার বাইরে পড়ে ছিল। বিলেতে গিয়ে যেমন আবিষ্কার করেছি সাধারণের তুলনায় আমার বুদ্ধি বেশি আছে, তেমনি ধরা পড়েছিল আমাকে দেখতে ভালো। আমার এদেশী পাঠকদের মনে ঈর্ষা জন্মাবার মতো অনেক কাহিনীর ভূমিকা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু হলফ করে বলছি, আমি তাদের নিয়ে ভাবের কুহকে মনকে জমাট বাঁধতে দিই নি। হয়তো আমার স্বভাবটা কড়া, পশ্চিমবঙ্গের শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় আর্দ্রচিত্ত নই ; নিজেকে পাথরের সিন্ধুক করে তার মধ্যে আমার সংকল্পকে ধরে রেখেছিলুম। মেয়েদের নিয়ে রসের পালা শুরু করে তার পরে সময় বুঝে খেলা ভঙ্গ করা, সেও ছিল আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ; আমি নিশ্চয় জানতুম, যে জেদ নিয়ে আমি আমার ব্রতের আশ্রয়ে বেঁচে আছি, এক-পা ফসকালে সেই জেদ নিয়েই আমার ভাঙা ব্রতের তলায় পিষে মরতে হবে। আমার পক্ষে এর মাঝখানে কোনো ফাঁকির পথ নেই। তা ছাড়া আমি জন্মপাড়াগেঁয়ে, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার সেকেলে সংকোচ ঘুচতে চায় না। তাই মেয়েদের ভালোবাসা নিয়ে যারা অহংকারের বিষয় করে, আমি তাদের অবজ্ঞা করি।

বিদেশী ভালো ডিগ্রিই পেয়েছিলুম। সেটা এখানে সরকারী কাজে লাগবে না জেনে ছোটোনাগপুরে চন্দ্রবংশীয় এক রাজার— মনে করা যাক, চণ্ডবীর সিংহের দরবারে কাজ নিয়েছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছেলে দেবিকাপ্রসাদ কিছুদিন কেম্ব্রিজে পড়াশুনা করেছিলেন। দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল জুরিকে, সেখানে আমার খ্যাতি তাঁর কানে গিয়েছিল। তাঁকে বুঝিয়েছিলুম আমার প্ল্যান। শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে তাঁদের স্টেটে আমাকে জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে লাগিয়ে দিলেন। এমন কাজ ইংরেজকে না দেওয়াতে উপরিস্তরের বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু দেবিকাপ্রসাদ ছিলেন ঝাঁঝালো লোক। বুড়ো রাজার মন টল্‌মল্‌ করা সত্ত্বেও টিঁকে গেলুম।

এখানে আসবার আগে মা আমাকে বললেন, "বাবা, ভালো কাজ পেয়েছ, এইবার একটি বিয়ে করো, আমার অনেক দিনের সাধ মিটুক।" আমি বললুম, "অর্থাৎ কাজ মাটি করো। আমার যে কাজ তার সঙ্গে বিয়ের তাল মিলবে না।" দৃঢ় সংকল্প, ব্যর্থ হল মায়ের অনুনয়। যন্ত্রতন্ত্র সমস্ত বেঁধে-ছেদে নিয়ে চলে এলুম জঙ্গলে।

এই বার আমার দেশব্যাপী কীর্তিসম্ভাবনার ভাবী দিগন্তে হঠাৎ যে একটুকু গল্প ফুটে উঠল, তাতে আলেয়ার চেহারাও আছে, আরও আছে শুকতারার। নীচের পাথরকে প্রশ্ন করে মাটির সন্ধানে বেড়াচ্ছিলুম বনে বনে। পলাশফুলের রাঙা রঙের মাতলামিতে তখন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরি, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যাবসাদাররা জো সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসরের রেশমের গুটি। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে মহুয়া ফল। ঝির্‌ঝির্ শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপ্‌ছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম তনিকা। এটা কারখানাঘর নয়, কলেজক্লাস নয়, এ সেই সুখতন্দ্রায় আবিল প্রদোষের রাজ্য যেখানে একলা মন পেলে প্রকৃতি-মায়াবিনী তার উপরেও রংরেজিনীর কাজ করে— যেমন সে করে সূর্যাস্তের পটে।

মনটাতে একটু আবেশের ঘোর লেগেছিল। মন্থর হয়ে এসেছিল কাজের চাল, নিজের উপরে বিরক্ত হয়েছিলুম; ভিতর থেকে জোর লাগাচ্ছিলুম দাঁড়ে। মনে ভাবছিলুম, ট্রপিকাল আবহাওয়ার মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়লুম বুঝি। শয়তানি ট্রপিক্‌স্ এ দেশে জন্মকাল থেকে হাতপাখার হাওয়ায় হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের রক্তে— এড়াতে হবে তার স্বেদসিক্ত জাদু।

বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে দুভাগে চলে গিয়েছে নদী। সেই বালুর দ্বীপে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বকের দল। দিনাবসানে রোজ এই দৃশ্যটি ইঙ্গিত করত আমার কাজের বাঁক ফিরিয়ে দিতে, ঝুলিতে মাটি-পাথরের নমুনা নিয়ে ফিরে চলছিলুম আমার বাংলোঘরে, সেখানে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে যাব। অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের যে একটা পোড়ো জমির মতো ফালতো অংশ আছে, একলা মানুষের পক্ষে সেইটে কাটিয়ে চলা শক্ত। বিশেষত নির্জন বনে। তাই আমি ওই সময়টা রেখেছি পরখ করার কাজে। ডাইনামোতে বিজলি বাতি জ্বালাই, কেমিক্যাল নিয়ে মাইক্রস্‌কোপ নিয়ে নিক্তি নিয়ে বসি। এক-একদিন রাত দুপুর পেরিয়ে যায়। আজ আমার সন্ধানে এক জায়গায় ম্যাঙ্গানিজের লক্ষণ যেন ধরা পড়েছিল। তাই দ্রুত উৎসাহে চলেছিলুম। কাকগুলো মাথার উপর দিয়ে গেরুয়া-রঙের আকাশে কা কা শব্দে চলেছিল বাসায়।

এমন সময় হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজে ফেরায়। পাঁচটি শালগাছের ব্যূহ ছিল বনের পথে একটা ঢিবির উপরে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল একটিমাত্র ফাঁকের মধ্যে দিয়ে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগঙ্গনার গাঁঠছেঁড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একটি ডায়ারির খাতা নিয়ে। এক মুহূর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেল একটি অপূর্ব বিস্ময়। জীবনে এ রকম দৈবাৎ ঘটে। পূর্ণিমার বান ডেকে আসার মতো বক্ষতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ।

গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম। একটি আশ্চর্য ছবি চিহ্নিত হতে লাগল মনের চিরস্মরণীয়াগারে। আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হল জীবনের একটা কোন্ চরমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছলুম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যস্ত নয়। যে-আঘাতে মানুষের নিজের অজানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে। বরাবর জানি, আমি পাহাড়ের মতো খটখটে, নিরেট। ভিতর থেকে উছলে পড়ল ঝরনা।

একটা-কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু মানুষের সঙ্গে সব চেয়ে বড়ো আলাপের প্রথম কথাটি কী হতে পারে ভেবে পাই নে। সে হচ্ছে খৃষ্টীয় পুরাণের প্রথম সৃষ্টির বাণী, আলো জাগুক, অব্যক্ত হয়ে যাক ব্যক্ত। এক সময়ে মনে হল— মেয়েটি— ওর আসল নাম পরে জেনেছি কিন্তু সেটা ব্যবহার করব না, ওকে নাম দিলুম অচিরা। মানে কী। মানে এই, যার প্রকাশ হতে বিলম্ব হল না, বিদ্যুতের মতো। রইল ঐ নাম। মুখ দেখে মনে হল অচিরা জানতে পেরেছে, কে একজন আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। উপস্থিতির একটা নীরব ধ্বনি আছে বুঝি। লেখা বন্ধ করেছে, অথচ উঠতে পারছে না। পলায়নটা পাছে বড্ড বেশি স্পষ্ট হয়। একবার ভাবলুম বলি, 'মাপ করুন'— কী মাপ করা, কী অপরাধ, কী বলব তাকে। একটু তফাতে গিয়ে বিলিতি বেঁটে কোদাল নিয়ে মাটিতে খোঁচা মারবার ভান করলুম, ঝুলিতে একটা কী পুরলুম, সেটা অত্যন্ত বাজে। তার পরে ঝুঁকে প'ড়ে মাটিতে বিজ্ঞানী দৃষ্টি চালনা করতে করতে চলে গেলুম। কিন্তু নিশ্চয় মনে জানি, যাঁকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলুম তিনি ভোলেন নি। মুগ্ধ পুরুষচিত্তের দুর্বলতার আরও অনেক প্রমাণ তিনি আরও অনেকবার পেয়েছেন, সন্দেহ নেই। আশা করলুম আমার বেলায় এটা তিনি

মনে-মনে উপভোগ করেছেন। এর চেয়ে বেড়া আর অল্প-একটু যদি ডিঙোতুম, তা হলে— তা হলে কী হ'ত কী জানি। রাগতেন, না রাগের ভান করতেন? অত্যন্ত চঞ্চল মন নিয়ে চলেছি আমার বাংলো ঘরের পথে, এমন সময় আমার চোখে পড়ল দুই টুকরায় ছিন্নকরা একখানা চিঠির খাম। এটাকে জিয়লজিকাল নমুনা বলে না। তবু তুলে দেখলুম। নামটা ভবতোষ মজুমদার আই. সি. এস.; ঠিকানা ছাপরা, মেয়েলি হাতে লেখা। টিকিট লাগানো আছে, তাতে ডাকঘরের ছাপ নেই। যেন কুমারীর দ্বিধা। আমার বিজ্ঞানী বুদ্ধি; স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই ছেঁড়া চিঠির খামের মধ্যে একটা ট্র্যাজেডির ক্ষতচিহ্ন আছে। পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমাদের কাজ। সেই আমার সন্ধানপটু হাত এই ছেঁড়া খামের রহস্য আবিষ্কার করতে সংকল্প করলে।

ইতিমধ্যে ভাবছি, নিজের অন্তঃকরণের রহস্য অভূতপূর্ব। এক-একটা বিশেষ অবজ্ঞার সংস্পর্শে তার ভাবখানা কী যে একটা নতুন আকারে দানা বেঁধে দেখা দেয়, এবারে তার পরিচয়ে বিস্মিত হয়েছি। এতদিন যে-মনটা নানা কঠিন অধ্যবসায় নিয়ে শহরে শহরে জীবনের লক্ষ্য সন্ধানে ঘুরেছে, তাকে স্পষ্ট করে চিনেছিলুম। ভেবেছিলুম সেই আমার সত্যকার স্বভাব, তার আচরণের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে আমি হলপ করতে পারতুম। কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধিশাসনের বহির্ভূত যে-একটা মূঢ় লুকিয়ে ছিল, তাকে এই প্রথম দেখা গেল। ধরা পড়ে গেল আরণ্যক, যে যুক্তি মানে না, যে মোহ মানে। বনের একটা মায়া আছে, গাছপালার নিঃশব্দ চক্রান্ত, আদিম প্রাণের মন্ত্র-ধ্বনি। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে তার উদাত্ত স্বর, রাতে দুপুরে মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি, গুঞ্জন করতে থাকে জীব-চেতনায়, আদিম প্রাণের গূঢ় প্রেরণায় বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে।

জিয়লজির চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এই আরণ্যক মায়ার কাজ চলছিল, খুঁজছিলুম রেডিয়মের কণা, যদি কৃপণ পাথরের মুঠির মধ্য থেকে বের করা যায়; দেখতে পেলুম অচিরাকে, কুসুমিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে। এর পূর্বে বাঙালি মেয়েকে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র ভাবে এমন একান্ত করে তাকে দেখবার সুযোগ পাই নি। এখানে তার শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করে দিল। বিদেশিনী রূপসী তো অনেক দেখেছি, যথোচিত ভালোও লেগেছে। কিন্তু বাঙালি মেয়ে এই যেন প্রথম দেখলুম, ঠিক যে-জায়গায় তাকে সম্পূর্ণ দেখা যেতে পারে, এই নিভৃত বনের মধ্যে সে নানা পরিচিত-অপরিচিত বাস্তবের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে নেই; দেখে মনে হয় না, সে বেণী দুলিয়ে ডায়োসিশনে পড়তে যায়, কিংবা বেথুন কলেজের ডিগ্রিধারিণী, কিংবা বালিগঞ্জের

টেনিসপার্টিতে উচ্চ কলহাস্যে চা পরিবেশন করে। অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় হরু ঠাকুর কিংবা রাম বসুর যে গান শুনে তারপরে ভুলে গিয়েছিলুম, যে-গান আজ রেডিয়োতে বাজে না, গ্রামোফোনে পাড়া মুখরিত করে না, জানিনে কেন মনে হল সেই গানের সহজ রাগিণীতে ঐ বাঙালি মেয়েটির রূপের ভূমিকা— মনে রইল সই মনের বেদনা। এই গানের সুরে যে-একটি করুণ ছবি আছে, সে আজ রূপ নিয়ে আমার চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠল। এও সম্ভব হল। কোন্ প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবীর-যে তলায় লুকোনো আগ্নেয় সামগ্রী উপরে উঠে পড়ে, জিয়লজি শাস্ত্রে তা পড়েছি, নিজের মধ্যে দেখলুম সেই নীচের তলায় অন্ধকারের তপ্তবিগলিত জিনিসকে হঠাৎ উপরের আলোতে। কঠোর বিজ্ঞানী নবীনমাধবের অটল অন্তঃস্তরে এই উলটপালট আমি কোনোদিন আশা করতে পারি নি।

বুঝতে পারছি, যখন আমি রোজ বিকেলবেলায় এই পথ দিয়ে আমার কাজে ফিরেছি, ও আমাকে দেখেছে, অন্যমনস্ক আমি ওকে দেখি নি। বিলেতে যাবার পর থেকে নিজের চেহারার উপর একটা গর্ব জন্মেছে। ও, হাউ হ্যাণ্ডসম— এই প্রশস্তি কানাকানিতে আমার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিলেতফেরত আমার কোনো কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছি, বাঙালি মেয়ের রুচি আলাদা, তারা মোলায়েম মেয়েলি রূপই পুরুষের রূপে খোঁজে। চলিত কথা হচ্ছে—কার্তিকের মতো চেহারা। বাঙালি কার্তিক আর যাই হোক, কোনো পুরুষে দেবসেনাপতি নয়। প্যারিসে একজন বান্ধবীর মুখে শুনেছি, বিলিতি সাদা রঙ রঙের অভাব ; ওরিয়েন্টালের দেহে গরম আকাশ যে রঙ এঁকে দেয় সে সত্যিকার রঙ, সে ছায়ার রঙ, ঐ রঙই আমাদের ভালো লাগে ; এ কথাটা বঙ্গোপসাগরের ধারে বোধ হয় খাটে না। এতদিন এ-সব আলোচনা আমার মনেই ওঠে নি। কয়েকদিন ধরে আমাকে ভাবিয়েছে। রোদে-পোড়া আমার রঙ, লম্বা আমার প্রাণসার দেহ, শক্ত আমার বাহু, দ্রুত আমার গতি, শুনেছি দৃষ্টি আমার তীক্ষ্ণ, নাক চিবুক কপাল নিয়ে সুস্পষ্ট জোরালো আমার চেহারা। এপ্স্টাইন পাথরে আমার মূর্তি গড়তে চেয়েছিল, সময় দিতে পারি নি। কিন্তু বাঙালিকে আমি মায়ের খোকা বলেই জানি, আর মায়েরা তাদের কোলের ধনকে মোমে-গড়া পুতুলের মতো দেখতেই ভালোবাসে। এ-সব কথা মনের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে আমাকে রাগিয়ে তুলছিল। আগেভাগেই কল্পনায় ঝগড়া করছিলুম অচিরার সঙ্গে, বলছিলুম, 'তুমি যাকে বলো সুন্দর সে বিসর্জনের দেবতা, তোমাদের স্তব যদি বা পায় সে, টেঁকে না বেশিদিন।' বলছিলুম, 'আমি বড়ো বড়ো দেশের স্বয়ম্বরসভার মালা উপেক্ষা করে এসেছি, আর তুমি আমাকে উপেক্ষা করবে ?' গায়ে প'ড়ে এই বানানো ঝগড়া এমনি ছেলেমানুষি

যে, একদিন হেসে উঠেছি আপন উষ্মায়। এদিকে বিজ্ঞানীর যুক্তি কাজ করছে ভিতরে ভিতরে। মনকে জানাই, এটাও একটা মস্ত কথা, আমার যাতায়াতের পথের ধারে ও বসে থাকে— একান্ত নিভৃতই যদি ওর প্রার্থনীয় হত, তা হলে ঠাঁই বদল করত। প্রথম প্রথম আমি ওকে আড়ে আড়ে দেখেছি, যেন দেখে নি এই ভান করে। ইদানীং মাঝে মাঝে স্পষ্ট চোখোচোখি হয়েছে— যতদূর আমার বিশ্বাস, সেটাকে চার চোখের অপঘাত ব'লে ওর মনে হয় নি।

এর চেয়েও বিশেষ একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। এর আগে দিনের বেলায় মাটি-পাথরের কাজ সাঙ্গ ক'রে দিনের শেষে ঐ পঞ্চবটীর পথ দিয়ে একবারমাত্র যেতেম বাসার দিকে। সম্প্রতি যাতায়াতের পুনরাবৃত্তি হতে আরম্ভ হয়েছে। এই ঘটনাটা যে জিয়লজি সম্পর্কিত নয়, সে কথা বোঝবার মতো বয়স হয়েছে অচিরার, আমারও সাহস ক্রমশ বেড়ে চলল যখন দেখলুম, এই সুস্পষ্ট ভাবের আভাসেও তরুণীকে স্থানচ্যুত করতে পারল না। এক-একদিন হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেছি, অচিরা আমার তিরোগমনের দিকে চেয়ে আছে, আমি ফিরতেই তাড়াতাড়ি ডায়ারির দিকে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। সন্দেহ হল, ওর ডায়ারি লেখার ধারায় আগেকার মতো বেগ নেই। আমার বিজ্ঞানী বুদ্ধিতে মনোরহস্যের আলোচনা জেগে উঠল। বুঝেছি সে কোনো-এক পুরুষের জন্যে তপস্যার ব্রত নিয়েছে, তার নাম ভবতোষ, সে ছাপরায় অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যাজেস্ট্রেটি করছে বিলেত থেকে ফিরে এসেই। তার পূর্বে দেশে থাকতে এদের দুজনের প্রণয় ছিল গভীর, কাজ নেবার মুখেই একটা আকস্মিক বিপ্লব ঘটেছে। ব্যাপারটা কী, খবর নিতে হবে। শক্ত হল না, কেননা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কেম্ব্রিজের সতীর্থ আছে বঙ্কিম।

তাকে চিঠি লিখে পাঠালুম, 'বেহার সিভিল সার্ভিসে আছে ভবতোষ। কন্যাকর্তাদের মহলে জনশ্রুতি শোনা যায়, লোকটি সৎপাত্র। আমার কোনো বন্ধু আমাকে তাঁর মেয়ের জন্যে ঐ লোকটিকে প্রাজাপতিক ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন। রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না, আদ্যন্ত খবর নিয়ে তুমি যদি আমাকে জানাও, কৃতজ্ঞ হব। লোকটির মতিগতি কী রকম তাও জানতে চাই।'

উত্তর এল, 'রাস্তা বন্ধ। আর মতিগতি সম্বন্ধে এখনও যদি কৌতূহল বাকি থাকে, তবে শোনো।—

'কলেজে পড়বার সময় আমি ছাত্র ছিলুম ডাক্তার অনিলকুমার সরকারের— অ্যাল্‌ফাবেটের অনেকগুলি অক্ষর জোড়া তাঁর নাম। যেমন তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তেমনি ছেলেমানুষের মতো তাঁর সরলতা। একমাত্র সংসারের আলো তাঁর নাতনিটিকে

যদি দেখো, তা হলে মনে হবে সাধনায় খুশি হয়ে সরস্বতী কেবল যে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর বুদ্ধিলোকে তা নয়, রূপ নিয়ে এসেছেন তাঁর কোলে। ঐ শয়তান ভবতোষ ঢুকল ওঁর স্বর্গলোকে। বুদ্ধি তার তীক্ষ্ণ, বচন তার অনর্গল। প্রথমে ভুললেন অধ্যাপক, তারপরে ভুলল তাঁর নাতনি। ওদের অসহ্য অন্তরঙ্গতা দেখে আমাদের হাত নিস্‌পিস্ করত। কিছু বলবার পথ ছিল না, বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকি স্থির হয়ে গিয়েছিল, কেবল অপেক্ষা ছিল বিলেত গিয়ে সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হয়ে আসার। তার পাথেয় আর খরচ জুগিয়েছেন অধ্যাপক। লোকটার সর্দির ধাত ছিল। বধির ভগবানের কাছে আমরা দুবেলা প্রার্থনা করেছি, বিবাহের পূর্বে লোকটা যেন ন্যুমোনিয়া হয়ে মরে। কিন্তু মরে নি। পাস করেছে। করেই ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ এক-জন মুরুব্বির মেয়েকে বিয়ে করেছে। লজ্জায় ক্ষোভে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে মর্মাহত মেয়েটিকে নিয়ে অধ্যাপক কোথায় যে অন্তর্ধান করেছেন, তার খবর রেখে যান নি।'

চিঠিখানা পড়লুম। দৃঢ় সংকল্প করলুম, এই মেয়েটিকে তার লজ্জা থেকে অবসাদ থেকে উদ্ধার করব।

ইতিমধ্যে অচিরার সঙ্গে কোনোরকম করে একটা কথা আরম্ভ করবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করতে লাগল। যদি বিজ্ঞানী না হয়ে হতুম সাহিত্যরসিক, কিংবা বাঙাল না হয়ে যদি হতুম পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক, তা হলে নিশ্চয় মুখে কথা বাধত না। কিন্তু বাঙালি মেয়েকে ভয় করি, চিনি নে ব'লে বোধ হয়। একটা ধারণা ছিল, হিন্দুনারী অজানা পরপুরুষমাত্রের কাছে একান্তই অনধিগম্য। খামকা কথা কইতে যাই যদি, তা হলে ওর রক্তে লাগবে অশুচিতা। সংস্কার জিনিসটা এমনি অন্ধ। এখানে কাজে যোগ দেবার পূর্বে কিছুদিন তো কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি— আত্মীয়বন্ধুমহলে দেখে এলুম সিনেমামঞ্চপথবর্তিনী রঙমাখানো বাঙালি মেয়ে, যারা জাতবান্ধবী, তাদের— থাক্ তাদের কথা। কিন্তু অচিরার কোনো পরিচয় না পেয়েই মনে হল, ও আর-এক জাতের— এ কালের বাইরে আছে দাঁড়িয়ে নির্মল আত্মমর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে। মনে-মনে কেবলই ভাবছি, প্রথম একটি কথা শুরু করব কী করে।

এই সময়ে কাছাকাছি দুই-একটা ডাকাতি হয়ে গিয়েছিল। মনে হল এই উপলক্ষে অচিরাকে বলি, 'রাজাকে ব'লে আপনার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করে দিই।' ইংরেজ মেয়ে হলে হয়তো এই গায়েপড়া আনুকূল্যকে স্পর্ধা মনে করত, মাথা বাঁকিয়ে বলত, 'সে ভাবনা আমার'; কিন্তু এই বাঙালির মেয়ে যে কী ভাবে কথাটা নেবে, আমার সে অভিজ্ঞতা নেই। দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে থেকে আমার মনের অভ্যাস অনেকখানি জড়িয়ে গেছে বিলিতি সংস্কারে।

দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এইবার অচিরার ঘরে ফেরবার সময়, কিংবা ওর দাদামশায় এসে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। এমন সময়ে একজন হিন্দুস্থানী গোঁয়ার এসে অচিরার হাত থেকে হঠাৎ তার ব্যাগ আর ডায়ারিটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি সেই মুহূর্তেই বনের আঁড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললুম, "কোনো ভয় নেই আপনার।"— এই ব'লে ছুটে সেই লোকটার ঘাড়ের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে ব্যাগ আর খাতা ফেলে দৌড় মারলে। আমি লুঠের ধন নিয়ে এসে অচিরাকে দিলুম।

অচিরা বললে, "ভাগ্যিস আপনি—"

আমি বললুম, "আমার কথা বলবেন না, ভাগ্যিস ও লোকটা এসেছিল।"

"তার মানে?"

"তার মানে, ওরই সাহায্যে আপনার সঙ্গে প্রথম কথাটা হয়ে গেল। এতদিন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না, কী যে বলি।"

"কিন্তু ও যে ডাকাত।"

"না, ও ডাকাত নয়, ও আমার বরকন্দাজ।"

অচিরা মুখে তার খয়েরী রঙের আঁচল তুলে ধ'রে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। কী মিষ্টি তার ধ্বনি, যেন ঝর্‌নার স্রোতে নুড়ির সুরওয়ালা শব্দ।

হাসি থামতেই বললে, "কিন্তু সত্যি হলে খুব মজা হত।"

"মজা হত কার পক্ষে।"

"যাকে নিয়ে ডাকাতি তার পক্ষে। এই রকম যে একটা গল্প পড়েছি।"

"তারপরে উদ্ধারকর্তার কী হত।"

"তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে দিতুম।"

"আর এই ফাঁকি উদ্ধারকর্তার কী হবে।"

"তার তো আর-কিছুতে দরকার নেই। সে তো আলাপ করবার প্রথম কথাটা চেয়েছিল— পেয়েছে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম কথা।"

"গণিতের সংখ্যাগুলো হঠাৎ ফুরোবে না তো।"

"কেন ফুরোবে।"

"আচ্ছা, আপনি হলে আমাকে প্রথম কথাটা কী বলতেন।"

"আমি হলে বলতুম, রাস্তায় ঘাটে কতকগুলো নুড়ি কুড়িয়ে কী ছেলেমানুষি করছেন। আপনার কি বয়স হয় নি।"

"কেন বলেন নি।"

"ভয় করেছিল।"

"ভয়? আমাকে ভয়?"

"আপনি যে বড়ো লোক। দাদুর কাছে শুনেছি। তিনি যে আপনার লেখা প্রবন্ধ বিলিতি কাগজে পড়েছিলেন। তিনি যা পড়েন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।"

"এটাও করেছিলেন?"

"হাঁ, করেছিলেন। কিন্তু লাটিন নামের পাহারার ঘটা দেখে জোড়হাত ক'রে বলেছিলুম, দাদু, এটা থাক্, বরঞ্চ তোমার কোয়ণ্টম থিয়োরির বইখানা নিয়ে আসি।"

"সেটা বুঝি আপনি বুঝতে পারেন?"

"কিছুমাত্র না। কিন্তু দাদুর একটা বদ্ধ সংস্কার আছে— সবাই সবকিছুই বুঝতে পারে। তাঁর সে বিশ্বাস ভাঙতে আমার ভালো লাগে না। তাঁর আর-একটা আশ্চর্য ধারণা আছে— মেয়েদের সহজবুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তাই ভয়ে ভয়ে আছি এইবার নিশ্চয়ই 'টাইম-স্পেস'-এর জোড়-মেলানো সম্বন্ধের ব্যাখ্যা আমাকে শুনতে হবে। আসল কথা, মেয়েদের উপর তাঁর করুণার অন্ত নেই। দিদিমা যখন বেঁচে ছিলেন, বড়ো বড়ো কথা পাড়লেই তিনি মুখ বন্ধ করে দিতেন। তাই মেয়েদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যে কতদূর যেতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিদিমার কাছ থেকে পান নি। আমি ওঁকে হতাশ করতে পারব না। অনেক শুনেছি, বুঝি নি, আরও অনেক শুনব আর বুঝব না।"

অচিরার দুই চোখ কৌতুকে স্নেহে জল্‌জল্ ছল্‌ছল্ করে উঠল। ইচ্ছে করছিল, স্নিগ্ধ কণ্ঠের এই আলাপ শীঘ্র যেন শেষ হয়ে না যায়। দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। সন্ধ্যার প্রথম তারা জ্বলে উঠেছে শালবনের মাথার উপরে। সাঁওতাল মেয়েরা জ্বালানি-কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, "দিদি, কোথায় তুমি। অন্ধকার হয়ে এল যে। আজকাল সময় ভালো নয়।"

"ভালো তো নয়ই দাদু, তাই একজন রক্ষাকর্তা নিযুক্ত করেছি।"

অধ্যাপক আসতেই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরিচয় দিলুম, "আমার নাম নবীনমাধব সেনগুপ্ত।"

বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, "বলেন কী, আপনিই ডাক্তার সেনগুপ্ত? আপনি তো ছেলেমানুষ।"

আমি বললুম, "নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমার বয়স ছত্রিশের বেশি নয়।"

আবার অচিরার সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি, আমার মনে যেন দুনো লয়ের ঝংকারে সেতার বাজিয়ে দিলে। বললে, "দাদুর কাছে পৃথিবীর সবাই ছেলেমানুষ, আর দাদু হচ্ছেন সকল ছেলেমানুষের আগরওয়ালা।"

অধ্যাপক বললেন, "আগরওয়ালা? একটা নতুন শব্দ বাংলায় আমদানি করলে। কোথা থেকে জোটালে।"

"সেই যে তোমার ভালোবাসার মাড়োয়ারি ছাত্র, কুন্দনলাল আগরওয়ালা; আমাকে এনে দিত বোতলে করে আমের চাটনি; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আগরওয়ালা কথাটার মানে কী। সে বলেছিল, পায়োনিয়র।"

অধ্যাপক বললেন, "ডাক্তার সেনগুপ্ত, আপনার সঙ্গে আলাপ হল যদি, আমাদের ওখানে যেতে হবে তো।"

"কিচ্ছু বলতে হবে না, দাদু। যাবার জন্যে লাফালাফি করছেন। আমার কাছে শুনেছেন, দেশকালের একজোট তত্ত্ব নিয়ে তুমি ব্যাখ্যা করবে আইন্স্টাইনের কাঁধে চ'ড়ে।"

মনে মনে বললুম, 'সর্বনাশ। কী দুষ্টুমি।'

অধ্যাপক অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আপনার বুঝি 'টাইম্-স্পেস'-এর—"

আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলুম, "কিচ্ছু বুঝি নে 'টাইম্-স্পেস'-এর। আমাকে বোঝাতে গেলে আপনার সময় নষ্ট হবে মাত্র।"

বৃদ্ধ ব্যগ্র হয়ে বলে উঠলেন, "সময়! এখানে সময়ের অভাব কোথায়। আচ্ছা, এক কাজ করুন-না, আজকে নাহয় আমাদের ওখানে আহার করবেন, কী বলেন।"

আমি লাফ দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম, 'এখ্খনি।'

অচিরা বলে উঠল, "দাদু, সাধে তোমাকে বলি ছেলেমানুষ। যখন-তখন নেমতন্ন করে তুমি আমাকে মুশকিলে ফেল। এই দণ্ডকারণ্যে ফিরপোর দোকান পাব কোথায়। ওঁরা বিলেতের ডিনার-খাইয়ে জাতের সর্বগ্রাসী মানুষ, কেন তোমার নাতনির বদনাম করবে। অন্তত ভেটকিমাছ আর ভেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তা হলে কবে আপনার সুবিধে হবে বলুন।"

"সুবিধে আমার কালই হতে পারবে। কিন্তু অচিরা দেবীকে বিপন্ন করতে চাই নে। ঘোর জঙ্গলে পাহাড়ে গুহাগহ্বরে আমাকে ভ্রমণে যেতে হয়। সঙ্গে রাখি থলে ভরে চিঁড়ে, ছড়াকয়েক কলা, বিলিতি বেগুন, কাঁচা ছোলার শাক, চিনেবাদামও কখনও থাকে। আমি সঙ্গে নিয়ে আসব ফলারের আয়োজন, অচিরা দেবী দই দিয়ে স্বহস্তে মেখে আমাকে খাওয়াবেন, এতে যদি রাজি থাকেন তা হলে কোনো কথা থাকবে না।"

"দাদু, বিশ্বাস কোরো না এ-সব লোককে। তুমি বাংলা মাসিকে লিখেছিলে বাঙালির খাদ্যে ভিটেমিনের প্রভাব, সে উনি পড়েছেন, তাই কেবল তোমাকে খুশি করবার জন্যে চিঁড়েকলার ফর্দ তোমাকে শোনালেন।"

আমি ভাবলুম, মুশকিলে ফেললে। বাংলা কাগজে ডাক্তারের লেখা ভিটামিনের তত্ত্ব পড়া কোনোকালে আমার দ্বারা সম্ভব নয়; কিন্তু কবুল করি কী করে।—বিশেষত উনি যখন উৎফুল্ল হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেটা পড়েছেন নাকি।"

আমি বললুম, "পড়ি বা না-পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না, আসল কথা—"

"আসল কথা, উনি নিশ্চয় জানেন কাল যদি ওঁকে খাওয়াই, তা হলে ওঁর পাতে পশুপক্ষী স্থাবরজঙ্গম কিছুই বাদ পড়বে না। সেই জন্যে অত নিশ্চিন্ত মনে বিলিতি বেগুনের নামকীর্তন করলেন। ওঁর শরীরটার দিকে দেখো না চেয়ে, শুধু শাকান্নে গড়া ব'লে কেউ সন্দেহ করতে পারে? দাদু, তুমি সবাইকেই অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস কর, এমনকি, আমাকেও। সেইজন্যে ঠাট্টা করে তোমাকে কিছু বলতে সাহস করি নে।"

বলতে বলতে ধীরে ধীরে আমরা ওঁদের বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ অচিরা বলে উঠল, "এইবার আপনি ফিরে যান বাসায়।"

"কেন, আমি ভেবেছিলুম আপনাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব।"

"ঘর এলোমেলো হয়ে আছে। আপনি বলবেন, বাঙালি মেয়েরা সব অগোছালো। কাল এমন ক'রে সাজিয়ে রাখব যে মেমসাহেবের কথা মনে পড়বে।"

অধ্যাপক বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না ডক্টর সেনগুপ্ত, অচি বেশি কথা কচ্ছে, কিন্তু ওর স্বভাব নয় সেটা। এখানে বড়ো নির্জন ব'লে ও জুড়ে রাখে আমার মনকে অনর্গল কথা কয়ে। সেটাই ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। ও যখন চুপ করে থাকে তখনই আমার ঘরটা যেন ছম্‌ছম্ করতে থাকে, আমার মনটাও। ও জানে সে কথা। আমার ভয় করে পাছে ওকে কেউ ভুল বোঝে।"

বুড়োর গলা জড়িয়ে ধ'রে অচিরা বললে, "বুঝুক-না দাদু, অত্যন্ত অনিন্দনীয়া হতে চাই নে, সেটা অত্যন্ত আনইণ্টারেষ্টিঙ।"

অধ্যাপক সগর্বে বলে উঠলেন, "জানেন সেনগুপ্ত, আমার দিদি কিন্তু কথা কইতে জানে, অমন আমি কাউকে দেখি নি।"

"তুমি আমার মতো কাউকে দেখো নি দাদু, আমিও কাউকে দেখি নি তোমার মতো।"

আমি বললুম, "আচার্যদেব, যাবার আগে আমাকে কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ"।

"আপনি যতবার আমাকে আপনি বলেন, আমি মনে-মনে ততবার জিভ কাটতে থাকি। আমাকে তুমি যদি বলেন, তা হলে সেটাতেই যথার্থ আপনার স্নেহে সম্মান পাব। এ বাড়িতে আমাকে তুমি-শ্রেণীতে তুলে দিতে আপনার নাতনিও সাহায্য করবেন।"

"সর্বনাশ। আমি সামান্য নাতনি, হঠাৎ অত উঁচুতে নাগাল পাব না, আপনি বড়োলোক। আমি বলি আর-কিছুদিন যাক, যদি ভুলতে পারি আপনার ডিগ্রিধারী রূপ, তা হলে সবই সম্ভব হবে। কিন্তু দাদুর কথা স্বতন্ত্র। এখনই শুরু করো। দাদু, বলো তো, তুমি কাল খেতে এসো, দিদি যদি মাছের ঝোলে নুন বেশি দিয়ে ফেলে, তা হলে ভালোমানুষের মতো সহ্য কোরো, বোলো, বাঃ কী চমৎকার, পাতে আরও একটু দিতে হবে।"

অধ্যাপক সস্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই, আর কিছুকাল আগে যদি আমার দিদিকে দেখতে, তা হলে বুঝতে পারতে, আসলে ও লাজুক। সেইজন্যে ও যখন আলাপ করা কর্তব্য মনে করে, তখন জোর করতে গিয়ে কথা বেশি হয়ে পড়ে।"

"দেখেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত, দাদু আমাকে কী রকম মধুর করে শাসন করেন। যেন ইক্ষুদণ্ড দিয়ে। অনায়াসে বলতে পারতেন, তুমি বড়ো মুখরা, তোমার প্রগল্‌ভতা অত্যন্ত অসহ্য। আপনি কিন্তু আমাকে ডিফেণ্ড করবেন। কী বলবেন, বলুন না।"

"আপনার মুখের সামনে বলব না।"

"বেশি কঠোর হবে?"

"আপনি জানেন আমার মনের কথা।"

"তা হলে থাক্। এখন বাড়ি যান।"

"একটা কথা বাকি আছে। কাল আপনাদের ওখানে যে নেমন্তন্ন সে আমার নতুন নামকরণের। কাল থেকে নবীনমাধব নাম থেকে লোপ পাবে ডাক্তার সেনগুপ্ত। সূর্যের কাছে আনাগোনা করতে গিয়ে ধূমকেতুর যেমন লেজটা যায় উড়ে, মুণ্ডটা থাকে বাকি।"

"তা হলে নামকর্তন বলুন, নামকরণ বলছেন কেন।"

"আচ্ছা, তাই সই।"

এইখানে শেষ হল আমার প্রথম বড়োদিন।

বার্ধক্যের কী প্রশান্ত সৌন্দর্য, কী সৌম্য মূর্তি। চোখদুটি যেন আশীর্বাদ করছে।

হাতে একটি পালিশ-করা লাঠি, গলায় শুভ্র পাট-করা চাদর, ধুতি যত্নে কোঁচানো, গায়ে তসরের জামা, মাথায় শুভ্র চুল বিরল হয়ে এসেছে, কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্পষ্ট বোঝা যায় এঁর সাজসজ্জায় এঁর দিনযাত্রায় নাতনির হাতের শিল্প-কার্য। ইনি যে অতিলালনের অত্যাচার সহ্য করেন, সে কেবল এই মেয়েটিকে খুশি রাখবার জন্যে।

আমার বৈজ্ঞানিক খবরকে ছাড়িয়ে উঠল, এঁদের খবর নেওয়া। অধ্যাপকের নাম ব্যবহার করব, অনিলকুমার সরকার। গত জেনেরেশনের কেম্‌ব্রিজ য়ুনিভারসিটির পি. এইচ.-ডি. দলের একজন। মাসকয়েক আগে একটি ঔপনাগরিক কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করে এখানকার স্টেটের একটা পরিত্যক্ত ডাকবাংলা ভাড়া নিয়ে নিজের খরচে সেটা বাসযোগ্য করেছেন। এইটে হল ইতিহাসের খসড়া, বাকিটুকু বঙ্কিমের চিঠি থেকে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আমার গল্পের আদিপর্ব শেষ হয়ে গেল। ছোটোগল্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না। জিনিসটাকে ফলিয়ে বলবার লোভ করব না, ওর স্বভাব নষ্ট করতে চাই নে।

অচিরার সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলার যুগ এল সংক্ষেপেই। সেদিন চড়িভাতি হয়েছিল তনিকা নদীর তীরে।

অধ্যাপক ছেলেমানুষের মতন হঠাৎ আমাকে জিগ্‌গেসা করে বসলেন, "নবীন, তোমার কি বিবাহ হয়েছে।"

প্রশ্নটা এতই সুস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জক যে, আর কেউ হলে ওটা চেপে যেত। আমি উত্তর করলুম, "না, এখনও তো হয় নি।"

অচিরার কাছে কোনো কথাই এড়ায় না। সে বললে, "দাদু, ঐ এখনও শব্দটা সংশয়গ্রস্ত কন্যাকর্তাদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। ওর কোনো যথার্থ মানে নেই।"

"একেবারে মানে যে নেই, এ কথা নিশ্চিত স্থির করলেন কী ক'রে।"

"এটা গণিতের প্রব্লেম— তাও হাইয়ার ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স্‌ বললে যা বোঝায়, তা নয়। পূর্বেই শোনা গেছে, আপনি ছত্রিশ বছরের ছেলেমানুষ। হিসেব করে দেখলুম, এর মধ্যে আপনার মা অন্তত পাঁচসাতবার আপনাকে বলেছেন, 'বাবা, ঘরে বউ আনতে চাই।' আপনি বলেছেন, 'তার আগে চাই লোহার সিন্দুকে টাকা আনতে'। মা চোখের জল মুছে চুপ করে রইলেন। তারপরে ইতিমধ্যে আপনার আর-সব হয়েছে, কেবল ফাঁসি ছিল বাকি। শেষকালে এখানকার রাজসরকারে যখন মোটা মাইনের পদ

জুটল, মা আবার বললেন, 'বাবা, এবার বিয়ে করতে হবে, আমার আর কদিন বা সময় আছে।' আপনি বললেন, 'আমার জীবন আর আমার সায়ান্স এক, সে আমি দেশকে উৎসর্গ করব। আমি কোনোদিন বিয়ে করব না।' হতাশ হয়ে আবার তিনি চোখের জল মুছে বসে আছেন। আপনার ছত্রিশ বছর বয়সের গণিতফল গণনা করতে আমার গণনায় ভুল হয়েছে কি না বলুন, সত্যি করে বলুন।"

এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা কওয়া বিপদজনক। কিছুদিন আগেই একটা ব্যাপার ঘটেছিল। প্রসঙ্গক্রমে অচিরা আমাকে বলেছিল, "আমাদের দেশে মেয়েদের আপনারা পান সংসারের সঙ্গিনীরূপে। সংসারে যাদের দরকার নেই, এদেশের মেয়েরাও তাদের কাছে অনাবশ্যক। কিন্তু বিলেতে যারা বিজ্ঞানের তপস্বী, তাদের তো উপযুক্ত তপস্বিনী জোটে, যেমন ছিল অধ্যাপক কুরির সধর্মিণী মাদাম কুরি। সে-রকম কোনো মেয়ে আপনি সে দেশে থাকতে পান নি?" মনে পড়ে গেল ক্যাথারিনের কথা। একসঙ্গে কাজ করেছি লণ্ডনে থাকতে। এমনকি, আমার একটা রিসর্চের বইয়ে আমার নামের সঙ্গে তাঁর নামও জড়িত ছিল। মানতে হল কথাটা। অচিরা বললে, "তাঁকে আপনি বিয়ে করলেন না কেন। তিনি কি রাজি ছিলেন না।"

আবার মানতে হল, "হাঁ, প্রস্তাব তাঁর দিক থেকেই উঠেছিল।"

"তবে?"

"আমার কাজ যে ভারতবর্ষের। শুধু সে তো বিজ্ঞানের নয়।"

"অর্থাৎ ভালোবাসার সফলতা আপনার মতো সাধকের কামনার জিনিস নয়। মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।"

এর জবাবটা হঠাৎ মুখে এল না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অচিরা বললে, "বাংলা সাহিত্য আপনি বোধ হয় পড়েন না। কচ ও দেবযানী ব'লে একটা কবিতা আছে। তাতে ঐ কথাই আছে, মেয়েদের ব্রত হচ্ছে পুরুষকে বাঁধা, আর পুরুষদের ব্রত সে-বাঁধন কাটিয়ে অমরলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে, আপনি কাটিয়ে এসেছেন মায়ের অনুনয়। একই কথা। মেয়েপুরুষের এই চিরকালের দ্বন্দ্বে আপনি জয়ী হয়েছেন। জয় হোক আপনার পৌরুষের। কাঁদুক মেয়েরা, সে-কান্না আপনারা নিন পূজার নৈবেদ্য। দেবতার উদ্দেশে আসে নৈবেদ্য, কিন্তু দেবতা থাকেন নিরাসক্ত।"

অধ্যাপক এই আলোচনার মূল লক্ষ্য কিছুই বুঝলেন না। সগর্বে বললেন, "দিদির মুখে গভীর সত্য কেমন বিনা চেষ্টায় প্রকাশ পায়, বাইরের লোকে শুনলে মনে করবে—"

তাঁর কেবলই ভয়, বাইরের লোক তাঁর নাতনিকে ঠিক বুঝতে পারবে না। অচিরা বললে, "বাইরের লোক মেয়েদের জেঠামি সইতে পারে না, তাদের কথা তুমি ভেবো না। তুমি আমাকে ঠিক বুঝলেই হল।"

অচিরা খুব বড়ো কথাও বলে থাকে হাসির ছলে, কিন্তু আজ সে কী গম্ভীর। আমার একটা কথা আন্দাজে মনে হল, ভবতোষ ওকে বুঝিয়েছিল যে, সে যে ভারতসরকারের উচ্চ গগনের জ্যোতির্লোক থেকে বধূ এনেছে, তারও লক্ষ্য খুব উচ্চ এবং নিঃস্বার্থ। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশাসনের ভাণ্ডার হতেই সে শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে দেশের কাজে লাগাতে। এত সহজ নয় অচিরাকে ছলনা করা। সে যে ভোলে নি, তার প্রমাণ রয়ে গেছে সেই দ্বিখণ্ডিত চিঠির খামটা থেকেই।

অচিরা আবার বললে, "দেবযানী কচকে কী অভিসম্পাত দিয়েছিল জানেন, নবীনবাবু?"

"না।"

"বলেছিল, 'তোমার জ্ঞানসাধনার ধন তুমি নিজে ব্যবহার করতে পারবে না, অন্যকে দান করতে পারবে।' আমার কাছে কথাটা আশ্চর্য বোধ হয়। যদি এই অভিসম্পাত আজ দিত কেউ য়ুরোপকে, তা হলে সে বেঁচে যেত। বিশ্বের জিনিসকে নিজের জিনিসের মতো ব্যবহার করেই ওরা লোভের তাড়ায় মরছে। সত্যি কি না বলো, দাদু"

"খুব সত্যি। কিন্তু আশ্চর্য এই, এত কথা তুমি কী করে ভাবলে।"

"নিজগুণে একটুও নয়। ঠিক এইরকম কথা তোমার কাছে অনেকবার শুনেছি। তোমার একটা মহদ্‌গুণ আছে, ভোলানাথ তুমি, কখন্‌ কী বল, সমস্ত ভুলে যাও। চোরাই মালের উপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভয় থাকে না।"

আমি বললুম, "চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা। বিদ্যায় বল, রাষ্ট্রেই বল, বড়ো বড়ো সম্রাট বড়ো বড়ো চোর। আসল কথা, তারাই ছিঁচকে চোর ছাপ মারবার পূর্বেই যারা ধরা পড়ে।"

অচিরা বললে, "ওঁর কত ছাত্র ওঁর মুখের কথা খাতায় টুকে নিয়ে বই লিখে নাম করেছে। উনি তাদের লেখা পড়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশংসা করেন। জানতেই পারেন না, নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন। আমার ভাগ্যে এ প্রশংসা প্রায়ই জোটে; নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই উনি কবুল করবেন, আমার ওরিজিন্যালিটির কথা খাতায় লিখতে শুরু করেছেন, যে-খাতায় তাম্রপ্রস্তরযুগের নোট রাখেন। মনে আছে দাদু, অনেকদিনের কথা, যখন কলেজে ছিলে, আমাকে কচ ও দেবযানীর কবিতা শুনিয়েছিলে? সেইদিন

থেকে আমি পুরুষের উচ্চ গৌরব মনে-মনে মেনেছি, কক্‌খনো মুখে স্বীকার করি নে।"

"কিন্তু দিদি, আমার কোনো কথায় আমি মেয়েদের গৌরবের লাঘব করি নি।"

"তুমি করবে? তুমি যে মেয়েদের অন্ধ ভক্ত, তোমার মুখের স্তবগান শুনে মনে-মনে হাসি। মেয়েরা নির্লজ্জ হয়ে সব মেনে নেয়। সস্তায় প্রশংসা আত্মসাৎ করা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

সেদিন এই যে কথাবার্তা হয়ে গেল, এ নেহাত হাস্যালাপ নয়। এর মধ্যে ছিল যুদ্ধের সূচনা। অচিরার স্বভাবের দুটো দিক ছিল, আর তার ছিল দুটো আশ্রয়। এক ছিল তাদের নিজেদের বাড়ি, আর ছিল সেই পঞ্চবটী। ওর সঙ্গে যখন আমার বেশ সহজ সম্বন্ধ হয়ে এসেছে, তখন স্থির করেছিলুম, ঐ পঞ্চবটীর নিভৃতে হাসিকৌতুকের ছলে আমার জীবনের সত্যসংকটের কথা কোনো রকম করে তুলব এবং নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে যাব। কিন্তু ওখানে পথ বন্ধ। আমাদের পরিচয়ের প্রথম দিনে প্রথম কথা যেমন মুখে আসছিল না, তেমনি এখানে যে-অচিরা আছে তার কাছে প্রথম কথা নেই। মোকাবিলায় ওর চরম মনের কথায় পৌঁছবার কোনো উপায় খুঁজে পাই নে। ওর ঘরের কাছে ওর সহাস্যমুখরতা রোধ করে দেয় আমার তরফের এক পা অগ্রগতি। আর ওর নিভৃত বনচ্ছায়ায় আমার সমস্ত চাঞ্চল্য ঠেকিয়ে রেখেছে নির্বাক নিঃশব্দতায়। কোনো-কোনোদিন ওদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণসভার একটা কোনো সীমানায় মন খোলবার সুযোগ পাওয়া যায়, অচিরা বুঝতে পারে আমি বিপদমণ্ডলীর কাছাকাছি আসছি, সেইদিনই ওর বাক্যবাণবর্ষণের অবিরলতা অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠে। একটুও ফাঁক পাই নে, আর আবহাওয়াও হয়ে ওঠে প্রতিকূল। আমার মন হয়েছে অত্যন্ত অশান্ত, কাজের বাধা এমনি ঘটছে যে, আমি লজ্জা পাচ্ছি মনে-মনে। সদরে বাজেটের মিটিঙে আমার রিসর্চবিভাগে আরও কিছু টাকা মঞ্জুর করে নেবার প্রস্তাব আছে, তারই সমর্থক রিপোর্ট অর্ধেকের বেশি লেখা হয় নি। ইতিমধ্যে ক্রোচের এস্‌থেটিক্‌স সম্বন্ধে আলোচনা রোজ কিছুদিন ধরে শুনে আসছি। বিষয়টা সম্পূর্ণ আমার উপলব্ধির এবং উপভোগের বাইরে—সেকথা অচিরা নিশ্চিত জানে। দাদুকে উৎসাহিত করে আর মনে-মনে হাসে। সম্প্রতি চলছে Behaviourism সম্বন্ধে যত বিরুদ্ধ যুক্তি আছে, তার ব্যাখ্যা। এই তত্ত্বালোচনার শোচনীয়তা হচ্ছে এই যে, অচিরা এই সময়টাতে ছুটি নিয়ে বাগানের কাজে চলে যায়, বলে, 'এ সব তর্ক পূর্বেই শুনেছি।' আমি বোকার মতো বসে থাকি, মাঝে-মাঝে দরজার দিকে তাকাই।

একটা সুবিধে এই যে, অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করেন না— তর্কের কোনো একটা দুরূহ গ্রন্থি বুঝতে পারছি কি না। তাঁর মনে হয় সমস্তই জলের মতো বোঝা যায়।

কিন্তু আর তো চলবে না, কোনো ছিদ্রে আসল কথাটা পাড়তেই হবে। পিক্‌নিকের এক অবকাশে অধ্যাপক যখন পোড়ো মন্দিরের সিঁড়িটাতে বসে নব্য কেমিস্ট্রির নতুন-আমদানির বই পড়ছিলেন, বেঁটে আবলুস গাছের ঝোপের মধ্যে ব'সে অচিরা হঠাৎ আমাকে বললে, "এই চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে, ক্রমেই তাকে আমার ভয় করছে।"

আমি বললুম, "আশ্চর্য, ঠিক এইরকমের কথা সেদিন আমি ডায়ারিতে লিখেছি।"

অচিরা বলে চলল, "পুরনো ইমারতের কোনো-একটা ফাটলে লুকিয়ে লুকিয়ে অশথের একটা অঙ্কুর ওঠে, তার পরে শিকড়ে শিকড়ে জড়িয়ে ধ'রে তার সর্বনাশ করে, এও তেমনি। দাদুর সঙ্গে এই কথাটাই হচ্ছিল। দাদু বলছিলেন, 'লোকালয় থেকে বহুদিন একান্ত দূরে থাকলে মানবচিত্ত প্রকৃতির প্রভাবে দুর্বল হতে থাকে, প্রবল হয়ে ওঠে আদিম প্রাণপ্রকৃতির প্রভাব।' আমি বললুম 'এ রকম অবস্থায় কী করা যায়।' তিনি বললেন, 'মানুষের চিত্তকে আমরা তো সঙ্গে করে আনতে পারি— ভিড়ের চেয়ে নির্জনে তাকে বরঞ্চ বেশি ক'রে পাই, এই দেখো-না আমার বইগুলি।' দাদুর পক্ষে বলা সহজ, কিন্তু সবাইকে এক ওষুধ খাটে না। আপনি কী বলেন।"

আমি বললুম, "আচ্ছা, বলব। আমার কথাটা ঠিকমতো বুঝে দেখবেন। আমার মত এই যে, এই রকম জায়গায় এমন একজন মানুষের সঙ্গ সমস্ত অন্তর বাহিরে পাওয়া চাই, যার প্রভাব মানবপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করে রাখতে পারে। যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ অন্ধশক্তির কাছে কেবলই হার ঘটতে থাকবে। আপনি যদি সাধারণ মেয়েদের মতো হতেন, তা হলে আপনার কাছে সত্য কথা শেষপর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে মুখে বাধত।"

অচিরা বললে, "বলুন আপনি, দ্বিধা করবেন না।"

বললুম, "আমি সায়ন্টিস্ট, যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা ইম্পার্সোনাল ভাবে বলব। আপনি একদিন ভবতোষকে অত্যন্ত ভালোবেসেছিলেন। আজও কি আপনি তাঁকে তেমনি ভালোবাসেন।"

"আচ্ছা, মনে করুন, বাসি নে।"

"আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।"

"তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই ভীষণ অন্ধশক্তি। সেইজন্যে আমি এই সরে আসাকে শ্রদ্ধা করি নে, লজ্জা পাই।"

"কেন করেন না।"

"দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গ'ড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।"

"ভালোবাসাকে আপনি এমন ক'রে গঞ্জনা দিচ্ছেন নারী হয়ে ?"

"নারী বলেই দিচ্ছি। ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জনে এতদিন সেই আদর্শকে আমি পূজা করছিলুম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না।"

"আপনি শ্রদ্ধা করতে পারেন ভবতোষকে ?"

"না।"

"তার কাছে যেতে পারেন ?"

"না। কিন্তু সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা, এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই।"

"ভালো বুঝতে পারছি নে।"

"আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের— উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়— যা কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্মনসোগোচরঃ। অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।"

আমি বললুম, "দেখুন, তর্ক করবার সময় আর নেই। এখানকার কাগজে বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। অ্যাসিস্টেণ্ট জিয়লজিস্ট লিখেছেন, এখান থেকে আরও কিছু দূরে সন্ধানের কাজ আরম্ভ করতে হবে, কিন্তু—"

"কেন গেলেন না।"

"আপনার কাছ থেকে—"

"আমার কাছ থেকে শেষ কথাটা শুনতে চান, প্রথম কথাটা পূর্বেই আদায় করা হয়েছে।"

"হাঁ, ঠিক তাই।"

"তা হলে কথাটা পরিষ্কার করে বলি। আমার ঐ পঞ্চবটীর মধ্যে ব'সে আপনার অগোচরে কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেন নি প্রখর রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয় নি কারও সঙ্গের। এক-একদিন মনে

হয়েছে হতাশ হয়ে গেছেন, যেটা পাবেন নিশ্চিত করেছিলেন সেটা পান নি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন ক'রে বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা চলছে। এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনও দেখি নি। দূরে থেকে ভক্তি করেছি।"

"এখন বুঝি—"

"না, বলি শুনুন। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি, কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে। এই তো আপনার দিকের কথা, এখন আমার কথাটা বলি। আমারও একটা সাধনা ছিল, সেও তপস্যা। তাতে আমার জীবনকে পবিত্র করবে, উজ্জ্বল করবে, এ আমি নিশ্চয় জানতুম। দেখলুম ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি— যে-চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে-মাঝে এখানকার রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে, একদিন আমার দাদুর কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বুঝি এমন প্রবৃত্তিরাক্ষস আছে। তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তখনই বিছানা ফেলে ছুটে গিয়ে ঝরনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমি স্নান করেছি।"

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিলে, "দাদু।"

অধ্যাপক তাঁর পড়া ফেলে রেখে কাছে এসে মধুর স্নেহে বললেন, "কী দিদি।"

"তুমি সেদিন বলছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে?— তার অভিব্যক্তি বয়োলজির নয়।"

"হাঁ, তাই তো আমি বলি। পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা সামনে আছে, আরও স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

"দাদু, এইবার তোমার আমার কথাটা চুকিয়ে দিই। কদিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।"

আমি উঠে পড়ে বললুম, "তা হলে আমি যাই।"

"না, আপনি বসুন। দাদু, তোমার সেই কলেজের যে অধ্যক্ষপদ তোমার ছিল, সেটা আবার খালি হয়েছে। সেক্রেটরি খুব অনুনয় ক'রে তোমাকে লিখেছেন সেই

পদ ফিরে দিতে। তুমি আমাকে সব চিঠি দেখাও, কেবল এই চিঠিটাই দেখাও নি। তাতেই তোমার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে ঐ চিঠিটা চুরি করে দেখেছি।"

"আমারই অন্যায় হয়েছিল।"

"কিচ্ছু অন্যায় হয় নি। আমি তোমাকে টেনে এনেছি তোমার আসন থেকে নীচে। আমরা কেবল নামিয়ে আনতেই আছি।"

"কী বলছ দিদি।"

"সত্যি কথাই বলছি। বিশ্বজগৎ না থাকলে বিধাতার হাত খালি হয়, ছাত্র না থাকলে তোমার তেমনি। সত্যি কথা বলো।"

"বরাবর ইস্কুলমাস্টারি করেছি কিনা তাই—"

"তুমি আবার ইস্কুলমাস্টার! তুমি born teacher, তুমি আচার্য। তোমার জ্ঞানের সাধনা নিজের জন্যে নয়, অন্যকে দানের জন্যে। দেখেন নি নবীনবাবু, মাথায় একটা আইডিয়া এলে আমাকে নিয়ে পড়েন, দয়ামায়া থাকে না; বারো আনা বুঝতে পারি নে; নইলে আপনাকে নিয়ে বসেন, সে আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। আপনার মন যে কোন্ দিকে, বুঝতেই পারেন না, ভাবেন বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিকে। দাদু, ছাত্র তোমার নিতান্তই চাই, কিন্তু বাছাই করে নিতে ভুলো না।"

অধ্যাপক বললেন, "ছাত্রই তো শিক্ষককে বাছাই করে, গরজ তো তারই।"

"আচ্ছা, সে-কথা পরে হবে। সম্প্রতি আমার চৈতন্য হয়েছে, যিনি শিক্ষক তাঁকে গ্রন্থকীট ক'রে তুলছি। এমনি ক'রে তপস্যা ভাঙি নিজের অন্ধ গরজে। সে কাজ তোমাকে নিতে হবে, এখনই যেতে হবে সেখানে ফিরে।"

অধ্যাপক হতবুদ্ধির মতো অচিরার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অচিরা বললে, "ও, বুঝেছি, তুমি ভাবছ আমার কী গতি হবে। আমার গতি তুমি। ভোলানাথ, আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হলে দিদিমা দি সেকেণ্ডের আমদানি করতে হবে, তোমার লাইব্রেরি বেচে তাঁর গয়না বানিয়ে দেবে, আমি দেব লম্বা দৌড়। অত্যন্ত অহংকার না বাড়লে এ কথা তোমাকে মানতেই হবে, আমাকে না হলে একদিনও তোমার চলে না। আমার অনুপস্থিতিতে পনেরই আশ্বিনকে পনেরই অক্টোবর ব'লে তোমার ধারণা হয়, যেদিন বাড়িতে তোমার সহযোগী অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ, সেইদিনই লাইব্রেরিঘরে দরজা বন্ধ ক'রে নিদারুণ একটা ইকোয়েশন কষতে লেগে যাও। গাড়িতে চ'ড়ে ড্রাইভরকে যে-ঠিকানা দাও সে ঠিকানায় আজও বাড়ি তৈরি হয় নি। নবীনবাবু মনে করছেন আমি অত্যুক্তি করছি।"

আমি বললুম, "একেবারেই না। কিছুদিন তো ওঁকে দেখছি, তার থেকেই অসন্দিগ্ধ বুঝেছি, আপনি যা বলছেন তা খাঁটি সত্য।"

"আজ এত অলুক্ষণে কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে কেন। জান নবীন, এই রকম যা-তা বলবার উপসর্গ ওর সম্প্রতি দেখা দিয়েছে।"

"সব লক্ষণ শান্ত হয়ে যাবে, তুমি চলো দেখি তোমার কাজে। নাড়ি আবার ফিরে আসবে। থামবে প্রলাপ-বকুনি।"

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার কী পরামর্শ নবীন।"

উনি পণ্ডিত মানুষ ব'লেই জিয়লজিস্টের বুদ্ধির 'পরে ওঁর এত শ্রদ্ধা। আমি একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললুম, "অচিরা দেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।"

অচিরা উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হঠে গেলুম। অচিরা বললে, "সংকোচ করবেন না, আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে। এইখানেই শেষ বিদায় নিলুম। যাবার আগে আর কিন্তু দেখা হবে না।"

অধ্যাপক আশ্চর্য হয়ে বললেন, "সে কী কথা দিদি।"

"দাদু, তুমি অনেক কিছু জান, কিন্তু অনেক কিছু সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি অনেক বেশি, সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করে নিয়ো।"

আমি পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলুম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে বুকে আলিঙ্গন ক'রে ধরে বললেন, "আমি জানি সামনে তোমার কীর্তির পথ প্রশস্ত।"

এইখানে আমার ছোটো গল্প ফুরল। তার পরেকার কথা জিয়লজিস্টের। বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ডগুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল— বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ ক'রে বারান্দায় এসে বোধ হল— খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।

৪, ১০, ৩৯

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

ল্যাবরেটরি

১

নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাশ করা এঞ্জিনিয়ার। যাকে সাধুভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপ্যমান ছাত্র অর্থাৎ ব্রিলিয়াণ্ট, তিনি ছিলেন তাই। স্কুল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার তোরণে তোরণে ছিলেন পয়লা শ্রেণীর সওয়ারী।

ওঁর বুদ্ধি ছিল ফলাও, ওঁর প্রয়োজন ছিল দরাজ, কিন্তু ওঁর অর্থসম্বল ছিল আঁটমাপের।

রেলওয়ে কোম্পানির ছুটো বড়ো ব্রিজ তৈরি করার কাজের মধ্যে উনি ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন। ও-কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর, কিন্তু দৃষ্টান্তটা সাধু নয়। এই ব্যাপারে যখন তিনি ডানহাত বাঁহাত ছুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করেছিলেন তখন তাঁর মন খুঁতখুঁত করে নি। এ সব কাজের দেনাপাওনা নাকি কোম্পানি নামক একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট সত্তার সঙ্গে জড়িত, সেইজন্যে কোনো ব্যক্তিগত লাভলোকসানের তহবিলে এর পীড়া পৌঁছয় না।

ওঁর নিজের কাজে কর্তারা ওঁকে জীনিয়স বলত, নিখুঁত হিসাবের মাথা ছিল তাঁর। বাঙালি বলেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাঁর জোটে নি। নীচের দরের বিলিতি কর্মচারী প্যাণ্টের ছুই ভরা-পকেটে হাত গুঁজে যখন পা ফাঁক করে 'হ্যালো মিস্টার মল্লিক' ব'লে ওঁর পিঠ-থাবড়া দিয়ে কর্তাত্বি করত তখন ওঁর ভালো লাগত না। বিশেষত যখন কাজের বেলা ছিলেন উনি, আর দামের বেলা আর নামের বেলা ওরা। এর ফল হয়েছিল এই যে, নিজের ন্যায্য প্রাপ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল, সেটা পুষিয়ে নেবার ফন্দি জানতেন ভালো করেই।

পাওনা এবং অপাওনার টাকা নিয়ে নন্দকিশোর কোনোদিন বাবুগিরি করেন নি। থাকতেন শিকদারপাড়া গলির একটা দেড়তলা বাড়িতে। কারখানাঘরের দাগ-দেওয়া কাপড় বদলাবার ওঁর সময় ছিল না। কেউ ঠাট্টা করলে বলতেন, 'মজুর মহারাজের তকমা-পরা আমার এই সাজ।'

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্যে বিশেষ করে তিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন খুব মস্ত। এমন মশগুল ছিলেন নিজের শখ নিয়ে যে, কানে উঠত না লোকেরা বলাবলি করছে, এত বড়ো ইমারতটা যে আকাশ ফুঁড়ে উঠল— আলাদিনের প্রদীপটা ছিল কোথায়।

একরকমের শখ মানুষকে পেয়ে বসে সেটা মাতলামির মতো, হুঁশ থাকে না যে লোকে সন্দেহ করছে। লোকটা ছিল সৃষ্টিছাড়া, ওঁর ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। ক্যাটালগের তালিকা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর সমস্ত মনপ্রাণ চৌকির দুই হাতা আঁকড়ে ধরে উঠত ঝেঁকে ঝেঁকে। জর্মনি থেকে আমেরিকা থেকে এমন-সব দামী দামী যন্ত্র আনাতেন যা ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলে না। এই বিদ্যালোভীর মনে সেই তো ছিল বেদনা। এই পোড়াদেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিষ্ট নিয়ে সস্তা দরের পাতা পাড়া হয়। ওদের দেশে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যবহারের যে সুযোগ আছে আমাদের দেশে না থাকাতেই ছেলেরা টেক্সটবুকের শুকনো পাতা থেকে কেবল এঁটোকাঁটা হাতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হেঁকে উঠে বলতেন, ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্যে বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া ক'রে, এই হল ওঁর পণ।

দুর্মূল্য যন্ত্র যত সংগ্রহ হতে লাগল, ওঁর সহকর্মীদের ধর্মবোধ ততই অসহ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে ওঁকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচালেন বড়োসাহেব। নন্দকিশোরের দক্ষতার উপর তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। তা ছাড়া রেলওয়ে কাজে মোটা মোটা মুঠোর অপসারণদক্ষতার দৃষ্টান্ত তাঁর জানা ছিল।

চাকরি ছাড়তে হল। সাহেবের আনুকূল্যে রেল-কোম্পানির পুরনো লোহালক্কড় সস্তা দামে কিনে নিয়ে কারখানা ফেঁদে বসলেন। তখন য়ুরোপের প্রথম যুদ্ধের বাজার সরগরম। লোকটা অসামান্য কৌশলী, সেই বাজারে নতুন নতুন খালে নালায় তাঁর মুনফার টাকায় বান ডেকে এল।

এমনসময় আর-একটা শখ পেয়ে বসল ওঁকে।

এক সময়ে নন্দকিশোর পাঞ্জাবে ছিলেন তাঁর ব্যাবসার তাগিদে। সেখানে জুটে গেল তাঁর এক সঙ্গিনী। সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটি ঘাগরা দুলিয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত— জ্বলজ্বলে তার চোখ, ঠোঁটে একটি হাসি আছে, যেন শান-দেওয়া ছুরির মতো। সে ওঁর পায়ের কাছে ঘেঁসে এসে বললে, "বাবুজি, আমি কয়দিন ধরে এখানে এসে দু'বেলা তোমাকে দেখছি। আমার তাজ্জব লেগে গেছে।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কেন, এখানে তোমাদের চিড়িয়াখানা নেই নাকি।"

সে বললে, "চিড়িয়াখানার কোনো দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে। আমি তাই মানুষ খুঁজছি।"

"খুঁজে পেলে?"

নন্দকিশোরকে দেখিয়ে বললে, "এই তো পেয়েছি।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কী গুণ দেখলে বলো দেখি।"

ও বললে, "এখানকার বড়ো বড়ো সব শেঠজি, গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে হীরার আংটি, তোমাকে ঘিরে এসেছিল—ভেবেছিল বিদেশী, বাঙালি, কারবার বোঝে না। শিকার জুটেছে ভালো। কিন্তু দেখলুম তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না। উলটে ওরা তোমারই ফাঁসকলে পড়েছে। কিন্তু তা ওরা এখনও বোঝে নি, আমি বুঝে নিয়েছি।"

নন্দকিশোর চমকে গেল কথা শুনে। বুঝলে একটি চিজ বটে— সহজ নয়।

মেয়েটি বললে, "আমার কথা তোমাকে বলি, তুমি শুনে রাখো। আমাদের পাড়ায় একজন ডাকসাইটে জ্যোতিষী আছে। সে আমার কুষ্টি গণনা করে বলেছিল, একদিন দুনিয়ায় আমার নাম জাহির হবে। বলেছিল আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে।"

নন্দকিশোর বললে, "বল কী। শয়তানের?"

মেয়েটি বললে, "জানো তো বাবুজি, জগতে সব চেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। আমাদের বাবা বোম্‌ভোলানাথ ভোঁ হয়ে থাকেন। তাঁর কর্ম নয় সংসার চালানো। দেখো-না, সরকার বাহাদুর শয়তানির জোরে দুনিয়া জিতে নিয়েছে, খৃস্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে। যেদিন কথার খেলাপ করবে, সেদিন ঐ শয়তানেরই কাছে কানমলা খেয়ে মরবে।"

নন্দকিশোর আশ্চর্য হয়ে গেল।

মেয়েটি বললে, "বাবু, রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন্ পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।"

নন্দকিশোর হেসে বললে, "কী করতে হবে।"

"দেনার দায়ে আমার আইমার বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে সেই দেনা শোধ করে দিতে হবে।"

"কত টাকা দেনা তোমার।"

"সাত হাজার টাকা।"

নন্দকিশোরের চমক লাগল, ওর দাবির সাহস দেখে। বললে, "আচ্ছা আমি দিয়ে দেব, কিন্তু তার পরে ?"

"তার পরে আমি তোমার সঙ্গ কখনও ছাড়ব না।"

"কী করবে তুমি।"

"দেখব, যেন কেউ তোমায় ঠকাতে না পারে আমি ছাড়া।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, রইল কথা, এই পরো আমার আংটি।"

কষ্টিপাথর আছে ওঁর মনে, তার উপরে দাগ পড়ল একটা দামী ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্‌ ঝক্‌ করছে ক্যারেক্‌টরের তেজ— বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই। নন্দকিশোর অনায়াসে বললে, 'দেব টাকা'— দিলে সাত হাজার বুড়ী আইমাকে।

মেয়েটিকে ডাকত সবাই সোহিনী ব'লে। পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা। কিন্তু চেহারায় মন টলাবে, নন্দকিশোর সে জাতের লোক ছিলেন না। যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময়ই ছিল না তাঁর।

নন্দকিশোর ওকে যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়, এবং নিভৃত নয়। কিন্তু ঐ একরোখা একগুঁয়ে মানুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত, বিয়ে করেছ কি। উত্তরে শুনত, বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহ্যমতো। লোকে হাসত যখন দেখত, উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, "ও কি প্রোফেসারি করতে যাবে নাকি।" নন্দ বলতেন, "না, ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।" বলত, "আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করি নে।"

"সে কী হে।"

"স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"

২

নন্দকিশোর মারা গেলেন প্রৌঢ় বয়সে কোন্‌-এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে।

সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দিলে। বিধবা মেয়েদের ঠকিয়ে খাবার ব্যাবসাদার এসে পড়ল চার দিক থেকে। মামলার ফাঁদ ফাঁদলে আত্মীয়তার ছিটেফোঁটা

আছে যাদের। সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তাঁর অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার আনার কোনো বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিলে একে একে, দূর সম্পর্কের দেওর গেল জেলে দলিল জাল করার অপরাধে।

ওদের একটি মেয়ে আছে, তার নামকরণ হয়েছিল নীলিমা। মেয়ে স্বয়ং সেটিকে বদল করে নিয়েছে— নীলা। কেউ না মনে করে, বাপ-মা মেয়ের কালো রঙ দেখে একটা মোলায়েম নামের তলায় সেই নিন্দেটি চাপা দিয়েছে। মেয়েটি একেবারে ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ। মা বলত, ওদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল— মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেতপদ্মের আভা, চোখেতে নীলপদ্মের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ।

মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না। একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেলকি। অল্প বয়সের মাড়োয়ারি ছেলে, তার টাকা পৈতৃক, শিক্ষা এ কালের। অকস্মাৎ সে পড়ল এসে অনঙ্গের অলক্ষ্য ফাঁদে। নীলা একদিন গাড়ির অপেক্ষায় ইস্কুলের দরজার কাছে ছিল দাঁড়িয়ে। সেই সময় ছেলেটি দৈবাৎ তাকে দেখেছিল। তার পর থেকে আরও কিছুদিন ঐ রাস্তায় সে বায়ুসেবন করেছে। স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির প্রেরণায় মেয়েটি গাড়ি আসবার বেশ কিছুক্ষণ পূর্বেই গেটের কাছে দাঁড়াত। কেবল সেই মাড়োয়ারি ছেলে নয়, আরও দুচার সম্প্রদায়ের যুবক ঐখানটায় অকারণ পদচারণার চর্চা করত। তার মধ্যে ঐ ছেলেটিই চোখ বুজে দিল ঝাঁপ ওর জালের মধ্যে। আর ফিরল না। সিভিল মতে বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশি দিনের মেয়াদে নয়। তার ভাগ্যে বধূটি এল প্রথমে, তার পরে দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তার পরে মুক্তি।

সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টিতে মিশিয়ে উপদ্রব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্‌বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদুষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্পে। মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। বন্ধুত্বপ্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পৌঁছয় না কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়।

বই পড়ে যে বই টেক্স্ট্‌বুক কমিটির অনুমোদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্টশিক্ষার আনুকূল্য করে ব'লে বিড়ম্বিত। ওর বিদুষী শিক্ষয়িত্রীকে পর্যন্ত অন্যমনস্ক করে দিলে। ডায়োসিশন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে আলুথালুচুলওয়ালা গোঁফের-রেখামাত্র-দেওয়া সুন্দরহানো এক ছেলে ওর গাড়িতে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। ওর রক্ত উঠেছিল ছম্ ছম্ ক'রে। চিঠিখানা লুকিয়ে রেখেছিল জামার মধ্যে। ধরা পড়ল মায়ের কাছে। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে কাটল অনাহারে।

সোহিনীর স্বামী যাদের বৃত্তি দিয়েছিলেন, সেই-সব ভালো ভালো ছাত্রমহলে সোহিনী পাত্র সন্ধান করেছে। সবাই প্রায় আড়ে আড়ে ওর টাকার থলির দিকে তাকায়। একজন তো তার থিসিস ওর নামে উৎসর্গ করে বসল। ও বললে, "হায় রে কপাল, লজ্জায় ফেললে আমাকে। তোমার পোস্টগ্রাজুয়েটী মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে শুনলুম, অথচ মালাচন্দন দিলে অজায়গায়, হিসাব করে ভক্তি না করলে উন্নতি হবে না যে।" কিছুদিন থেকে একটি ছেলের দিকে সোহিনী দৃষ্টিপাত করছিল। ছেলেটি পছন্দসই বটে। তার নাম রেবতী ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে সায়ান্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে। ওর দুটো-একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।

৩

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবার কলাকৌশল সোহিনীর ভালো করেই জানা আছে। মন্মথ চৌধুরী রেবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক। তাঁকে নিলে বশ করে। কিছুদিন চায়ের সঙ্গে রুটিটোস্ট, অমলেট, কখনও বা ইলিশমাছের ডিমের বড়া খাইয়ে কথাটা পাড়লে। বললে, "আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আপনাকে বারে বারে চা খেতে ডাকি কেন।"

"মিসেস মল্লিক, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি, সেটা আমার দুর্ভাবনার বিষয় নয়।"

সোহিনী বললে, "লোকে ভাবে, আমরা বন্ধুত্ব করে থাকি স্বার্থের গরজে।"

"দেখো মিসেস মল্লিক, আমার মত হচ্ছে এই—গরজটা যারই হোক, বন্ধুত্বটাই তো লাভ। আর এই বা কম কথা কী, আমার মতো অধ্যাপককে দিয়েও কারও স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। এ জাতটার বুদ্ধি কেতাবের বাইরে হাওয়া খেতে পায় না ব'লে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, যদিও আমি মাস্টারি করি তবু ঠাট্টা করতেও পারি। দ্বিতীয়বার চা খেতে ডাকবার পূর্বে এটা জেনে রাখা ভালো।"

"জেনে রাখলুম, বাঁচলুম। অনেক অধ্যাপক দেখেছি, তাঁদের মুখ থেকে হাসি বের করতে ডাক্তার ডাকতে হয়।"

"বাহবা, আমারই দলের লোক দেখছি তুমি। তা হলে এবার আসল কথাটা পাড়া হোক।"

"জানেন বোধ হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ঐ ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দেবে বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যের কথা।"

অধ্যাপক বললেন, "যোগ্য ছেলেই বটে। তার যে লাইনের বিদ্যে সেটাকে শেষ পর্যন্ত চালান করতে মালমসলা কম লাগবে না।"

সোহিনী বললে, "আমার রাশকরা টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে। আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুরদেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ও সব কিছুই বিশ্বাস করি নে।"

চৌধুরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "তুমি তবে কী মান।"

"মানুষের মতো মানুষ যদি পাই, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চাই যতদূর আমার সাধ্য আছে। এই আমার ধর্মকর্ম।"

চৌধুরী বললেন, "হুররে। শিলা ভাসে জলে। মেয়েদের মধ্যেও দৈবাৎ কোথাও কোথাও বুদ্ধির প্রমাণ মেলে দেখছি। আমার একটি বি. এসসি. বোকা আছে, সেদিন হঠাৎ দেখি, গুরুর পা ছুঁয়ে সে উলটো ডিগবাজি খেলতে লেগেছে, মগজ থেকে বুদ্ধি যাচ্ছে উড়ে ফাটা শিমুলের তুলোর মতো। তা তোমার বাড়িতেই ওকে ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দিতে চাও? তফাতে আর কোথাও হলে হয় না?"

"চৌধুরীমশায়, আপনি ভুল করবেন না, আমি মেয়েমানুষ। এইখানেই এই ল্যাবরেটরিতেই হয়েছে আমার স্বামীর সাধনা। তাঁর ঐ বেদির তলায় কোনো-একজন যোগ্য লোককে বাতি জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে যদি বসিয়ে দিতে পারি, তা হলে যেখানে থাকুন তাঁর মন খুশি হবে।"

চৌধুরী বললেন, "বাই জোভ, এতক্ষণে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শুনতে খারাপ লাগল না। একটা কথা জেনে রেখো, রেবতীকে যদি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সাহায্য করতে চাও তা হলে লাখটাকারও লাইন পেরিয়ে যাবে।"

"গেলেও আমার খুদকুঁড়ো কিছু বাকি থাকবে।"

"কিন্তু পরলোকে যাঁকে খুশি করতে চাও তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে না তো? শুনেছি তাঁরা ইচ্ছা করলে ঘাড়ে চড়ে লাফালাফি করতে পারেন।"

"আপনি খবরের কাগজ পড়েন তো। মানুষ মারা গেলেই তার গুণাবলী প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে ছাপিয়ে পড়তে থাকে। সেই মৃত মানুষের বদান্যতার 'পরে ভরসা করলে তো দোষ নেই। টাকা যে মানুষ জমিয়েছে অনেক পাপ জমিয়েছে সে তার সঙ্গে, আমরা কী করতে আছি যদি থলি ঝেড়ে স্বামীর পাপ হালকা করতে না পারি। যাক গে টাকা, আমার টাকায় দরকার নেই।"

অধ্যাপক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "কী আর বলব তোমাকে। খনি থেকে সোনা ওঠে, সে খাঁটি সোনা, যদিও তাতে মিশোল থাকে অনেক-কিছু। তুমি সেই ছদ্মবেশী সোনার ঢেলা। চিনেছি তোমাকে। এখন কী করতে হবে বলো।"

"ঐ ছেলেটিকে রাজি করিয়ে দিন।"

"চেষ্টা করব, কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। আর কেউ হলে তোমার দান লাফিয়ে নিত।"

"কোথায় বাধছে বলুন।"

"শিশুকাল থেকে একটি মেয়ে-গ্রহ ওর কুষ্টি দখল করে বসেছে। রাস্তা আগলে রয়েছে অটল অবুদ্ধি।"

"বলেন কী। পুরুষমানুষ—"

"দেখো মিসেস মল্লিক, রাগ করবে কাকে নিয়ে। জান মেট্রিয়ার্কাল সমাজ কাকে বলে। যে সমাজে মেয়েরাই হচ্ছে পুরুষের সেরা। এক সময়ে সেই দ্রাবিড়ী সমাজের ঢেউ বাংলাদেশে খেলত।"

সোহিনী বললে, "সে সুদিন তো গেছে। তলায় তলায় ঢেউ খেলে হয়তো, ঘুলিয়ে দেয় বুদ্ধিসুদ্ধি, কিন্তু হাল যে একলা পুরুষের হাতে। কানে মন্ত্র দেন তাঁরাই, আর জোরে দেন কানমলা। কান ছিঁড়ে যাবার জো হয়।"

"আহা হা, কথা কইতে জান তুমি। তোমার মতো মেয়েদের যুগ যদি আসে তা হলে মেট্রিয়ার্কাল সমাজে ধোবার বাড়ির ফর্দ রাখি মেয়েদের শাড়ির, আর আমাদের কলেজের প্রিন্সিপল্‌কে পাঠিয়ে দিই ঢেঁকি কুটতে। মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি। তোমাকে খবর দিচ্ছি, রেবতীর বুদ্ধির ডগার উপরে চড়ে বসে আছে একটি রীতিমতো মেয়ে।"

"কাউকে ভালোবাসে নাকি।"

"আহা, সেটা হলে তো বুঝতুম, ওর শিরায় প্রাণ করছে ধুকধুক্‌। যুবতীর হাতে বুদ্ধি খোয়াবার বায়না নিয়েই তো এসেছে, এই তো সেই বয়েস। তা না হয়ে এই

কাঁচা বয়সে ও যে এক মালাজপকারিণীর হাতে মালার গুটি বনে গেছে। ওকে বাঁচাবে কিসে— না যৌবন, না বুদ্ধি, না বিজ্ঞান।"

"আচ্ছা একদিন ওঁকে এখানে চা খেতে ডাকতে পারি কি। আমাদের মতো অশুচির ঘরে খাবেন তো ?"

"অশুচি! না খায় তো ওকে আছড়ে আছড়ে এমনি শুচি করে নেব যে বামনাইয়ের দাগ থাকবে না ওর মজ্জায়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাকি একটি সুন্দরী মেয়ে আছে ?"

"আছে। পোড়াকপালী সুন্দরীও বটে। তা কী করব বলুন।"

"না না, আমাকে ভুল কোরো না। আমার কথা যদি বল, সুন্দরী মেয়ে আমি পছন্দই করি। ওটা আমার একটা রোগ বললেই হয়। কিন্তু ওর আত্মীয়েরা বেরসিক, ভয় পেয়ে যাবে।"

"ভয় নেই, আমি নিজের জাতেই মেয়ের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।"

এটা একেবারে বানানো কথা।

"তুমি নিজে তো বেজাতে বিয়ে করেছ।"

"নাকাল হয়েছি কম নয়। বিষয়ের দখল নিয়ে মামলা করতে হয়েছে বিস্তর। যে করে জিতেছি সেটা বলবার কথা নয়।"

"শুনেছি কিছু কিছু। বিপক্ষ পক্ষের আর্টিকেল্‌ড্‌ ক্লার্ক্‌কে নিয়ে তোমার নামে গুজব রটেছিল। মকদ্দমায় জিতে তুমি তো সরে পড়লে, সে লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যায় আর কি।"

"এত যুগ ধরে মেয়েমানুষ টিঁকে আছে কী ক'রে। ছল করার কম কৌশল লাগে না, লড়াইয়ের তাগবাগের সমানই সে, তবে কিনা তাতে মধুও কিছু খরচ করতে হয়। এ হল নারীর স্বভাবদত্ত লড়াইয়ের রীতি।"

"ঐ দেখো, আবার তুমি আমাকে ভুল করছ। আমরা বিজ্ঞানী, আমরা বিচারক নই, স্বভাবের খেলা আমরা নিষ্কাম ভাবে দেখে যাই। সে খেলায় যা ফল হবার তা ফলতে থাকে। তোমার বেলায় ফলটা বেশ হিসেবমতোই ফলেছিল, বলেছিলুম, ধন্য মেয়ে তুমি। এ কথাটাও ভেবেছি, আমি যে তখন প্রোফেসর ছিলুম, আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক্‌ ছিলুম না, সেটা আমার বাঁচোয়া। মার্করি সূর্যের কাছ থেকে যতটুকু দূরে আছে ততটুকু দূরে থেকেই বেঁচে গেল। ওটা গণিতের হিসাবের কথা, ওতে ভালো নেই মন্দ নেই। এসব কথা বোধ হয় তুমি বুঝতে শিখেছ।"

"তা শিখেছি। গ্রহগুলো টান মেনে চলে আবার টান এড়িয়ে চলে— এটা

একটা শিখে নেবার তত্ত্ব বই কি।"

"আর-একটা কথা কবুল করছি। এইমাত্র তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটা হিসেব মনে মনে কষছিলুম, সেও অঙ্কের হিসেব। ভেবে দেখো, বয়সটা যদি অন্তত দশটা বছর কম হত তা হলে খামকা আজ একটা বিপদ ঘটত। কোলিশন ঐটুকু পাশ কাটিয়ে গেল আর কি! তবু বাষ্পের জোয়ার উঠছে বুকের মধ্যে। ভেবে দেখো, সৃষ্টিটা আগাগোড়াই কেবল অঙ্ককষার খেলা।"

এই ব'লে চৌধুরী দুই হাঁটু চাপড়িয়ে হাহা করে হেসে উঠলেন। একটা কথা তাঁর হুঁশ ছিল না যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আগে সোহিনী দুঘণ্টা ধরে রঙে চঙে এমন করে বয়স বদল করেছে যে সৃষ্টিকর্তাকে আগাগোড়াই দিয়েছে ঠকিয়ে।

৪

পরের দিন অধ্যাপক এসে দেখলেন সোহিনী রোঁয়া-ওঠা হাড়-বের-করা একটা কুকুরকে স্নান করিয়ে তোয়ালে দিয়ে তার গা মুছিয়ে দিচ্ছে।

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "এই অপয়মন্তটাকে এত সম্মান কেন।"

"ওকে বাঁচিয়েছি ব'লে। পা ভেঙেছিল মোটরের তলায় পড়ে, আমি সারিয়ে তুলেছি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। এখন ওর প্রাণটার মধ্যে আমারও শেয়ার আছে।"

"রোজ রোজ ঐ অলুক্ষুনের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে না?"

"চেহারা দেখবার জন্যে ওকে তো রাখি নি। মরতে মরতে এই যে ও সেরে উঠছে, এটা দেখতে আমার ভালো লাগে। ঐ প্রাণীর বেঁচে থাকবার দরকারটা যখন দিনে দিনে মিটিয়ে দিই, তখন ধর্মকর্ম করতে ছাগলছানার গলায় দড়ি বেঁধে আমাকে কালীতলায় দৌড়তে হয় না। তোমাদের বায়োলজির ল্যাবরেটরির কানাখোঁড়া কুকুর-খরগোশগুলোর জন্যে আমি একটা হাসপাতাল বানাব স্থির করেছি।"

"মিসেস মল্লিক, তোমাকে যতই দেখছি তাক লাগছে।"

"আরও বেশি দেখলে ওটার উপশম হবে। রেবতীবাবুর খবর দেবেন বলেছিলেন, সেটা আরম্ভ করে দিন।"

"আমার সঙ্গে দূর সম্পর্কে ওদের যোগ আছে। তাই ওদের ঘরের খবর জানি। রেবতীকে জন্ম দিয়েই ওর মা যান মারা। বরাবর ও পিসির হাতে মানুষ। ওর পিসির আচারনিষ্ঠা একেবারে নিরেট। এতটুকু খুঁত নিয়ে ওঁর খুঁতখুঁতুনি সংসারকে অতিষ্ঠ করে তুলত। তাঁকে ভয় না করত এমন লোক ছিল না পরিবারে। ওঁর

হাতে রেবতীর পৌরুষ গেল ছাতু হয়ে। স্কুল থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে পঁচিশ মিনিট লাগত তার জবাবদিহি করতে।"

সোহিনী বললে, "আমি তো জানি পুরুষরা করবে শাসন, মেয়েরা দেবে আদর, তবেই ওজন ঠিক থাকে।"

অধ্যাপক বললেন, "ওজন ঠিক রেখে চলা মরালগামিনীদের ধাতে নেই। ওরা এদিকে ঝুঁকবে ওদিকে ঝুঁকবে। কিছু মনে কোরো না মিসেস মল্লিক, ওদের মধ্যেও দৈবাৎ মেলে যারা খাড়া রাখে মাথা, চলে সোজা চালে। যেমন—"

"আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার মধ্যেও শিকড়ের দিকে মেয়েমানুষ যথেষ্ট আছে। কী ঝোঁকে পেয়েছে দেখছেন না! ছেলে-ধরা ঝোঁক। নইলে আপনাকে বিরক্ত করতেম কি।"

"দেখো, বার বার ঐ কথাটা বোলো না। জেনে রেখো আজ ক্লাসের জন্যে তৈরি না হয়েই চলে এসেছি। কর্তব্যের গাফেলি এতই ভালো লাগছে।"

"বোধ হয় মেয়েজাতটার 'পরেই আপনার বিশেষ একটু কৃপা আছে।"

"একটুও অসম্ভব নয়। কিন্তু তার মধ্যেও তো ইতরবিশেষ আছে। যা হোক, সে কথাটা পরে হবে।"

সোহিনী হেসে বললে, "পরে না হলেও চলবে। আপাতত যে কথাটা উঠেছে শেষ করে দিন। রেবতীবাবুর এত উন্নতি হল কী করে।"

"যা হতে পারত তার তুলনায় কিছুই হয় নি। একটা রিসর্চের কাজে ওর বিশেষ দরকার হয়েছিল উঁচু পাহাড়ে যাবার। ঠিক করেছিল যাবে বদরিকাশ্রমে। আরে সর্বনাশ। পিসিরও ছিল এক পিসি, সে বুড়ি মরবে তো মরুক ঐ বদরিকারই রাস্তায়। পিসি বললে, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, পাহাড়পর্বত চলবে না।' কাজেই তখন থেকে একমনে যা কামনা করছি সে মুখ ফুটে বলবার নয়। থাক্ সে কথা।"

"কিন্তু শুধু পিসিমাদের দোষ দিলে চলবে কেন। মায়ের দুলাল ভাইপোদের হাড় বুঝি কোনো কালে পাকবে না?"

"সে তো পূর্বেই বলেছি। মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা। আফসোসের কথা কী আর বলব। এ তো হল নম্বর ওয়ান। তার পরে রেবতী যখন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজে যাবে স্থির হল, আবার এসে পড়ল সেই পিসিমা হাউ হাউ শব্দে। তার বিশ্বাস, ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে। আমি বললুম, নাহয় করল বিয়ে। সর্বনাশ, কথাটা আন্দাজে ছিল, এবার যেন পাকা দেখা হয়ে গেল। পিসি বললে, 'ছেলে যদি বিলেতে যায় তা হলে

গলায় দড়ি দিয়ে মরব।' কোন্ দেবতার দোহাই পাড়লে পাকানো হবে দড়িটা নাস্তিক আমি জানি নে, তাই দড়িটা বাজারে মিলল না। রেবতীকে খুব খানিকটা গাল দিলুম, বললুম স্টুপিড, বললুম ডান্স, বললুম ইম্‌বেসীল। ব্যস্, ঐখানেই খতম। রেবু এখন ভারতীয় ঘানিতে ফোঁটা ফোঁটা তেল বের করছেন।"

সোহিনী অস্থির হয়ে বলে উঠল, "দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে। একটা মেয়ে রেবতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আর-একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায়, এই আমার পণ রইল।"

"স্পষ্ট কথা বলি ম্যাডাম। জানোয়ারগুলোকে শিঙে ধরে তলিয়ে দেবার হাত তোমার পাকা— লেজে ধরে তাদের উপরে তোলবার হাত তেমন দুরস্ত হয় নি। তা এখন থেকে অভ্যাসটা শুরু হোক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সায়ান্সে এত উৎসাহ তোমার এল কোথা থেকে।"

"সকল রকম সায়ান্সেই সারা জীবন আমার স্বামীর মন ছিল মেতে। তাঁর নেশা ছিল বর্মা চুরুট আর ল্যাবরেটরি। আমাকে চুরুট ধরিয়ে প্রায় বর্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন। ছেড়ে দিলুম, দেখলুম পুরুষদের চোখে খটকা লাগে। তাঁর আর-এক নেশা আমার উপর দিয়ে জমিয়েছিলেন। পুরুষরা মেয়েদের মজায় বোকা বানিয়ে, উনি আমাকে মজিয়েছিলেন বিদ্যে দিয়ে দিনরাত। দেখুন চৌধুরীমশায়, স্বামীর দুর্বলতা স্ত্রীর কাছে ঢাকা থাকে না, কিন্তু আমি ওঁর মধ্যে কোনোখানে খাদ দেখতে পাই নি। কাছে থেকে যখন দেখতুম, দেখেছি উনি বড়ো; আজ দূরে থেকে দেখছি, দেখি উনি আরও বড়ো।"

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "কোন্‌খানে সব চেয়ে তাঁকে বড়ো ঠেকছে।"

"বলব? উনি বিদ্বান বলে নয়। বিদ্যার 'পরে ওঁর নিষ্কাম ভক্তি ছিল ব'লে। উনি একটা পুজোর আলো পুজোর হাওয়ার মধ্যে ছিলেন। আমরা মেয়েরা দেখবার-ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজো করবার পথ পাই নে। তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পুজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধুপধুনো জ্বালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজাই। ভয় করি আমার স্বামীর ঘৃণাকে। তাঁর দৈনিক যখন পুজো ছিল, এই-সব যন্ত্রতন্ত্র ঘিরে জমত কলেজের ছাত্রেরা, শিক্ষা নিত তাঁর কাছ থেকে, আর আমিও বসে যেতুম।"

"ছেলেগুলো সায়ান্সে মন দিতে পারত কি।"

"যারা পারত তাদেরই বাছাই হয়ে যেত। এমন-সব ছেলে দেখেছি যারা সত্যকার বৈরাগী। আবার দেখেছি কেউ কেউ নোট নেবার ছলে একেবারে পাশের ঠিকানায়

চিঠি লিখে সাহিত্যচর্চা করত।"

"কেমন লাগত?"

"সত্যি কথা বলব? খারাপ লাগত না। স্বামী চলে যেতেন কাজে, ভাবুকদের মন আশেপাশে ঘুর ঘুর করত।"

"কিছু মনে কোরো না, আমি সাইকলজি স্টাডি করে থাকি। জিগ্‌গেসা করি, ওরা কিছু ফল পেত কি।"

"বলতে ইচ্ছে করে না, নোংরা আমি। দুচারজনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মুচড়িয়ে ধরে।"

"দুচারজন?"

"মন যে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদীকুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতাসাবিত্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধুরীমশায়, মনে রাখবেন, ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ-বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে নি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জলছে সেই হোমের আগুন।"

"ব্র্যাভো, সত্যি কথা বলতে কী সাহস তোমার।"

"সত্যি কথা বলিয়ে নেবার লোক থাকলে বলা সহজ হয়। আপনি যে খুব সহজ, খুব সত্যি।"

"দেখো, ঐ যে চিঠিলিখিয়ে ছেলেগুলো তোমার প্রসাদ পেয়েছিল, তারা কি এখনও আনাগোনা করে।"

"সেই করেই তো তারা মুছে দিয়েছে আমার মনের ময়লা। দেখলুম, জুটছে তারা আমার চেকবইয়ের দিকে লক্ষ্য করে। ভেবেছিল মেয়েমানুষের মোহ মরতে চায় না, ভালোবাসার সিঁধের গর্ত দিয়ে পৌঁছবে তাদের হাত আমার টাকার সিন্দুকে। এত রস আমার নেই, তারা তা জানত না। আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে প'ড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা খসাতে পারে নি। আমার

প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাণ্ডারের দ্বার। ওদের সাধ্য নেই সে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেন নি।"

"তাঁকে আমি প্রণাম করি, আর পাই যদি সেই ছেলেগুলোর কান মলে দিই।"

বিদায় নেবার আগে অধ্যাপক একবার ল্যাবরেটরিটা ঘুরে এলেন সোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন, "এখানেই মেয়েলিবুদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাদ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট।"

সোহিনী বললে, "যা বলুন, মন থেকে ভয় যায় না। মেয়েলিবুদ্ধি বিধাতার আদি সৃষ্টি। যখন বয়স অল্প থাকে মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাপে, যেই রক্ত আসে ঠাণ্ডা হয়ে, বেরিয়ে আসেন সনাতনী পিসিমা। তার আগেই আমার মরবার ইচ্ছে রইল।"

অধ্যাপক বললেন, "ভয় নেই তোমার, আমি বলছি তুমি সজ্ঞানে মরবে।"

৫

সাদা শাড়ি পরে মাথায় কাঁচাপাকা চুলে পাউডার মেখে সোহিনী মুখের উপর একটি শুচি সাত্ত্বিক আভা মেজে তুললে। মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হল বোটানিকালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসী শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলেপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজ-করা স্যাণ্ডেল।

যে আকাশনিম-বীথিকার তলায় রেবতী রবিবার কাটায় আগে থাকতে সংবাদ নিয়ে সোহিনী সেইখানেই এসে তাকে ধরলে। প্রণাম করলে একেবারে তার পায়ে মাথা রেখে। বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল রেবতী।

সোহিনী বললে, "কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি ছত্রির মেয়ে। চৌধুরীমশায়ের কাছে আমার কথা শুনে থাকবে।"

"শুনেছি। কিন্তু এখানে আপনাকে বসাব কোথায়।"

"এই-যে রয়েছে সবুজ তাজা ঘাস, এমন আসন কোথায় পাওয়া যায়। ভাবছ বোধ হয়, এখানে আমি কী করতে এসেছি। এসেছি আমার ব্রত উদ্‌যাপন করতে। তোমার মতো ব্রাহ্মণ তো খুঁজে পাব না।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে বললে, "আমার মতো ব্রাহ্মণ?"

"তা না তো কী। আমার গুরু বলেছেন, এখনকার কালের সুরসেরা যে বিদ্যা

তাতেই যাঁর দখল তিনিই সেরা ব্রাহ্মণ।"

রেবতী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "আমার বাবা করতেন যজনযাজন, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি নে।"

"বল কী, তুমি যে মন্ত্র শিখেছ সেই মন্ত্রে সমস্ত জগৎ হয়েছে মানুষের বশ। তুমি ভাবছ মেয়েমানুষের মুখে এসব কথা এল কোথা থেকে। পেয়েছি পুরুষের মতো পুরুষের মুখ থেকে। তিনি আমার স্বামী। যেখানে তাঁর সাধনার পীঠস্থান ছিল, কথা দাও বাবা, সেখানে তোমাকে যেতে হবে।"

"কাল সকালে আমার ছুটি আছে, যাব।"

"তোমার দেখছি গাছপালার শখ। বড়ো আনন্দ হল। গাছপালার খোঁজে আমার স্বামী গিয়েছিলেন বর্মায়, আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি।"

সঙ্গ ছাড়ে নি কিন্তু সায়ান্সের চর্চায় নয়। নিজের ভিতর থেকে যে সাধ উঠত ফুটে, স্বামীর চরিত্রের মধ্যেও সেটা অনুমান না করে থাকতে পারত না। সন্দেহের সংস্কার ছিল ওর আঁতে আঁতে। একসময়ে নন্দকিশোরের যখন গুরুতর পীড়া হয়েছিল, তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "মরবার একমাত্র আরাম এই যে, সেখান থেকে তুমি আমাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

সোহিনী বললে, "সঙ্গে যেতে পারি তো।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "সর্বনাশ।"

সোহিনী রেবতীকে বললে, "বর্মা থেকে আসবার সময় এনেছিলুম এক গাছের চারা। বর্মিজরা তাকে বলে কোয়াইটানিয়েঙ্। চমৎকার ফুলের শোভা— কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলুম না।"

আজই সকালে স্বামীর লাইব্রেরি ঘেঁটে এ নাম সোহিনী প্রথম বের করেছে। গাছটা চোখেও দেখে নি। বিদ্যার জাল ফেলে বিদ্বানকে টানতে চায়।

অবাক হল রেবতী। জিগ্‌গেসা করলে, "এর লাটিন নামটা কি জানেন।"

সোহিনী অনায়াসে বলে দিলে, "তাকে বলে মিলেটিয়া।"

বললে, "আমার স্বামী সহজে কিছু মানতেন না, তবু তাঁর একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল ফলে ফুলে প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু আছে সুন্দর, মেয়েরা বিশেষ অবস্থায় তার দিকে একান্ত করে যদি মন রাখে তা হলে সন্তানরা সুন্দর হয়ে জন্মাবেই। এ কথা তুমি বিশ্বাস কর কি।"

বলা বাহুল্য এটা নন্দকিশোরের মত নয়।

রেবতী মাথা চুলকিয়ে বললে, "যথোচিত প্রমাণ তো এখনও জড়ো হয় নি।"

সোহিনী বললে, "অন্তত একটা প্রমাণ পেয়েছি আমার আপন ঘরেই। আমার মেয়ে এমন আশ্চর্য রূপ পেল কোথা থেকে। বসন্তের নানা ফুলের যেন— থাক্, নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল রেবতী। নাট্যের কোনো সরঞ্জাম বাকি ছিল না।

সোহিনী তার রাঁধুনী বামুনকে সাজিয়ে এনেছে পূজারী বামুনের বেশে। পরনে চেলি, কপালে ফোঁটাতিলক, টিকিতে ফুল বাঁধা, বেলের আঠায় মাজা মোটা পইতে গলায়। তাকে ডেকে বললে, "ঠাকুর, সময় তো হল, নীলুকে এবার ডেকে নিয়ে এসো।"

নীলাকে তার মা বসিয়ে রেখেছিল স্টীমলঞ্চে। ঠিক ছিল ডালি হাতে সে উঠে আসবে, বেশ খানিকখন তাকে দেখা যাবে সকালবেলার ছায়ায়-আলোয়।

ইতিমধ্যে রেবতীকে সোহিনী তন্ন তন্ন করে দেখে নিতে লাগল। রঙ মসৃণ শ্যামবর্ণ, একটু হলদের আভা আছে। কপাল চওড়া, চুলগুলো আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে উপরে তোলা। চোখ বড়ো নয় কিন্তু তাতে দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছ আলো জ্বল্ জ্বল্ করছে, মুখের মধ্যে সেইটেই সকলের চেয়ে চোখে পড়ে। নীচে মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম। রেবতীর সম্বন্ধে ও যত খবর জোগাড় করেছে তার মধ্যে ও বিশেষ লক্ষ্য করেছে একটা কথা। ছেলেবেলাকার বন্ধুদের ওর উপরে ছিল কান্নাকাটি-জড়ানো সেন্টিমেণ্টাল ভালোবাসা। ওর মুখে যে একটা দুর্বল মাধুর্য ছিল, তাতে পুরুষ বালকদের মনে মোহ আনতে পারত।

সোহিনীর মনে খটকা লাগল। ওর বিশ্বাস, মেয়েদের মনকে নোঙরের মতো শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্যে পুরুষের ভালো দেখতে হওয়ার দরকারই করে না। বুদ্ধিবিদ্যেটাও গৌণ। আসল দরকার পৌরুষের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্। সেটা তার স্নায়ুর পেশীর ভিতরকার বেতার-বার্তার মতো। প্রকাশ পেতে থাকে কামনার অকথিত স্পর্ধারূপে।

মনে পড়ল, নিজের প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস। ও যাকে টেনেছিল কিংবা যে টেনেছিল ওকে, তার না ছিল রূপ, না ছিল বিদ্যা, না ছিল বংশগৌরব। কিন্তু কী একটা অদৃশ্য তাপের বিকিরণ ছিল যার অলক্ষ্য সংস্পর্শে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ও তাকে অত্যন্ত করে অনুভব করেছিল পুরুষমানুষ ব'লে। নীলার জীবনে কখন একসময়ে সেই অনিবার্য আলোড়নের আরম্ভ হবে এই ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিত না। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জ্ঞানের চর্চায়। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের জমি ছিল স্বভাবত উর্বরা। কিন্তু যে জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, সব মেয়ের তার প্রতি

টান থাকে না। নীলার মনে আলো পৌঁছয় না।

নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা। রোদ্দুর পড়েছে তার কপালে তার চুলে, বেনারসি শাড়ির উপরে জরির রশ্মি ঝল্‌মল্‌ করে উঠছে। রেবতীর দৃষ্টি একমুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে নিল পরক্ষণেই। ছেলেবেলা থেকে তার এই শিক্ষা। যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা, তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন সুযোগ ঘটে তখন দৃষ্টির অমৃত ওকে তাড়াতাড়ি এক চুমুকে গিলতে হয়।

মনে মনে রেবতীকে ধিক্কার দিয়ে সোহিনী বললে, "দেখো দেখো, একবার চেয়ে দেখো।"

রেবতী চমকে উঠে চোখ তুলে চাইলে।

সোহিনী বললে, "দেখো তো ডক্টর অব সায়ান্স, ওর শাড়ির রঙের সঙ্গে পাতার রঙের কী চমৎকার মিল হয়েছে।"

রেবতী সসংকোচে বললে, "চমৎকার।"

সোহিনী মনে মনে বললে, 'নাঃ, আর পারা গেল না।' আবার বললে, "ভিতরে বসন্তী রঙ উঁকি মারছে, উপরে সবজে নীল। কোন্‌ ফুলের সঙ্গে মেলে বলো দেখি।"

উৎসাহ পেয়ে রেবতী ভালো করেই দেখলে। বললে, "একটা ফুল মনে পড়ছে কিন্তু উপরের আবরণটা ঠিক নীল নয়, ব্রাউন।"

"কোন্‌ ফুল বলো তো।"

রেবতী বললে, "মেলিনা।"

"ও বুঝেছি। তার পাঁচটি পাপড়ি, একটি উজ্জ্বল হলদে, বাকি চারটে শ্যামবর্ণ।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, "এত করে ফুলের পরিচয় জানলেন কী করে।"

সোহিনী হেসে বললে, "জানা উচিত হয় নি বাবা। পুজোর সাজির বাইরের ফুল আমাদের কাছে পরপুরুষ বললেই হয়।"

ডালি হাতে এল ধীরে ধীরে নীলা। মা বললে, "জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। পা ছুঁয়ে প্রণাম কর্‌।"

"থাক্‌ থাক্‌" ব'লে রেবতী অস্থির হয়ে উঠল। রেবতী আসন করে বসেছিল, পা খুঁজে বের করতে নীলাকে একটু হাতড়াতে হল। শিউরে উঠল রেবতীর সমস্ত শরীর। ডালিতে ছিল দুর্লভ-জাতীয় অর্কিডের মঞ্জরি, রুপোর থালায় ছিল বাদামের তক্তি, পেস্তার বরফি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, মালাইয়ের বরফি, চৌকো করে কাটা কাটা ভাপা দই।

বললে, "এ সমস্তই তৈরি নীলার নিজের হাতে।"

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। এসব কাজে নীলার না ছিল হাত, না ছিল মন।

সোহিনী বললে, "একটু মুখে দিতে হয় বাবা, ঘরে তৈরি তোমারই উদ্দেশে।"

ফরমাশে তৈরি বড়োবাজারের এক চেনা দোকানে।

রেবতী হাত জোড় করে বললে, "এ সময়ে খাওয়া আমার অভ্যাস নয়। বরং অনুমতি করেন যদি বাসায় নিয়ে যাই।"

সোহিনী বললে, "সেই ভালো। অনুরোধ করে খাওয়ানো আমার স্বামীর আইনে বারণ। তিনি বলতেন, মানুষ তো অজগরের জাত নয়।"

একটা বড়ো টিফিন-ক্যারিয়রে থাকে থাকে সোহিনী খাবার সাজিয়ে দিলে। নীলাকে বললে, "দে তো মা, সাজিতে ফুলগুলি ভালো করে সাজিয়ে। এক জাতের সঙ্গে আর-এক জাত মিশিয়ে দিস নে যেন। আর তোর খোঁপা ঘিরে ঐ যে সিল্কের রুমাল জড়িয়েছিস, ওটা পেতে দিস ফুলগুলির উপরে।"

বিজ্ঞানীর চোখে আর্টপিপাসুর দৃষ্টি উঠল উৎসুক হয়ে। এ যে প্রাকৃত জগতের মাপ-ওজনের বাইরেকার জিনিস। নানা রঙের ফুলগুলির মধ্যে নীলার সুঠাম আঙুল সাজাবার লয় রেখে নানা ভঙ্গিতে চলছিল— রেবতীর চোখ ফেরানো দায় হল। মাঝে মাঝে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। এক দিকে সেই মুখের সীমানা দিয়েছে চুনিমুক্তোপান্নার-মিশোলকরা একহারা হার জড়ানো চুলের ইন্দ্রধনু, আর-এক দিকে বসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছ্রিত রাঙা পাড়টি। সোহিনী মিষ্টান্ন সাজাচ্ছিল কিন্তু ওর একটা তৃতীয় নেত্র আছে যেন। সামনে যে একটা জাদু চলছিল সে ওর লক্ষ্য এড়ায় নি।

নিজের স্বামীর অভিজ্ঞতা অনুসারে সোহিনীর ধারণা ছিল বিদ্যাসাধনার বেড়া-দেওয়া খেত যে-সে গোরুর চরবার খেত নয়। আজ আভাস পেল বেড়া সকলের পক্ষে সমান ঘন নয়। সেটা ভালো লাগল না।

৬

পরের দিন সোহিনী অধ্যাপককে ডেকে পাঠালে। বললে, "নিজের গরজে আপনাকে ডেকে এনে মিছিমিছি কষ্ট দিই। হয়তো কাজের ক্ষতিও করি।"

"দোহাই তোমার, আরও-একটু ঘন ঘন ডেকো। দরকার থাকে তো ভালো, না থাকে তো আরও ভালো।"

"আপনি জানেন, দামী যন্ত্র সংগ্রহের নেশায় আমার স্বামীর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত

না। মনিবদের ফাঁকি দিতেন এই নিষ্কাম লোভে। সমস্ত এশিয়ার মধ্যে এমন ল্যাবরেটরি কোথাও পাওয়া যাবে না, এই জেদ তাঁর মতো আমাকেও পেয়ে বসেছিল। এই জেদেই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নইলে আমার মোদো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে উপচিয়ে পড়ত চার দিকে। দেখুন চৌধুরীমশায়, নিজের স্বভাবের মধ্যে মন্দটা যা লেপটিয়ে থাকে সেটা যাঁর কাছে অসংকোচে বলতে পারি আপনি আমার সেই বন্ধু। নিজের কলঙ্কের দিকটা দেখাবার খোলসা দরজা পেলে মন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

চৌধুরী বললেন, "যারা সম্পূর্ণটা দেখতে পায় তাদের কাছে সত্যকে চাপা দেবার দরকার করে না। আধা সত্যই লজ্জার জিনিস। পুরোপুরি দেখার ধাত আমাদের, আমরা বিজ্ঞানী।"

"তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্যে বাঁচবার শখ মেটাবার জন্যে এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই দুর্লভ জিনিসকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরিতে। একে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাঁকে চরম করে মারব স্বামীঘাতিনী হয়ে। আমি এর রক্ষক চাই, তাই খুঁজছিলুম রেবতীকে।"

"চেষ্টা করে দেখলে ?"

"দেখেছি, হাতে হাতে ফল পাবার আশা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকবে না।"

"কেন।"

"ওঁর পিসিমা যেমনি শুনবেন রেবতীকে টেনেছি কাছে, অমনি তাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে আসবেন। ভাববেন, আমার মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবার ফাঁদ পেতেছি।"

"দোষ কী, হলে তো ভালোই হত। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, বেজাতে মেয়ের বিয়ে দেবে না।"

"তখনও আপনার মন জানতুম না, তাই মিথ্যে কথা বলেছিলুম। খুবই চেয়েছিলুম। কিন্তু ছেড়েছি সেই মতলব।"

"কেন।"

"বুঝতে পেরেছি, ও ভাঙনধরানো মেয়ে। ওর হাতে যা পড়বে তা আস্ত থাকবে না।"

"কিন্তু ও তো তোমারই মেয়ে।"

"আমারই মেয়ে তো বটে, তাই তো ওকে আঁতের ভিতর থেকেই চিনি।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে কেন যে, মেয়েরা পুরুষের ইন্‌স্পিরেশন জাগাতে পারে।"

"আমার সবই জানা আছে। পুরুষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে কিন্তু মদ ধরালেই সর্বনাশ। আমার মেয়েটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।"

"তা হলে কী করতে চাও বলো।"

"আমার ল্যাবরেটরি দান করতে চাই পাব্লিককে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে এড়িয়ে দিয়ে?"

"মেয়েকে? ওকে দান করলে সে দান পৌঁছবে কোন্ রসাতলে কী করে জানব আমার ট্রাস্ট সম্পত্তির প্রেসিডেন্ট করে দেব রেবতীকে। তাতে তো পিসির আপত্তি হতে পারবে না?"

"মেয়েদের আপত্তির যুক্তি যদি ধরতেই পারব তা হলে পুরুষ হয়ে জন্মাতে গেলুম কেন। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে, ওকে যদি জামাই না করবে তা হলে প্রেসিডেন্ট করতে চাও কেন।"

"শুধু যন্ত্রগুলো নিয়ে কী হবে। মানুষ চাই ওদের প্রাণ দিতে। আর-একটা কথা এই, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একটাও নতুন যন্ত্র আনা হয় নি। টাকার অভাবে নয়। কিনতে হলে একটা লক্ষ্য ধরে কিনতে হয়। খবর জেনেছি, রেবতী ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ নিয়ে কাজ করছেন। সেই পথে সংগ্রহ এগিয়ে চলুক, যত দাম লাগে লাগুক-না।"

"কী আর বলব, পুরুষমানুষ যদি হতে তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে নেচে বেড়াতুম। তোমার স্বামী রেল-কোম্পানির টাকা চুরি করেছিলেন, তুমি চুরি করে নিয়েছ তাঁর পুরুষের মনখানা। এমন অদ্ভুত কলমের-জোড়-লাগানো বুদ্ধি আমি কখনও দেখি নি। আমারও পরামর্শ নেওয়া তুমি যে দরকার বোধ কর, এই আশ্চর্য।"

"তার কারণ আপনি যে খুব খাঁটি, ঠিক কথা বলতে জানেন।"

"হাসালে তুমি। তোমাকে বেঠিক কথা ব'লে ধরা পড়ব, এত বড়ো নিরেট বোকা আমি নই। তা হলে লাগা যাক এবার, জিনিসপত্র ফর্দ করা, দর-যাচাই করা, ভালো উকিল ডেকে তোমার স্বত্ব বিচার করা, আইনকানুন বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি অনেক হাঙ্গামা আছে।"

"এসব দায় কিন্তু আপনারই।"

"সেটা হবে নামমাত্র। বেশ ভালো করেই জান, যা তুমি বলাবে তাই বলব, যা করাবে তাই করব। আমার লাভটা এই যে দুবেলা দেখা হবে তোমার সঙ্গে। তোমাকে যে কী চক্ষে দেখেছি তুমি তো জান না।"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধুরীর গলা জড়িয়ে ধরে

গালে চুমো খেয়ে চট্‌ করে সরে গেল, ভালোমানুষের মতো বসল গিয়ে চৌকিতে।

"ঐ যে সর্বনাশের শুরু হল দেখছি।"

"সে ভয় যদি একটুও থাকত তা হলে কাছেও এগতুম না। এ বরাদ্দ আপনার জুটবে মাঝে মাঝে।"

"ঠিক বলছ ?"

"ঠিকই বলছি। আমার এতে খরচ নেই, আপনারও যে বেশি কিছু পাওনা আছে, মুখের ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছে না।"

"অর্থাৎ বলতে চাও, এ হচ্ছে মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর দেওয়া।— চললুম উকিলবাড়িতে।"

"কাল একবার আসবেন এ পাড়াতে।"

"কেন, কী করতে।"

"রেবতীর মনে দম দিতে।"

"আর নিজের মনটা খুইয়ে বসতে।"

"মন কি আপনার একলারই আছে।"

"তোমার মনের কিছু বাকি আছে নাকি।"

"উচ্ছিষ্ট অনেক পড়ে আছে।"

"তাতে এখনও অনেক বাঁদর নাচানো চলবে।"

৭

তার পরদিনে রেবতী ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত বিশ মিনিট আগে এসেই উপস্থিত। সোহিনী প্রস্তুত ছিল না, আটপৌরে কাপড়েই তাড়াতাড়ি চলে এল ঘরে। রেবতী বুঝতে পারলে গলদ হয়েছে। বললে, "আমার ঘড়িটা ঠিক চলছে না দেখছি।" সোহিনী সংক্ষেপে বললে, "নিশ্চয়।" একসময়ে একটু কী শব্দ শুনে রেবতী মনে মনে চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালে। তখন বেহারাটা গ্লাসকেসের চাবি নিয়ে এল ঘরে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "এক পেয়ালা চা আনিয়ে দেব কি।"

রেবতী ভাবলে বলা উচিত, হাঁ। বললে, "দোষ কী।"

ও বেচারার চা অভ্যাস নেই, সর্দির আভাস দিলে বেলপাতাসিদ্ধ গরম জল খেয়ে থাকে। মনে মনে বিশ্বাস ছিল স্বয়ং নীলা আসবে পেয়ালা হাতে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "তুমি কি কড়া চা খাও।"

ও ফস্‌ ক'রে বলে বসল, "হাঁ।"

ভাবলে এ ক্ষেত্রে হাঁ বলাটাই পাকা দস্তুর। এল চা, সেটা কড়া সন্দেহ নেই। কালির মতো রঙ, নিমের মতো তিতো। চা আনলে মুসলমান খানসামা। এটাও ওকে পরীক্ষা করবার জন্যে। আপত্তি করতে ওর মুখে কথা সরল না। এই সংকোচ ভালো লাগল না সোহিনীর। খানসামাকে বললে, "চা-টা ঢেলে দাও-না মোবারক, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।"

খানসামার হাতের পরিবেষণ-প্রত্যাশায় রেবতী বিশ মিনিট আগে এখানে আসে নি।

কী দুঃখে যে মুখে চামচ উঠছিল অন্তর্যামীই জানছিলেন, আর জানছিল সোহিনী। হাজার হোক মেয়েমানুষ, দুর্গতি দেখে বললে, "ও পেয়ালাটা থাক্‌। দুধ ঢেলে দিচ্ছি, তার সঙ্গে কিছু ফল খেয়ে নাও। সকাল সকাল এসেছ, বোধ হয় কিছু খেয়ে আসা হয় নি।" কথাটা সত্য। রেবতী ভেবেছিল আজও সেই বোটানিকালের পুনরাবৃত্তি হবে। কাছ দিয়েও গেল না, মুখে রয়ে গেল কড়া চায়ের তিতো স্বাদ আর মনে রয়েছে আশাভঙ্গের তিতো অভিজ্ঞতা।

এমনসময় প্রবেশ করলেন অধ্যাপক; ঘরে ঢুকেই রেবতীর পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "কী রে হল কী, সব যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। খুকুর মতো বসে বসে দুধ খাচ্ছিস ঢকে ঢক। চার দিকে যা দেখছিস একি খোকাবাবুর খেলনার দোকান। যাদের চোখ আছে তারা দেখেছে, মহাকালের চেলারা এইখানে আসে তাণ্ডবনৃত্য করতে।"

"আহা কেন বকছেন। না খেয়েই ও বেরিয়েছিল আজ সকালে। এল যখন, তখন দেখলুম মুখ যেন শুকনো।"

"ঐ রে পিসিমা দি সেকেণ্ড। এক পিসিমা দেবে এক গালে চাপড়, আর-এক পিসিমা দেবে অন্য গালে চুমো। মাঝখানে প'ড়ে ছেলেটা যাবে ভিজে কাদা হয়ে। আসল কথা কী জান, লক্ষ্মী যখন আপনি সেধে আসেন চোখে পড়েন না; যারা সাত মুল্লুক ঘুরে তাঁকে খুঁজে বের করে, ধরা দেন তিনি তাদেরই কাছে। না-চেয়ে পাওয়ার মতো না-পাওয়ার আর রাস্তা নেই। আচ্ছা বলো দেখি মিসেস—দূর হোক গে ছাই মিসেস, আমি ডাকবই তোমাকে সোহিনী ব'লে, এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর।"

"মরণ আমার, রাগ করতে যাব কেন। ডাকুন আমাকে সোহিনী ব'লে, সুহি বললে আমার কান জুড়িয়ে যাবে।"

"গোপন কথাটা প্রকাশ করেই বলি। তোমার ঐ সোহিনী নামটির সঙ্গে আর-একটি শব্দের মিল আছে, বড়ো খাঁটি তার অর্থ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই হিনি হিনি কিনি কিনি রবে ঐ দুটি শব্দ মিলিয়ে মনে মনে খঞ্জনি বাজাতে থাকি।"

"কেমিষ্ট্রির রিসর্চে মিল করা আপনার অভ্যাস আছে, ওটা তারই একটা ফেঁকড়া।"

"মিল করতে গিয়ে মরেও অনেক লোক। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই— ঘোরতর দাহ্য পদার্থ।"

এই ব'লে হাঃ হাঃ শব্দে উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

"নাঃ, ঐ ছোকরার সামনে এসব কথার আলোচনা করতে নেই। বারুদের কারখানায় আজ পর্যন্ত ও অ্যাপ্রেন্টিসি শুরু করে নি। পিসিমার আঁচল ওকে আগলে আছে, সে আঁচল নন্‌কম্‌বাষ্টিব্‌ল্‌।"

রেবতীর মেয়েলি মুখ লাল হয়ে উঠছিল।

"সোহিনী, আমি তোমাকে জিগ্‌গেসা করতে যাচ্ছিলুম, আজ সকালে তুমি কি ওকে আফিম খাইয়ে দিয়েছিলে। অমন ঝিমিয়ে পড়ছে কেন।"

"খাইয়ে যদি থাকি সেটা না জেনে।"

"রেবু, ওঠ বলছি ওঠ্‌। মেয়েদের কাছে অমন মুখচোরা হয়ে থাকতে নেই। ওতে ওদের আস্পর্ধা বেড়ে যায়। ওরা তো ব্যামোর মতো পুরুষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায়, ছিদ্র পেলেই টেম্পারেচর চড়িয়ে দেয় হু হু ক'রে। সাবজেক্ট্‌টা জানা আছে, ছেলেগুলোকে সাবধান করতে হয়। আমার মতো যারা ঘা খেয়েছে, মরে নি, তাঁদের কাছ থেকেই পাঠ নিতে হয়। রেবু, কিছু মনে করিস নে বাবা। যারা কথা কয় না, চুপ করে থাকে, তারাই সব চেয়ে ভয়ংকর। চল্‌ দেখি, তোকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ঐ দেখ্‌ দুটো গ্যালভানোমিটর, একেবারে হাল কায়দার। এই দেখ্‌ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প্‌, আর এটা মাইক্রোফোটোমিটর, এ ছেলে-পাস-করাবার কলার ভেলা নয়। একবার এখানে আসন গেড়ে বোস্‌ দেখি। সেই তোমার টাকপড়া মাথার প্রোফেসর— নাম করতে চাই নে— দেখ কেমন তার মুখ চুন হয়ে না যায়। আমার ছাত্র হয়ে যখন তুই বিদ্যে শুরু করলি আমি তোকে বলি নি কি, তোর নাকের সামনে ঝুলছে যাকে কথায় বলে ভবিষ্যৎ। হেলাফেলা করে সেটাকে ফোঁপরা করে দিস নে যেন। তোর জীবনীর প্রথম চ্যাপ্‌টারের এক কোণে আমার নামটাও ছোটো অক্ষরে লেখা যদি থাকে, সেটা হবে আমার মস্ত গুরুদক্ষিণা।"

দেখতে দেখতে বিজ্ঞানী জেগে উঠল। জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। চেহারাটা

একেবারে ভিতর থেকে গেল বদলে। মুগ্ধ হয়ে সোহিনী বললে, "তোমাকে যে-কেউ জানে তারা সকলেই তোমার এত বড়ো উন্নতির আশা করে যা প্রতিদিনের জিনিস নয়, যা চিরদিনের। কিন্তু আশা যতই বড়ো, ততই বড়ো তার বাধা ভিতরে বাইরে।"

অধ্যাপক রেবতীর পিঠে আর-একবার দিলে একটা মস্ত চাপড়। ঝন্‌ঝন্ করে উঠল তার শিরদাঁড়া। চৌধুরী তাঁর মস্ত ভারী গলায় বললেন, "দেখ্, রেবু, যে মহৎ ভবিষ্যতের বাহন হওয়া উচিত ছিল ঐরাবত, কৃপণ বর্তমান চাপিয়ে দেয় তাকে গোরুর গাড়িতে, কাদায় পড়ে থাকে সে অচল হয়ে। শুনছ, সোহিনী, সুহি?— না না ভয় নেই, পিঠে চাপড় মারব না। বলো সত্যি ক'রে, কথাটা আমি কেমন গুছিয়ে বলেছি।"

"চমৎকার।"

"ওটা লিখে রেখো তোমার ডায়ারিতে।"

"তা রাখব।"

"কথাটার মানেটা বুঝেছিস তো রেবি?"

"বোধ হয় বুঝেছি।"

"মনে রাখিস মস্ত প্রতিভার মস্ত দায়িত্ব। ও তো কারও নিজের জিনিস নয়। ওর জবাবদিহি অনন্তকালের কাছে। শুনছ সুহি, শুনছ? কথাটা কেমন বলেছি বলো তো ভাই।"

"খুব ভালো বলেছেন। আগেকার দিনের রাজা থাকলে গলা থেকে মালা খুলে—"

"তারা তো মরেছে সব, কিন্তু—"

"ঐ কিন্তুটুকু মরে নি, মনে থাকবে।"

রেবতী বললে, "ভয় নেই, কিছুতে আমাকে দুর্বল করবে না।"

সোহিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল। সোহিনী তাড়াতাড়ি আটকিয়ে দিলে।

চৌধুরী বললেন, "আরে করলে কী। পুণ্যকর্ম না করার দোষ আছে, পুণ্যকর্মে বাধা দেওয়ার দোষ আরও বেশি।"

সোহিনী বললে, "প্রণাম যদি করতে হয় তো ঐখানে।"— ব'লে বেদির উপরে বসানো নন্দকিশোরের মূর্তি দেখিয়ে দিলে। ধূপধুনো জ্বলছে, ফুলে ভরে আছে থালা।

বললে, "পাতকীকে উদ্ধার করার কথা পুরাণে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করেছেন ঐ মহাপুরুষ। অনেক নিচে নামতে হয়েছিল, শেষকালে তুলে বসাতে পেরেছেন—

পাশে বললে মিথ্যে হবে, তাঁর পায়ের তলায়। বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করবার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়েজামাইয়ের গুমর বাড়াবার জন্যে তাঁর জীবনের খনিখোঁড়া রত্ন ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি। বললেন, 'ঐখানে রেখে গেলেম আমার সম্পত্তি, আর সম্পত্তি আমার দেশের।'"

অধ্যাপক বললেন, "শুনলি তো রেবু? এটা হবে ট্রাস্ট সম্পত্তি, তোকে দেওয়া হবে তার কর্তৃত্ব।"

রেবতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "কর্তৃত্ব নেবার যোগ্য আমি নই। আমি পারব না।"

সোহিনী বললে, "পারবে না! ছি, এ কি পুরুষের মতো কথা।"

রেবতী বললে, "আমি চিরদিন পড়াশুনো করে এসেছি, এরকম কাজের ভার কখনও নিই নি।"

চৌধুরী বললেন, "ডিম ফোটবার আগে কখনও হাঁস সাঁতার দেয় নি। আজ তোমার ডিমের খোলা ভাঙবে।"

সোহিনী বললে, "ভয় নেই তোমার, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।"

রেবতী আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল।

সোহিনী অধ্যাপকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। চৌধুরী বললেন, "জগতে বোকা অনেকরকম আছে, পুরুষ বোকা সকল বোকার সেরা। কিন্তু মনে রেখো, দায়িত্ব হাতে না পেলে দায়িত্বের যোগ্যতা জন্মায় না। একজোড়া হাত পেয়েছে মানুষ তাই সে হয়েছে মানুষ, একজোড়া খুর পেলেই তার সঙ্গে সঙ্গে মলবার যোগ্য লেজ আপনি গজিয়ে উঠত। তুমি কি রেবতীর হাতের বদলে খুর দেখতে পেয়েছ নাকি।"

"না, আমার ভালো লাগছে না। মেয়ের হাতেই যারা মানুষ কোনো কালে তাদের দুধে-দাঁত ভাঙে না। কপাল আমার। আপনি থাকতে আমি আর-কারও কথা কেন ভাবতে গেলুম।"

"খুশী হলুম শুনে। একটুখানি বুঝিয়ে দাও কী গুণ আছে আমার।"

"লোভ নেই আপনার একটুও।"

"এত বড়ো নিন্দের কথা! লোভের মতো জিনিসকে লোভ করি নে?— খুবই করি—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাঁর দুই গালে দুই চুমো দিয়ে সোহিনী সরে গেল।

"কোন্ খাতায় জমা হল এটা সোহিনী।"

"আপনার কাছে যে ঋণ পেয়েছি সে তো শোধ করতে পারি নে, তারই সুদ দিচ্ছি।"

"প্রথম দিন পেয়েছি একটি, আজ পেলুম দুটি। কেবলই বেড়ে চলবে নাকি।"

"বাড়বে বই কি, চক্রবৃদ্ধির নিয়মে।"

৮

চৌধুরী বললেন, "সোহিনী, তোমার স্বামীর শ্রাদ্ধে শেষকালে আমাকে পুরুত বানিয়ে দিলে? সর্বনাশ, এ কি কম দায়িত্ব। যার অস্তিত্ব হাতড়িয়ে পাওয়া যায় না তাকে খুশী করা! এ তো বাঁধাদস্তরের দানদক্ষিনে নয় যে—"

"আপনিও তো বাঁধাদস্তরের গুরুঠাকুর নন, আপনি যা করবেন সেটাই হবে পদ্ধতি। দানের ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছেন তো?"

"কদিন ধরে ঐ কাজই করেছি, দোকানবাজার কম ঘুরি নি। দানসামগ্রী সাজানো হয়ে গেছে নীচের বড়ো ঘরটাতে। ইহলোকস্থিত আত্মা যারা এগুলো আত্মসাৎ করবে তারা পেট ভরে খুশী হবে, সন্দেহ নেই।"

চৌধুরীর সঙ্গে নীচে গিয়ে সোহিনী দেখলে, সায়ান্স-পড়ুয়া ছেলেদের জন্যে নানা যন্ত্র, নানা মডেল, নানা দামী বই, নানা মাইক্রোস্‌কোপের স্লাইড্‌স্‌, নানা বায়োলজির নমুনা। প্রত্যেক সামগ্রীর সঙ্গে নাম ও ঠিকানা-লেখা কার্ড। আড়াইশো ছেলের জন্যে চেক লেখা হয়েছে এক বৎসরের বৃত্তির। খরচের জন্যে কিছুমাত্র সংকোচ করা হয় নি। বড়ো বড়ো ধনীদের শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণবিদায় হয় তার চেয়ে এর ব্যয়ের প্রসর অনেক বেশি, অথচ বিশেষ করে চোখে পড়ে না এর সমারোহ।

"পুরুতবিদায়ের কী দক্ষিণা দিতে হবে, সেটা তো আপনি ধরে দেন নি।"

"আমার দক্ষিণা তোমার খুশি।"

"খুশির সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্যে রেখেছি এই ক্রনোমিটর। জর্মনি থেকে আমার স্বামী এটা কিনেছিলেন, বরাবর তাঁর রিসর্চের কাজে লেগেছিল।"

চৌধুরী বললেন, "যা মনে আসছে তার ভাষা নেই। বাজে কথা বলতে চাই নে, আমার পুরুতের কাজ সার্থক হল।"

"আর-একটি লোক আছে, আজ তাকে ভুলতে পারি নে— সে আমাদের মানিকের বিধবা বউ।"

"মানিক বলতে কাকে বোঝায়।"

"সে ছিল ওঁর ল্যাবরেটরির হেড মিস্ত্রি। আশ্চর্য তার হাত ছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে এক চুল তার নড়চড় হত না, কলকব্‌জার তত্ত্ব-বুঝে নিতে তার বুদ্ধি ছিল অভ্রান্ত। তাকে উনি অতিনিকট বন্ধুর মতো দেখতেন। গাড়ি করে নিয়ে যেতেন

বড়ো বড়ো কারখানায় কাজ দেখাতে। এদিকে সে ছিল মাতাল, ওঁর অ্যাসিস্টেন্টরা তাকে ছোটোলোক ব'লে অবজ্ঞা করত। উনি বলতেন, ও যে গুণী, তার সে গুণ বানিয়ে তোলা যায় না, সে গুণ খুঁজে মিলবে না। ওঁর কাছে তার সম্মান পুরোমাত্রায় ছিল। এর থেকে বুঝবেন কেন যে উনি আমাকে শেষ পর্যন্ত এত মান দিয়েছিলেন। আমার মধ্যে যে মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোষের ওজন ওঁর কাছে ছিল খুব সামান্য। যে জায়গায় আমার মতো কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন, সে জায়গায় সে বিশ্বাস আমি কোনোদিন একটুমাত্র নষ্ট করি নি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আর-কারও কাছে পেতেন না। যেখানে আমি ছিলেম ছোটো সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়ি নি, যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন। আমার মূল্য যদি তাঁর চোখে না পড়ত তা হলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতুম বলুন তো। আমি খুব খারাপ, কিন্তু আমি নিজেই বলছি আমি খুব ভালো, নইলে তিনি আমাকে কখনও সহ্য করতে পারতেন না।"

"দেখো সোহিনী, আমি অহংকার করে বলব যে আমি প্রথম থেকেই জেনেছি তুমি খুব ভালো। সস্তা দরের ভালো হলে কলঙ্ক লাগলে দাগ উঠত না।"

"যাক গে, আমাকে আর যে লোক যা মনে করুক না, তিনি আমাকে যা মান দিয়েছেন সে আজ পর্যন্ত টিঁকে আছে, আমার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।"

"দেখো সোহিনী, তোমাকে যত দেখছি ততই জানছি, তুমি সে জাতের সহজ মেয়েমানুষ নও যারা স্বামী নামটা শুনলেই গ'লে পড়ে।"

"না, তা নই; আমি দেখেছি ওঁর মধ্যে শক্তি, প্রথম দিন থেকে জেনেছি উনি মানুষ, আমি শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বসি নি। আমি জাঁক করেই বলছি, আমার মধ্যে যে রত্ন আছে সে একা ওঁরই কণ্ঠহারে দোলবার মতো, আর কারও নয়।"

এমন সময় নীলা ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। বললে, "অধ্যাপকমশায়, কিছু মনে করবেন না, মায়ের সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"কিছু না মা, আমি এখন যাচ্ছি ল্যাবরেটরিতে। রেবতী কী রকম কাজ করছে দেখে আসি গে।"

নীলা বললে, "কোনো ভয় নেই। কাজ ভালোই চলছে। আমি এক-একদিন জানালার বাইরে থেকে দেখেছি, উনি মাথা গুঁজে লিখছেন, নোট নিচ্ছেন, কলম কামড়ে ধরে ভাবছেন। আমার প্রবেশ নিষেধ, পাছে সার আইজাকের গ্রাভিটেশন

যায় ন'ড়ে। সেদিন মা কাকে বলছিলেন উনি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে কাজ করছেন, তাই পাশ দিয়ে কেউ গেলেই কাঁটা নড়ে যায়, বিশেষত মেয়েরা।"

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, "মা, ল্যাবরেটরি ভিতরেই আছে, ম্যাগনেটিজম্‌ নিয়ে কাজ চলছেই, কাঁটা যারা নড়িয়ে দেন তাঁদের ভয় করতেই হয়। দিগ্‌ভ্রম ঘটায় যে। তবে চললুম।"

নীলা মাকে বললে, "আমাকে আর কতদিন তোমার আঁচলের গাঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।"

"তুই কী করতে চাস বল্‌।"

নীলা বললে, "তুমি তো জানই মেয়েদের জন্যে একটা হাইয়র স্টাডি মুভমেণ্ট খোলা হয়েছে, তুমি তাতে অনেক টাকা দিয়েছ। সেখানে আমাকে কেন কাজে লাগাও না।"

"আমার ভয় আছে পাছে তুই ঠিকমতো না চলিস।"

"সব চলাই বন্ধ করে দেওয়াই কি ঠিক চলার রাস্তা।"

"তা নয়, তা তো জানি, সেই তো আমার ভাবনা।"

"তুমি না ভেবে একবার আমাকে ভাবতে দাও-না। সে তো দিতেই হবে। আমি তো এখন খুকি নই। তুমি ভাবছ সেই-সব পাব্লিক জায়গায় নানা লোকের যাওয়া-আসা আছে, সে একটা বিপদ। জগৎসংসারে লোকচলাচল তো বন্ধ হবে না তোমার খাতিরে। আর তাদের সঙ্গে আমার জানাশুনো একেবারেই ঠেকিয়ে রাখবে যে সে আইন তো তোমার হাতে নেই।"

"জানি সব জানি, ভয় করে ভয়ের কারণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তা হলে তুই ওদের হাইয়র স্টাডি সার্কলে ভরতি হতে চাস?"

"হাঁ চাই।"

"আচ্ছা তাই হবে। সেখানকার পুরুষ অধ্যাপকদের একে একে দিবি জাহান্নমে সে জানি। কেবল একটি কথা দিতে হবে আমাকে। কোনোমতেই তুই রেবতীর কাছে ঘেঁষতে পাবি নে। আর কোনো ছুতোতেই ঢুকবি নে তার ল্যাবরেটরিতে।"

"মা, তুমি আমাকে কী মনে কর ভেবে পাই নে। কাছে ঘেঁষতে যাব তোমার ঐ খুদে সার আইজাক নিউটনের, এমন রুচি আমার?—মরে গেলেও না।"

সংকোচ বোধ করলে রেবতী শরীরটাকে নিয়ে যে রকম আঁকুবাঁকু করে তারই নকল ক'রে নীলা বললে, "ঐ স্টাইলের পুরুষকে নিয়ে আমার চলবে না। যে-সব মেয়েরা ভালোবাসে বুড়ো খোকাদের মানুষ করতে, ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালো

তাদেরই জন্যে। ও মারবার যোগ্য শিকারই নয়।"

"একটু বেশি বাড়িয়ে কথা বলছিস নীলা, তাই ভয় হচ্ছে ওটা ঠিক তোর মনের কথা নয়। তা হোক, ওর সম্বন্ধে তোর মনের ভাব যাই হোক, ওকে যদি মাটি করতে চাস তা হলে সে তোর পক্ষে ভালো হবে না।"

"কখন তোমার কী মর্জি কিছুই বুঝতে পারি নে মা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে তুমি আমাকে সাজিয়ে পুতুল গড়ে তুলেছিলে, সে কি আমি বুঝতে পারি নি। সেইজন্যেই কি তুমি আমাকে ওর বেশি কাছে আনাগোনা করতে বারণ করছ, পাছে, চেনাশোনার ঘেঁষ লেগে পালিশ নষ্ট হয়ে যায়।"

"দেখ্ নীলা, আমি তোকে ব'লে দিচ্ছি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না।"

"তা হলে আমি যদি মোতিগড়ের রাজকুমারকে বিয়ে করি?"

"ইচ্ছা হয় তো করিস।"

"সুবিধে আছে, তার তিনটে বিয়ে, আমার দায় অনেকটা হালকা হবে, আর সে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে নাইটক্লাবে— তখন আমি অনেকটা ছুটি পাব।"

"আচ্ছা বেশ, সেই ভালো। রেবতীর সঙ্গে তোর বিয়ে হতে দেব না।"

"কেন, তোমার সার আইজাক নিউটনের বুদ্ধি আমি ঘুলিয়ে দেব মনে কর?"

"সে তর্ক থাক্, যা বললুম তা মনে রাখিস।"

"উনি নিজেই যদি হ্যাংলাপনা করেন।"

"তা হলে এ পাড়া তাকে ছাড়তে হবে— তোর অন্নে তাকে মানুষ করিস, তোর বাপের তহবিল থেকে এক কড়িও সে পাবে না।"

"সর্বনাশ। তা হলে নমস্কার সার আইজাক নিউটন।"

সেদিনকার পালা সংক্ষেপে এই পর্যন্ত।

৯

"চৌধুরীমশায়, আর সবই চলছে ভালো কেবল আমার মেয়ের ভাবনায় সুস্থির হতে পারছি নে। ও যে কোন্ দিকে তাক করতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি নে।"

চৌধুরী বললেন, "আবার ওর দিকে তাক করছে কারা সেটাও একটা ভাববার কথা। হয়েছে কি, এরই মধ্যে রটে গেছে ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে তোমার স্বামী অগাধ টাকা রেখে গেছে। মুখে মুখে তার অঙ্কটা বেড়েই চলেছে। এখন রাজত্ব আর রাজকন্যা নিয়ে বাজারে একটা জুয়োখেলার সৃষ্টি হয়েছে।"

"রাজকন্যাটি মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে রাজত্ব সস্তায় বিকোবে না।"

"কিন্তু লোকের আমদানি শুরু হয়েছে। সেদিন হঠাৎ দেখি, আমাদেরই অধ্যাপক মজুমদার ওরই হাত ধরে বেরিয়ে এল সিনেমা থেকে। আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নিল। ছেলেটা ভালো ভালো বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, দেশের মঙ্গলের দিকে ওর বুলি খুব সহজে খেলে। কিন্তু সেদিন ওর বাঁকা ঘাড় দেখে স্বদেশের জন্যে ভাবনা হল।"

"চৌধুরীমশায়, আগল ভেঙেছে।"

"ভেঙেছে বই কি। এখন এই গরিবকেই নিজের ঘটিবাটি সামলাতে হবে।"

"মজুমদার-পাড়ায় মড়ক লাগে লাগুক, আমার ভয় রেবতীকে নিয়ে।"

চৌধুরী বললেন, "আপাতত ভয় নেই। খুব ডুবে আছে। কাজ করছে খুব চমৎকার।"

"চৌধুরীমশায়, ওর বিপদ হচ্ছে সায়ান্সে ও যত বড়ো ওস্তাদই হোক, তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বল সে রাজ্যের ও ঘোর আনাড়ি।"

"সে কথা ঠিক। ওর একবারও টিকে দেওয়া হয় নি। ছোঁয়াচ লাগলে বাঁচানো শক্ত হবে।"

"রোজ একবার কিন্তু ওকে আপনাকে দেখে যেতে হবে।"

"কোথা থেকে ও আবার ছোঁয়াচ না নিয়ে আসে। শেষকালে এ বয়সে আমি না মরি। ভয় কোরো না, মেয়েমানুষ যদিও, তবুও আশা করি ঠাট্টা বুঝতে পার। আমি পার হয়ে গেছি এপিডেমিকের পাড়াটা। এখন ছোঁওয়া লাগলেও ছোঁয়াচ লাগে না। কিন্তু একটা মুশকিল ঘটেছে। পরশু আমাকে যেতে হবে গুজরানওয়ালায়।"

"এটাও ঠাট্টা নাকি। মেয়েমানুষকে দয়া করবেন।"

"ঠাট্টা নয়, আমার সতীর্থ অমূল্য আড্ডি ছিলেন সেখানকার ডাক্তার। বিশপঁচিশ বছর প্র্যাকটিস করেছেন। কিছু বিষয়সম্পত্তিও জমিয়েছেন। হঠাৎ বিধবা স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে রেখে মরেছেন হার্টফেল করে। দেনাপাওনা চুকিয়ে জমিজমা বেচে তাদের উদ্ধার করে আনতে হবে আমাকে। কতদিন লাগবে ঠিক জানি নে।"

"এর উপরে আর কথা নেই।"

"এ সংসারে কথা কিছুরই উপরে নেই সোহিনী। নির্ভয়ে বলো, যা হবেই তা হোক। যারা অদৃষ্ট মানে তারা ভুল করে না। আমরা সায়ান্টিস্ট্‌রাও বলি অনিবার্যের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। যতক্ষণ কিছু করবার থাকে করো, যখন কোনোমতেই পারবে না, বোলো বাস্‌।"

"আচ্ছা তাই ভালো।"

"যে মজুমদারটির কথা বললুম, দলের মধ্যে সে তত বেশি মারাত্মক নয়। তাকে ওরা দলে টেনে রাখে মান বাঁচাবার জন্যে। আর-যাদের কথা শুনেছি, চাণক্যের মতে তাদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকলেও ভাবনার কারণ থেকে যায়। অ্যাটর্নি আছে বঙ্কুবিহার, তাকে আশ্রয় করা আর অক্টোপসকে জড়িয়ে ধরা একই কথা। ধনী বিধবার তপ্ত রক্ত এই-সব লোক পছন্দ করে। খবরটা শুনে রাখো, যদি কিছু করবার থাকে কোরো। সবশেষে আমার ফিলজফিটা মনে রেখো।"

"দেখুন চৌধুরীমশায়, রেখে দিন ফিলজফি। মানব না আপনার অদৃষ্ট, মানব না আপনার কার্যকারণের অমোঘ বিধান, যদি আমার ল্যাবরেটরির 'পরে কারও হাত পড়ে। আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে। আমি খুন করতে পারি তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাইপদের উমেদার হোক।"

ওর শাড়ির নীচে ছিল কোমরবন্ধ লুকোনো। তার থেকে ধাঁ করে এক ছুরি বের করে আলোয় ঝলক খেলিয়ে দিয়ে গেল। বললে, "তিনি আমাকে বেছে নিয়েছিলেন— আমি বাঙালির মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করি নে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, তার মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।"

চৌধুরী বললেন, "একসময়ে কবিতা লিখতে পারতুম, আজ আবার মনে হচ্ছে হয়তো পারি লিখতে।"

"কবিতা লিখতে হয় লিখবেন, কিন্তু আপনার ফিলজফি ফিরিয়ে নিন। যা না মানবার তাকে আমি শেষ পর্যন্ত মানব না। একলা দাঁড়িয়ে লড়ব। আর বুক ফুলিয়ে বলব, জিতবই, জিতবই, জিতবই।"

"ব্র্যাভো, আমি ফিরিয়ে নিলুম আমার ফিলজফিটা। এখন থেকে লাগাব ঢাকে চাঁটি তোমার জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছুদিনের জন্যে বিদায় নিচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে না।"

আশ্চর্যের কথা এই সোহিনীর চোখে জল ভরে এল। বললে, "কিছু মনে করবেন না।" জড়িয়ে ধরলে চৌধুরীর গলা। বললে, "সংসারে কোনো বন্ধনই টেঁকে না, এও মুহূর্তকালের জন্যে।"

ব'লেই গলা ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে প'ড়ে সোহিনী অধ্যাপককে প্রণাম করলে।

১০

খবরের কাগজে যাকে বলে পরিস্থিতি সেটা হঠাৎ এসে পড়ে, আর আসে দল বেঁধে। জীবনের কাহিনী সুখে দুঃখে বিলম্বিত হয়ে চলে। শেষ অধ্যায়ে কোলিশন লাগে অকস্মাৎ, ভেঙেচুরে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধীরে, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।

সোহিনীর আইমা থাকেন আম্বালায়। সোহিনী তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, 'যদি দেখা করতে চাও শীঘ্র এসো'।

এই আইমা তার একমাত্র আত্মীয় যে বেঁচে আছে। এরই হাত থেকে নন্দকিশোর কিনে নিয়েছিলেন সোহিনীকে।

নীলাকে তার মা বললে, "তুমিও আমার সঙ্গে এসো।"

নীলা বললে, "সে তো কিছুতেই হতে পারে না।"

"কেন পারে না।"

"ওরা আমাকে অভিনন্দন দেবে তারই আয়োজন চলছে।"

"ওরা কারা।"

"জাগানী ক্লাবের মেম্বররা। ভয় পেয়ো না, খুব ভদ্র ক্লাব। মেম্বরদের নামের ফর্দ দেখলেই বুঝতে পারবে। খুবই বাছাই করা।"

"তোমাদের উদ্দেশ্য কী।"

"স্পষ্ট বলা শক্ত। উদ্দেশ্যটা নামের মধ্যেই আছে। এই নামের তলায় আধ্যাত্মিক সাহিত্যিক আর্টিষ্টিক সব মানেই খুব গভীরভাবে লুকোনো আছে। নবকুমারবাবু খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। ওরা ঠিক করেছে তোমার কাছ থেকে চাঁদা নিতে আসবে।"

"কিন্তু চাঁদা দেখছি ওরা নিয়ে শেষ করেছে। তুমি ষোলো আনাই পড়েছ ওর হাতে। কিন্তু এই পর্যন্তই। আমার যেটা ত্যাজ্য সেটাই ওরা পেয়েছে। আমার কাছ থেকে আর কিছু পাবার নেই।"

"মা, এত রাগ করছ কেন। ওঁরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উপকার করতে চান।"

"আচ্ছা সে আলোচনা থাক্। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছ যে তুমি স্বাধীন।"

"হাঁ পেয়েছি।"

"নিঃস্বার্থরা তোমাকে জানিয়েছেন যে তোমার স্বামীর দত্ত অংশে তোমার যে

টাকা আছে সে তুমি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পার।"

"হাঁ জেনেছি।"

"আমার কানে এসেছে উইলের প্রোবেট নেবার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হচ্ছ। কথাটা বোধ হয় সত্যি ?"

"হা সত্যি। বঙ্কুবাবু আমার সোলিসিটর।"

"তিনি তোমাকে আরও কিছু আশা এবং মন্ত্রণা দিয়েছেন।"

নীলা চুপ করে রইল।

"তোমার বঙ্কুবাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বে-আইনে। ফেরবার সময় আমি পেশোয়ার হয়ে আসব। আমার ল্যাবরেটরি রইল দিনরাত্রি চারজন শিখ সিপাইয়ের পাহারায়। আর যাবার সময় এই তোমাকে দেখিয়ে যাচ্ছি— আমি পাঞ্জাবের মেয়ে।"

ব'লে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, "এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।"

১১

ল্যাবরেটরির চার দিকে অনেকখানি জমি ফাঁকা আছে। কাঁপন বা শব্দ যাতে যথাসম্ভব কাজের মাঝখানে না পৌছয়। এই নিস্তব্ধতা কাজের অভিনিবেশে রেবতীকে সহায়তা করে। তাই ও প্রায়ই এখানে রাত্রে কাজ করতে আসে।

নীচের ঘড়িতে দুটো বাজল। মুহূর্তের জন্য রেবতী তার চিন্তার বিষয় ভাবছিল জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ মেলে।

এমন সময়ে দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের শেমিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল, "তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

ও বললে, "কেন।"

রেবতী বললে, "আমি সহ্য করতে পারছি নে। কেন এলে তুমি এ ঘরে।"

নীলা ওকে আরও দৃঢ়বলে চেপে ধরে বললে, "কেন, আমাকে কি তুমি ভালোবাস না।"

রেবতী বললে, "বাসি, বাসি বাসি। কিন্তু এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রহরী ; ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললে, "মায়িজি, বহুত শরমকি বাৎ হেয়, আপ বাহার চলা যাইয়ে।"

রেবতী চেতনমনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন্ চাপ দিয়েছিল।

পাঞ্জাবী রেবতীকে বললে, "বাবুজি, বেইমানি মৎ করো।"

রেবতী নীলাকে জোর করে ঠেলে দিয়ে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। দরোয়ান ফের নীলাকে বললে, "আপ বাহার চলা যাইয়ে, নহি তো মনিবকো হুকুম তামিল করে গা।"

অর্থাৎ জোর করে অপমান করে বের করে দেবে। বাইরে যেতে যেতে নীলা বললে, "শুনছেন সার আইজাক নিউটন ?—কাল আমাদের বাড়িতে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন, ঠিক চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময়। শুনতে পাচ্ছেন না ? অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন ?" ব'লে একবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালে।

বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে উত্তর এল, "শুনেছি।"

রাত-কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল, রেবতী মুগ্ধ চোখে না দেখে থাকতে পারল না। নীলা চলে গেল। রেবতী টেবিলের উপর মুখ রেখে পড়ে রইল। এমন আশ্চর্য সৌন্দর্য সে কল্পনা করতে পারে না। একটা কোন বৈদ্যুত বর্ষণ প্রবেশ করেছে ওর শিরার মধ্যে, চকিত হয়ে বেড়াচ্ছে অগ্নিধারায়। হাতের মুঠো শক্ত করে রেবতী কেবলই নিজেকে বলাতে লাগল, কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না। খুব শক্ত শপথ করবার চেষ্টা করতে চায়, মুখ দিয়ে বেরয় না। ব্লটিঙের উপর লিখল, যাব না, যাব না, যাব না। হঠাৎ দেখলে তার টেবিলে একটা ঘন লাল রঙের রুমাল পড়ে আছে, কোণে নাম সেলাই করা 'নীলা'। মুখের উপর চেপে ধরল রুমাল, গন্ধে মগজ উঠল ভরে, একটা নেশা সির্ সির্ করে ছড়িয়ে গেল সর্বাঙ্গে।

নীলা আবার ঘরের মধ্যে এল। বললে, "একটা কাজ আছে ভুলে গিয়েছিলুম।"

দরোয়ান রুখতে গেল। নীলা বললে, "ভয় নেই তোমার, চুরি করতে আসি নি। একটা কেবল সই চাই। জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করব তোমাকে— তোমার নাম আছে দেশ জুড়ে।"

অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে রেবতী বললে, "ও ক্লাবের আমি তো কিছুই জানি নে।"

"কিছুই তো জানবার দরকার নেই। এইটুকু জানলেই হবে ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্লাবের পেট্রন।"

"আমি তো ব্রজেন্দ্রবাবুকে জানি নে।"

"এইটুকু জানলেই হবে, মেট্রপলিটান ব্যাঙ্কের তিনি ডাইরেক্টর। লক্ষ্মী আমার, জাদু আমার, একটা সই বই তো নয়।" ব'লে ডান হাত দিয়ে তার কাঁধ ঘিরে তার হাতটা ধরে বললে, "সই করো।"

সে স্বপ্নাবিষ্টের মতো সই করে দিলে।

কাগজটা নিয়ে নীলা যখন মুড়ছে দরোয়ান বললে, "এ কাগজ আমাকে দেখতে হবে।"

নীলা বললে, "এ তো তুমি বুঝতে পারবে না।"

দরোয়ান বললে, "দরকার নেই বোঝবার।" বলে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। বললে, "দলিল বানাতে হয় বাইরে গিয়ে বানিয়ো। এখানে নয়।"

রেবতী মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দরোয়ান নীলাকে বললে, "মাজি, এখন চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি গে।" ব'লে তাকে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে ঢুকল পাঞ্জাবী। বললে, "চার দিকে আমি দরজা বন্ধ করে রাখি, তুমি ওকে ভিতর থেকে খুলে দিয়েছ।"

এ কী সন্দেহ, কী অপমান। বারবার করে বললে, "আমি খুলি নি।"

"তবে ও কী করে ঘরে এল।"

সেও তো বটে। বিজ্ঞানী তখন সন্ধান করে বেড়াতে লাগল ঘরে ঘরে। অবশেষে দেখলে রাস্তার ধারের একটা বড়ো জানলা ভিতর থেকে আগল দেওয়া ছিল, কে সেই আগলটা দিনের বেলায় এক সময়ে খুলে রেখে গেছে।

রেবতীর যে ধূর্ত বুদ্ধি আছে এতটা শ্রদ্ধা তার প্রতি দরোয়ানজির ছিল না। বোকা মানুষ, পড়াশুনো করে এই পর্যন্ত তার তাকত। অবশেষে কপাল চাপড়ে বললে, "আওরত! এ শয়তানি বিধিদত্ত।"

যে অল্প-একটু রাত বাকি ছিল রেবতী নিজেকে বারবার করে বলালে, চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না।

কাক ডেকে উঠল। রেবতী চলে গেল বাড়িতে।

১২

পরের দিন সময়ের একটু ব্যতিক্রম হল না। চায়ের সভায় চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই রেবতী গিয়ে হাজির। ভেবেছিল এ সভা নিভৃতে দুজনকে নিয়ে। ফ্যাশনেবল সাজ ওর দখলে নেই। প'রে এসেছে জামা আর ধুতি, ধোবার বাড়ি

থেকে নতুন কাচিয়ে আনা, আর কাঁধে ঝুলছে একটা পাটকরা চাদর। এসে দেখে সভা বসেছে বাগানে। অজানা শৌখিন লোকের ভিড়। দমে গেল ওর সমস্ত মনটা, কোথাও লুকোতে পারলে বাঁচে। একটা কোণ নিয়ে বসবার চেষ্টা করতেই সবাই উঠে পড়ল। বললে, "আসুন ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনার আসন এইখানে।"

একটা পিঠ-উঁচু মখমলে-মোড়া চৌকি, মণ্ডলীর ঠিক মাঝখানেই। বুঝতে পারলে সমস্ত জনতার প্রধান লক্ষ্যই ও। নীলা এসে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিলে, কপালে দিলে চন্দনের ফোঁটা। ব্রজেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন ওকে জাগানী সভার সভাপতি পদে বরণ করা হোক। সমর্থন করলেন বঙ্কুবাবু, চারি দিকে করতালির ধ্বনি উঠল। সাহিত্যিক হরিদাসবাবু ডক্টর ভট্টাচার্যের ইণ্টারন্যাশনাল খ্যাতির কথা ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, "রেবতীবাবুর নামের পালে হাওয়া লাগিয়ে আমাদের জাগানি ক্লাবের তরণী খেয়া দেবে পশ্চিম-মহাসমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।"

সভার ব্যবস্থাপকেরা রিপোর্টারদের কানে কানে গিয়ে বললে, "উপমাগুলোর কোনোটা যেন রিপোর্ট থেকে বাদ না যায়।"

বক্তারা একে একে উঠে যখন বলতে লাগল 'এতদিন পরে ডক্টর ভট্টাচার্য সায়ান্সের জয়তিলক ভারতমাতার কপালে পরিয়ে দিলেন,' রেবতীর বুকটা ফুলে উঠল— নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্যজগতের মধ্যগগনে। জাগানী সভা সম্বন্ধে যে-সমস্ত দাগী রকমের জনশ্রুতি শুনেছিল মনে মনে তার প্রতিবাদ করলে। হরিদাসবাবু যখন বললে, 'রেবতীবাবুর নামের কবচ রক্ষাকবচরূপে এ সভার গলায় আজ ঝোলানো হল, এর থেকে বোঝা যাবে এ সভার উদ্দেশ্য কত মহোচ্চ,' তখন রেবতী নিজের নামের গৌরব ও দায়িত্ব খুব প্রবলরূপে অনুভব করলে। ওর মন থেকে সংকোচের খোলসটা খসে পড়ে গেল। মেয়েরা মুখের থেকে সিগারেট নামিয়ে ঝুঁকে পড়ল ওর চৌকির উপর, মধুর হাস্যে বললে, "বিরক্ত করছি আপনাকে, কিন্তু একটা অটোগ্রাফ দিতেই হবে।"

রেবতীর মনে হল, এতদিন সে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিল, স্বপ্নের গুটি গেছে খুলে, প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে।

একে একে লোক বিদায় হল। নীলা রেবতীর হাত চেপে ধরে বললে, "আপনি কিন্তু যাবেন না।"

জ্বালাময় মদ ঢেলে দিলে ওর শিরার মধ্যে।

দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, লতাবিতানের মধ্যে সবুজ প্রদোষের অন্ধকার। বেঞ্চির উপরে দুজনে কাছাকাছি বসল। নিজের হাতের উপরে রেবতীর হাত

তুলে নিয়ে নীলা বললে, "ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েদের অত ভয় করেন কেন।"

রেবতী স্পর্ধাভরে বললে, "ভয় করি? কখনও না।"

"আমার মাকে আপনি ভয় করেন না?"

"ভয় কেন করব, শ্রদ্ধা করি।"

"আমাকে?"

"নিশ্চয় ভয় করি।"

"সেটা ভালো খবর। মা বলেছেন, কিছুতে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।"

"কোনো বাধা আমি মানব না, আমাদের বিয়ে হবেই হবে।"

কাঁধের উপর মাথা রেখে নীলা বললে, "তুমি হয়তো জান না, তোমাকে কতখানি চাই।"

নীলার মাথাটা আরও বুকের কাছে টেনে নিয়ে রেবতী বললে, "তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।"

"জাত?"

"ভাসিয়ে দেব জাত।"

"তা হলে রেজিস্ট্রারের কাছে কালই নোটিস দিতে হবে।"

"কালই দেব, নিশ্চয় দেব।"

রেবতী পুরুষের তেজ দেখাতে শুরু করেছে।

পরিণামটা দ্রুতবেগে ঘনিয়ে আসতে লাগল।

আইমার পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর আশঙ্কা আসন্ন। যে পর্যন্ত মৃত্যু না হয় সোহিনীকে তিনি কিছুতে ছাড়বেন না। এই সুযোগটাকে দুহাত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরে নীলার উন্মত্ত যৌবন আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

পাণ্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌরুষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে— তাকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই। শুধু তাই নয়। ল্যাবরেটরির সঙ্গে যে লোভের বিষয় জড়ানো আছে তার পরিমাণ প্রভূত। ওর হিতৈষীরা বলে ল্যাবরেটরির ভার নেবার যোগ্যতর পাত্র কোথাও মিলবে না রেবতীর চেয়ে; সোহিনী কিছুতে ওকে হাতছাড়া করবে না, এই হচ্ছে বুদ্ধিমানদের অনুমান।

এদিকে সহযোগীদের ধিক্কার শিরোধার্য করে রেবতী জাগানী ক্লাবের অধ্যক্ষতার সংবাদ ঘোষণা করতে দিলে সংবাদপত্রে। নীলা যখন বলত, 'ভয় লাগছে বুঝি', ও বলত 'আমি কেয়ার করি নে'। ওর পৌরুষ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র না থাকে এই জেদ ওকে পেয়ে বসল। বললে, 'এডিংটনের সঙ্গে চিঠিপত্র আমার চলে, একদিন এই ক্লাবে আমি তাঁকে নিমন্ত্রিত করে আনব', ক্লাবের মেম্বররা বললে 'ধন্য'।

রেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিন্ন হয়ে গেছে ওর সমস্ত চিন্তাসূত্র। মন কেবলই অপেক্ষা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকির হাতার উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে। নিজেকে এই ব'লে আশ্বাস দিচ্ছে, ওর কাজটা যে বাধা পেয়েছে সেটা ক্ষণিক, একটু সুস্থির হলেই ভাঙার মুখে আবার জোড়া লাগবে। সুস্থির হবার লক্ষণ আশু দেখা যাচ্ছে না। ওর কাজের ক্ষতিতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হচ্ছে নীলার মনের এক কোণেও সে শঙ্কা নেই, সমস্তটাকে সে প্রহসন মনে করে।

দিনের পর দিন জাল কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে। জাগানী সভা ওকে ছেঁকে ধরেছে, ওকে ঘোরতর পুরুষমানুষ বানিয়ে তুলছে। এখনও অকথ্য মুখ থেকে বেরয় না, কিন্তু অশ্রাব্য শুনলে জোর করে হাসতে থাকে। ডক্টর ভট্টাচার্য ওদের খুব একটা মজার জিনিস হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে রেবতীকে ঈর্ষায় কামড়িয়ে ধরে। ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরের মুখের চুরট থেকে নীলা চুরট ধরায়। এর নকল করা রেবতীর অসাধ্য। চুরটের ধোঁয়া গলায় গেলে ওর মাথা ঘুরে পড়ে, কিন্তু এই দৃশ্যটা ওর শরীরমনকে আরও অসুস্থ করে তোলে। তা ছাড়া নানারকমের ঠেলাঠেলি টানাটানি যখন চলতে থাকে, ও আপত্তি না জানিয়ে থাকতে পারে না। নীলা বলে, 'এই দেহটার 'পরে আমাদের তো কোনো মোহ নেই, আমাদের কাছে এর দাম কিসের— আসল দামী জিনিস ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি।' ব'লে চেপে ধরে রেবতীর হাত। রেবতী তখন অন্যদের অভাজন ব'লেই মনে করে, ভাবে ওরা ছোবড়া নিয়েই খুশী, শাঁসটা পেল না।

ল্যাবরেটরির দ্বারের বাইরে দিনরাত পাহারা চলছে, ভিতরে ভাঙা কাজ পড়ে রয়েছে, কারও দেখা নেই।

১৩

ড্রয়িংরুমে সোফায় পা দুটো তুলে কুশনে হেলান দিয়ে নীলা, মেঝের উপরে নীলার পায়ের কাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে রেবতী, হাতে রয়েছে লেখন-ভরা ফুলস্ক্যাপ।

রেবতী মাথা নেড়ে বললে, "ভাষায় কেমন যেন বেশি রঙ ফলানো হয়েছে, এতটা বাড়িয়ে-বলা লেখা পড়তে লজ্জা করবে আমার।"

"ভাষার তুমি মস্ত সমজদার কিনা। এ তো কেমিস্ট্রি ফরমুলা নয়, খুঁত খুঁত কোরো না, মুখস্থ করে যাও। জান এটা লিখেছেন আমাদের সাহিত্যিক প্রমদারঞ্জনবাবু?"

"ঐ সব মস্ত মস্ত সেণ্টেন্স আর বড়ো বড়ো শব্দগুলো মুখস্থ করা আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে।"

"ভারি তো শক্ত। তোমার কানের কাছে আউড়ে আউড়ে আমার তো সমস্তটা মুখস্থ হয়ে গেছে— 'আমার জীবনের সর্বোত্তম শুভ মুহূর্তে জাগানী সভা আমাকে যে অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন',— গ্র্যাণ্ড! তোমার ভয় নেই আমি তো তোমার কাছেই থাকব, আস্তে আস্তে তোমাকে বলে দেব।"

"আমি বাংলাসাহিত্য ভালো জানি নে কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, সমস্ত লেখাটা যেন আমাকে ঠাট্টা করছে। ইংরেজিতে যদি বলতে দাও কত সহজ হয়। Dear friends, Allow me to offer you my heartiest thanks for the honour you have conferred upon me on behalf of the Jagani Club— the great Awakener ইত্যাদি,— এমন দুটো সেণ্টেন্স বললেই বাস—"

"সে হচ্ছে না, তোমার মুখে বাংলা যে খুব মজার শোনাবে— ঐ যেখানটাতে আছে— 'হে বাংলাদেশের তরুণসম্প্রদায়, হে স্বাতন্ত্র্যসঞ্চালনরথের সারথি, হে ছিন্ন-শৃঙ্খলপরিকীর্ণ পথের অগ্রণীবৃন্দ'— যাই বল ইংরেজিতে এ কি হবার জো আছে। তোমার মতো বিজ্ঞানবিশারদের মুখে শুনলে তরুণ বাংলা সাপের মতো ফণা দুলিয়ে নাচবে। এখনও সময় আছে, আমি পড়িয়ে নিচ্ছি।"

গুরুভার দীর্ঘ দেহকে সিঁড়ির উপর দিয়ে সশব্দে বহন ক'রে সাহেবী পোশাকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ব্রজেন্দ্র হালদার মচ্‌মচ্‌ শব্দে এসে উপস্থিত। বললে, "নাঃ এ অসহ্য, যখনই আসি নীলাকে দখল করে বসে আছ। কাজ নেই, কর্ম নেই, নীলিকে তফাত করে রেখেছ আমাদের কাছ থেকে কাঁটাগাছের বেড়ার মতো।"

রেবতী সংকুচিত হয়ে বললে, "আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে তাই—"

"কাজ তো আছে, সেই ভরসাতেই তো এসেছিলুম ; আজ তুমি মেম্বরদের নেমন্তন্ন করেছ, ব্যস্ত থাকবে মনে ক'রে আপিসে যাবার আগে আধ ঘণ্টাটাক সময় করে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসেছি। এসেই শুনছি এখানেই উনি পড়েছেন কাজে বাঁধা। আশ্চর্য। কাজ না থাকলে এইখানেই ওঁর ছুটি, আবার কাজ থাকলে এইখানেই ওঁর কাজ। এমন নাছোড়বান্দার সঙ্গে আমরা কেজো লোকেরা পাল্লা দিই কী ক'রে। নীলি, is it fair।"

নীলা বললে, "ডক্টর ভটচাজের দোষ হচ্ছে, উনি আসল কথাটা জোর করে বলতে পারেন না। উনি কাজ আছে বলে এসেছেন, এটা বাজে কথা ; না এসে থাকতে পারেন না বলেই এসেছেন, এটাই একটা শোনবার মতো কথা এবং সত্যি কথা। আমার সমস্ত সময় উনি দখল করেছেন ওঁর জেদের জোরে। এই তো ওঁর পৌরুষ। তোমাদের সবাইকে ঐ বাঙালের কাছে হার মানতে হল।"

"আচ্ছা ভালো, তা হলে আমাদেরও পৌরুষ চালাতে হবে। এখন থেকে জাগানীক্লাব-মেম্বররা নারীহরণের চর্চা শুরু করবে। জেগে উঠবে পৌরাণিক যুগ।"

নীলা বললে, "বেশ মজা লাগছে শুনতে। নারীহরণ, পাণিগ্রহণের চেয়ে ভালো। কিন্তু পদ্ধতিটা কী রকম।"

হালদার বললে, "দেখিয়ে দিতে পারি।"

"এখনই ?"

"হাঁ এখনই।"

বলেই সোফা থেকে নীলাকে আড়কোলা করে তুলে নিলে।

নীলা চীৎকার করে হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরলে।

রেবতীর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল, ওর মুশকিল এই যে অনুকরণ করবার কিংবা বাধা দেবার মতো গায়ের জোর নেই। ওর বেশি করে রাগ হতে লাগল নীলার 'পরে, এই-সব অসভ্য গোঁয়ারদের প্রশ্রয় দেয় কেন।

হালদার বললে, "গাড়ি তৈরি আছে। তোমাকে নিয়ে চললুম ডায়মণ্ডহারবারে। আজ সন্ধের ভোজে ফিরিয়ে এনে দেব। ব্যাঙ্কে কাজ ছিল, সেটা যাক গে চুলোয়। একটা সৎকার্য করা হবে। ডাক্তার ভটচাজকে নির্জনে কাজ করবার সুবিধে করে দিচ্ছি। তোমার মতো অতবড়ো ব্যাঘাতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো, এজন্যে উনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

রেবতী দেখলে, নীলার ছট্‌ফট্ করবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টামাত্র করলে না, বেশ যেন আরামে ওর বক্ষ আশ্রয় করে রইল। ওর গলা জড়িয়ে রইল বিশেষ একটা আসক্তভাবে। যেতে যেতে বললে, "ভয় নেই

বিজ্ঞানী সাহেব, এটা নারীহরণের বহির্দলমাত্র—সহ্যাপারে যাচ্ছি নে, ফিরে আসব তোমার নেমন্তন্নে।"

রেবতী ছিঁড়ে ফেললে সেই লেখাটা। হালদারের বাহুর জোর এবং অসংকুচিত অধিকার-বিস্তারের তুলনায় নিজের বিদ্যাভিমান ওর কাছে আজ বৃথা হয়ে গেল।

আজ সান্ধ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাঁতে। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং রেবতী ভট্টাচার্য, তাঁর সম্মানিতা পার্শ্ববর্তিনী নীলা। সিনেমার বিখ্যাত নটী এসেছে গান গাইতে। টোস্ট প্রোপোজ করতে উঠেছে বঙ্কুবিহারী, গুণগান হচ্ছে রেবতীর আর তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে নীলার। মেয়েরা খুব জোরের সঙ্গে সিগারেট টানছে প্রমাণ করতে যে তারা সম্পূর্ণ মেয়ে নয়। প্রৌঢ়া মেয়েরা যৌবনের মুখোশ পরে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে অট্টহাস্যে উচ্চকণ্ঠে পরস্পর গা-টেপাটিপিতে যুবতীদের ছাড়িয়ে যাবার জন্যে মাতামাতির ঘোড়দৌড় চালিয়েছে।

হঠাৎ ঘরে ঢুকল সোহিনী। স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরসুদ্ধ সবাই। রেবতীর দিকে তাকিয়ে সোহিনী বললে, "চিনতে পারছি নে। ডক্টর ভট্টাচার্য বুঝি? খরচের টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলে, পাঠিয়ে দিয়েছি গেল শুক্রবারে; এই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিছু অকুলোন হচ্ছে না। এখন একবার উঠতে হচ্ছে, আজ রাত্রেই ল্যাবরেটরির ফর্দ অনুসারে জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখব।"

"আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?"

"এতদিন অবিশ্বাস তো করি নি। কিন্তু লজ্জাশরম যদি থাকে বিশ্বাসরক্ষার কথা তুমি আর মুখে এনো না।"

রেবতী উঠতে যাচ্ছিল, নীলা তাকে কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বললে, "আজ উনি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন, সকলে যান আগে, তার পরে উনি যাবেন।"

এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ঠোকর ছিল। সার আইজাক মায়ের বড়ো পেয়ারের, ওর মতো এতবড়ো বিশ্বাসী আর কেউ নেই, তাই সকলকে ছাড়িয়ে ল্যাবরেটরির ভার ওর উপরেই। আরও একটু দেগে দেবার জন্যে বললে, "জান মা? অতিথি আজ পঁয়ষট্টি জন, এ ঘরে সকলকে ধরে নি, এক দল আছে পাশের ঘরে—ঐ শুনছ না হো হো লাগিয়েছে? মাথা পিছু পঁচিশ টাকা ধরে নেয়, মদ না খেলেও মদের দাম ধরে দিতে হয়। খালি গেলাসের জরিমানা কম লাগল না। আর কেউ হলে মুখ চুপসে যেত। ওঁর দরাজ হাত দেখে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের তাক লেগে গেছে। সিনেমার গাইয়েকে কত দিতে হয়েছে জান?— তার এক রাত্তিরের পাওনা চারশো টাকা।"

রেবতীর মনের ভিতরটা কাটা কইমাছের মতো ধড়্ফড়্ করছে ; শুকনো মুখে কথাটি নেই।

সোহিনী জিজ্ঞাসা করলে, "আজকের সমারোহটা কিসের জন্যে।"

"তা জান না বুঝি ? অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে তো বেরিয়ে গেছে, উনি জাপানী ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন, তারই সম্মানে এই ভোজ। লাইফ মেম্বরশিপের ছশো টাকা সুবিধেমতো পরে শুধে দেবেন।"

"সুবিধে বোধ হয় শীঘ্র হবে না।"

রেবতীর মনটার মধ্যে স্টীমরোলার চলাচল করছিল।

সোহিনী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে এখন তোমার ওঠবার সুবিধে হবে না।"

রেবতী নীলার মুখের দিকে তাকালে। তার কুটিল কটাক্ষের খোঁচায় পুরুষমানুষের অভিমান জেগে উঠল। বললে, "কেমন করে যাই, নিমন্ত্রিতেরা সব—"

সোহিনী বললে, "আচ্ছা, আমি ততক্ষণ এখানে বসে রইলুম। নাসেরউল্লা, তুমি দরজার কাছে হাজির থাকো।"

নীলা বললে, "সে হতে পারবে না, মা। আমাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে, এখানে তোমার থাকা উচিত হবে না।"

"দেখ্ নীলা, চাতুরীর পালা তুই সবে শুরু করেছিস, এখনও আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবি নে। তোদের কিসের পরামর্শ সে খবর কি আমি পাই নি। বলে দিচ্ছি, তোদের সেই পরামর্শের জন্যে আমারই থাকা সব চেয়ে দরকার।"

নীলা বললে, "তুমি কী শুনেছ, কার কাছে।"

"খবর নেবার ফন্দি থাকে গর্তর সাপের মতো টাকার থলির মধ্যে। এখানে তিনজন আইনওয়ালা মিলে দলিলপত্র ঘেঁটে বের করতে চাও ল্যাবরেটরি ফণ্ডে কোনো ছিদ্র আছে কিনা। তাই নয় কি, নীলু।"

নীলা বললে, "তা সত্যি কথা বলব। বাবার অতখানি টাকায় তাঁর মেয়ের কোনো শেয়ার থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক। তাই সবাই সন্দেহ করে—"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, "আসল সন্দেহের মূল আরও অনেক আগেকার দিনের। কে তোর বাপ, কাঁর সম্পত্তির শেয়ার চাস। এমন লোকের তুই মেয়ে এ কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না ?"

নীলা লাফিয়ে উঠে বললে, "কী বলছ, মা।"

"সত্যি কথা বলছি। তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার তা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন, আজও পাবেন তা, আর-কিছু

তিনি গ্রাহ্য করেন নি।"

ব্যারিস্টর ঘোষ বললে, "আপনার মুখের কথা তো প্রমাণ নয়।"

"সে কথা তিনি জানতেন। সকল কথা খোলসা করে তিনি দলিল রেজেষ্ট্রি করে গেছেন।"

"ওহে বন্ধু, রাত হল যে, আর কেন। চলো।"

পেশোয়ারীর ভঙ্গি দেখে পঁয়ষট্টি জন অন্তর্ধান করলে।

এমন সময় সুটকেস হাতে এসে উপস্থিত চৌধুরী। বললেন, "তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে আসতে হল। কী রে রেবি, বেবি, মুখখানা যে পার্চমেণ্টের মতো সাদা হয়ে গেছে। ওরে, খোকার দুধের বাটি গেল কোথায়।"

নীলাকে দেখিয়ে সোহিনী বললে, "যিনি জোগাবেন তিনি যে ঐ বসে আছেন।"

"গয়লানীর ব্যাবসা ধরেছ নাকি, মা।"

"গয়লা ধরার ব্যাবসা ধরেছে, ঐ যে বসে আছে শিকারটি।"

"কে, আমাদের রেবি নাকি।"

"এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারি নি ; কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম— গোবরের কুণ্ডে আর-একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।"

অধ্যাপক বললেন, "মা, তুমি এই জীবটিকে আবিষ্কার করেছ যখন, তখন এই গোষ্ঠবিহারীর ভার তোমাকেই নিতে হবে। ওর আর সবই আছে কেবল বুদ্ধি নেই, তুমি কাছে থাকলে তার অভাবটা টের পাওয়া যাবে না। বোকা পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো সহজ।"

নীলা বললে, "কী গো সার আইজাক নিউটন, রেজেষ্ট্রি আপিসে নোটিশ তো দেওয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও নাকি।"

বুক ফুলিয়ে রেবতী বললে, "মরে গেলেও না।"

"বিয়েটা হবে তা হলে অশুভ লগ্নে।"

"হবেই, নিশ্চয় হবে।"

সোহিনী বললে, "কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে শত হস্ত দূরে।"

অধ্যাপক বললেন, "মা নীলু, ও বোকা, কিন্তু অক্ষম নয়। ওর নেশাটা কেটে যাক, তার পরে ওর খোরাকের জন্তে বেশি ভাবতে হবে না।"

"সার আইজাক, তা হলে কিন্তু তোমার কাপড়চোপড়গুলো একটু ভদ্র রকমের বানাতে হবে, নইলে তোমার সামনে আমাকে আবার ঘোমটা ধরতে হবে।"

হঠাৎ আর-একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "রেবি, চলে আয়।"

সুড়্ সুড়্ করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।

আশ্বিন, ১৩৪৭

পরিশিষ্ট

ছোটো গল্প

শেষকথা

সাহিত্যে বড়ো গল্প ব'লে যেসব প্রগল্‌ভ বাণীবাহন দেখা যায় তারা প্রাক্‌তাত্ত্বিক যুগের প্রাণীদের মতো— তাদের প্রাণের পরিমাণ যত দেহের পরিমাণ তার চার গুণ, তাদের লেজটা কলেবরের অত্যুক্তি।

অতিপরিমাণ ঘাসপাতা খেয়ে যাদের পেট মোটা তারা ভারবাহী জীব, স্তূপাকার মালের বস্তা টানা তাদের অদৃষ্টে। বড়ো গল্প সেই জাতের, মাল-বোঝাইওয়ালা। যেসব প্রাণীর খোরাক স্বল্প এবং সারালো, জাঁওর কেটে কেটে তারা প্রলম্বিত করে না ভোজন-ব্যাপার অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। ছোটো গল্প সেই জাতের; বোঝা বইবার জন্যে সে নয়, একেবারে সে মার লাগায় মর্মে লঘু লম্ফে।

কিন্তু গল্পের ফরমাশ আসছে বড়ো বহরের। অনেকখানি মালকে মানুষ অনেকখানি দাম দিয়ে ঠকতেও রাজি হয়। ওটা তার আদিম দুর্নিবার প্রবৃত্তির দুর্বলতা। এটাই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের দেশের বিয়ের ব্যাপারে। ইতরের মনভোলানো অতিপ্রাচুর্য এমনতরো রসাত্মক ক্রিয়াকর্মেও ভদ্রসমাজের বিনা প্রতিবাদে আজও চলে আসছে। আতিশয্যের ঢাকবাজানো পৌত্তলিকতা মানুষের প্রপৈত্রিক সংস্কার।

মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফ'লে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটো গল্প।

একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক। রাজা এডওআর্ড ভ্রমণে বেরলেন দেশ-দেশান্তরে। মুগ্ধ স্তাবকদের ভিড় চলল সঙ্গে সঙ্গে, খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফের ঠোঙাগুলো ঠেসে ভরে ভরে উঠল। এমন সময় যতসব রাজদূত, রাষ্ট্রনায়ক, বণিকসম্রাট, লেখনী-বজ্রপাণি সংবাদপাত্রিকের ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে একটা কোন্‌ ছোটো রন্ধ্র দিয়ে রাজার চোখে পড়ল এক অকুলীন আমেরিকানী। শব্দভেদী সমারোহের স্বরবর্ষণ মুহূর্তে হয়ে গেল অবাস্তব, কালো পর্দা পড়ে গেল ইতিহাসের অসংখ্য দীপদীপ্ত রঙ্গমঞ্চের উপর। সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে উঠল ছোটো গল্পটি দুর্লভ দুর্মূল্য। গোলমালের ভিতরে অদৃশ্য আর্টিস্ট ছিলেন আড়ালে, তাকিয়ে ছিলেন ব্যক্তিগত জীবন-সরোবরের গভীর অগোচরে। দেখছিলেন অতলসঞ্চারী অজানা মাছ কখন পড়ে তাঁর

বঁড়শিতে গাঁথা, কখন চমক দিয়ে ওঠে তাঁর ছোটো গল্পটি নানাবর্ণচ্ছটাখচিত লেজ আছড়িয়ে।

পৌরাণিক যুগের একটি ছোটো গল্প মনে পড়ছে— ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আখ্যান। দুঃসাধ্য তাঁর তপস্যা। নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্যের দুরূহ সাধনায়। অধিরোহণ করছিলেন বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-যাজ্ঞবল্ক্যের দুর্গম উচ্চতায়। হঠাৎ দেখা দিল সামান্য রমণী, সে শুচি নয়, সাধ্বী নয়, সে বহন করে নি তত্ত্ব বা মন্ত্র বা মুক্তি ; এমন কি ইন্দ্রলোক থেকে পাঠানো অপ্সরীও সে নয়। সমস্ত যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ আঁট বেঁধে গেল এক ছোটো গ ।

এই হল ভূমিকা। আমি হচ্ছি সেই মানুষ যার অদৃষ্ট ভীল-রমণীর মতো ঝুড়িতে প্রতিদিন সংগ্রহ করত কাঁচা পাকা বদরী ফল, একদিন হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছিল গজমুক্তা, একটি ছোটো গল্প।

সাহস করে লিখে ফেলব। কাজটা কঠিন। এতে হয়তো স্বাদ কিছু বা পাওয়া যাবে কিন্তু পেট ভরা ওজনের বস্তু মিলবে না।

প্রথম পর্ব

জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-লর মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধ'রে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়কনায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আসে। গল্পের গোড়ায় প্রাক্‌গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। তাতে কিছু সময় নেবে । আমি যে কে, সে কথাটা পরিষ্কার করে নিই।

কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে চেনাশোনার মহলে গল্পের যাথাযথ্যের জবাবদিহি সামলাতে পারব না। একথা সবাই বোঝে না যে ঠিকঠাক সত্য বলবার এক কায়দা, আর তার চেয়েও বেশি সত্য বলবার ভঙ্গী আলাদা।

কী নাম নেব তাই ভাবছি। রোম্যান্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকে গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমস্বরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলনসই। ওর শাম্‌লা রঙটা মেজে ফেলে গিল্‌টি লাগালে ওটা হতে পারত নবারুণ সেনগুপ্ত, কিন্তু খাঁটি শোনাত না।

আমি ছিলুম বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল আণ্ডামানের তীরবরাবর। নানা বাঁকা পথে সি. আই. ডি-র ফাঁস এড়িয়ে প্রথমে আফগানিস্থান, তার পরে জাপান, তার পরে আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছেছিলুম জাহাজি গোরার নানা কাজ নিয়ে।

পূর্ববঙ্গীয় দুর্জয় জেদ ছিল মজ্জায়। একদিনও ভুলি নি যে ভারতবর্ষের হাতকড়ায় উখো ঘষতে হবে দিনরাত যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু এই সমুদ্রপারের কর্মপেশল হাড়মোটা প্রাণঘন দেশে থাকতে থাকতে একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম যে, আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো। তাতে নিজেদের পোড়াকপাল আরও পুড়িয়েছে অনেকবার, কিন্তু ফুটো করতে পারে নি ব্রিটিশ রাজপতাকা। আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছিলুম, তখন বুঝতে পারি নি সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না; জ্বালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল।

তার পরে স্বচক্ষে দেখলুম য়ুরোপীয় মহাসমর। কী রকম টাকা ওড়াতে হয় ধুলোর মতো, আর প্রাণ উড়িয়ে দেয় ধোঁয়ার মতো দাবানলের। মরবার জন্যে তৈরি হতে হয় সমস্ত দেশ একজোট হয়ে, মারবার জন্যে তৈরি হতে হয় দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের দুরূহ দীক্ষা নিয়ে। এই যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়ো ঘরের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত করব কোন্ দুরাশায়! যথোচিত সমারোহে বড়োরকমের আত্মহত্যা করবার আয়োজনও যে ঘরে নেই। ঠিক করলুম, ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে, যত সময়ই লাগুক। বাঁচতে যদি চাই আদিম সৃষ্টির হাত দুখানায় গোটাদশেক নখ নিয়ে আঁচড় মেরে লড়াই করা চলবে না। এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা। হাতাহাতি করার তালঠোকা পালোয়ানি সহজ, বিশ্বকর্মার চেলাগিরি সহজ নয়। পথ দীর্ঘ, সাধনা দুরূহ।

দীক্ষা নিলুম যন্ত্রবিদ্যায়। আমেরিকায় ডেট্রয়েটে ফোর্ডের মোটর-কারখানায় কোনোমতে ভর্তি হলুম। হাত পাকাচ্ছিলুম কিন্তু শিক্ষা এগচ্ছিল ব'লে মনে হয় নি। একদিন কী দুর্বুদ্ধি ঘটল, মনে হল ফোর্ডকে যদি একটুখানি আভাস দিতে যাই যে নিজের স্বার্থসিদ্ধি আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই দেশকে বাঁচাতে তা হলে ধনকুবের বুঝি বা খুশি হবে, এমন কি দেবে আমার রাস্তা প্রশস্ত ক'রে। অতি গম্ভীরমুখে ফোর্ড বললে, 'আমার নাম হেনরি ফোর্ড, পুরোনো পাকা ইংরেজি নাম। কিন্তু আমি জানি আমাদের ইংলণ্ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, ইন্‌এফীসিয়েণ্ট। তাদের আমি কেজো ক'রে তুলব এই আমার সংকল্প।' অর্থাৎ অকেজো টাকাওয়ালাকে কেজো করবে কেজো টাকাওয়ালা স্বগোত্রের লাইন বাঁচিয়ে, আমরা থাকব চিরকাল কেজোদের হাতে কাদার পিণ্ড। তারা পুতুল বানাবে। এই দুঃখেই গিয়েছিলুম একদিন সোভিয়েটের দলে ভিড়তে। তারা আর যাই করুক কোনো নিরুপায় মানবজাতকে নিয়ে পুতুলনাচের অর্থকরী ব্যাবসা করে না।

কিছুদিন চাকা চালিয়ে শেষকালে বুঝলুম যন্ত্রবিদ্যাশিক্ষার আরও গোড়ায় যেতে হবে। শুরুতে দরকার যন্ত্রনির্মাণের মালমসলা যোগাড় করার বিদ্যে। কৃতকর্মাদের জন্যেই ধরণী দুর্গম পাতালপুরীতে জমা করে রেখেছেন কঠিন খনিজ পিণ্ড। সেইগুলো হস্তগত করে তারাই দিগ্বিজয় করেছে যাঁরা বাহাদুর জাত। আর যাদের চিরকালই অন্তভক্ষ্য ধনুর্গুণ তাদের জন্যেই বাঁধা বরাদ্দ উপরিস্তরের ফলফসল শাকসব্জি; হাড় বেরিয়ে গেল পাঁজরের, পেটে পিঠে গেল এক হয়ে।

লেগে গেলুম খনিজবিদ্যায়। একথা ভুলি নি যে ফোর্ড বলেছেন ইংরেজ জাত অকেজো। তার প্রমাণ আছে ভারতবর্ষে। একদিন ওরা হাত লাগিয়েছিল নীলের চাষে, চায়ের চাষে আর-একদিন। সিভিলিয়ানদল দফতরখানায় 'ল অ্যাণ্ড অর্ডর'-এর জাঁতা চালিয়ে দেশের অস্থিমজ্জা ছাতু করে বানিয়ে তুলেছে বস্তাবন্দী ভালোমানুষি, অতি মোলায়েম। সামান্য কিছু কয়লার আকর ছাড়া ভারতের অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করতে উপেক্ষা করেছে কিংবা অক্ষমতা দেখিয়েছে। নিংড়েছে বসে বসে পাটের চাষীর রক্ত। জামশেদজি টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাষাণ-প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর আওড়াব না, আর দেশের যত অভুক্ত অক্ষম রুগ্ন অশিক্ষিত, কাল্পনিক ভয়ে দিনরাত কম্পমান, দরিদ্রকে সহজ ভাষায় দরিদ্র ব'লেই জানব, দরিদ্রনারায়ণ ব'লে একটা বুলি বানিয়ে তাদের বিদ্রূপ করব না। প্রথম বয়সে একবার বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক খেলেছি। কবি-কারিগরদের কুমোরটুলিতে স্বদেশের যে সস্তা রাঙতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয় তার সামনে গদগদ ভাষায় অনেক অশ্রুজল ফেলেছি। লোকে তার খুব একটা চওড়া নাম দিয়েছিল দেশাত্মবোধ। কিন্তু আর নয়। আক্কেলদাঁত উঠেছে। এই জাগ্রত বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব ব'লে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার দেশে ফিরে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গুপ্তধনের তল্লাসে। মেয়েলিগলার মিহিসুরের মহাকবি-বিশ্বকবিদের অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ চেলারা এই অনুষ্ঠানকে তাদের দেশমাতৃকার পুজা বলে চিনতেই পারবে না।

ফোর্ডের কারখানা ছেড়ে তার পর ন' বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে। য়ুরোপের নানা কর্মশালায় ফিরেছি, হাতে কলমে কাজ করেছি, দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি, উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকের কাছ থেকে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিক্‌কার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।

আমার ছোটোগল্পের সঙ্গে এইসব মোটা মোটা কথার বিশেষ যোগ নেই। বাদ দিলে চলত, হয়তো বা ভালোই হত। কেবল এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার দরকার ছিল, সেইটে বলি। যৌবনের গোড়ায় যখন নারীপ্রভাবের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ রঙিন রশ্মির আন্দোলন তোলে জীবনের আকাশে আঁকাশে, তখন আমি ছিলুম কোমর বেঁধে অন্যমনস্ক। আমি সন্ন্যাসী, আমি কর্মযোগী, এই সমস্ত বাণীর কুলুপ আমার মনে কষে তালা এঁটে রেখেছিল। কন্যাদায়িকেরা যখন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করেছে তখন আমি স্পষ্ট করেই বলেছি, কন্যার কুষ্টিতে যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে তবেই যেন তাঁরা আমার কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চাত্য মহাদেশে নারীসঙ্গলাভে বাধা দেবার কাঁটার বেড়া নেই। সেখানে দুর্যোগের আশঙ্কা ছিল। আমি যে সুপুরুষ, বঙ্গনারীর মুখের ভাষায় তার কোনো ভাষ্য পাই নি। তাই এ সংবাদটা আমার চেতনার বাইরেই ছিল। বিলেতে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করেছি যে সাধারণের চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি, তেমনি ধরা পড়েছে আমার চেহারা ভালো। আমার দেশের অর্ধাশনশীর্ণ পাঠকের মুখে জল আসবার মতো রসগর্ভ কাহিনীর সূচনা সেখানে মাঝে মাঝে হয়েছিল। সেয়ানারা অবিশ্বাসে চোখ টেপাটিপি করতে পারেন তবু জোর করেই বলব সে কাহিনী মিলনান্ত বা বিয়োগান্তের যবনিকা-পতনে পৌঁছয় নি কেবল আমার জেদবশত। আমার স্বভাবটা কড়া, পাথুরে জমিতে জীবনের সংকল্প ছিল যক্ষের ধনের মতো পোঁতা, সেখানে চোরের সাবল ঠিক্‌রে প'ড়ে ঠন্‌ করে ওঠে। তা ছাড়া আমি জাত-পাড়াগেঁয়ে, সাবেককেলে ভদ্রঘরে আমার জন্ম, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার সংকোচ ঘুচতে চায় না।

আমার জর্মন ডিগ্রি উঁচুদরের ছিল। সেটা এখানে সরকারী কাজে বাতিল। তাই সুযোগ ক'রে ছোটোনাগপুরে চন্দ্রবংশীয় এক রাজার দরবারে কাজ নিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছেলে দেবিকাপ্রসাদ কিছুদিন কেম্‌ব্রিজে পড়াশুনো করেছিলেন। দৈবাৎ জুরিকে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। তাঁকে বুঝিয়েছিলুম আমার প্ল্যান। শুনে উৎসাহিত হয়ে তাঁদের স্টেটে আমাকে লাগিয়ে দিলেন জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে খনি-আবিষ্কারের প্রত্যাশায়। এত বড়ো কাজের ভার আনাড়ি সিভিলিয়নকে না দেওয়াতে সেক্রেটেরিয়টের উপরিস্তরে বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। দেবিকাপ্রসাদ শক্ত ধাতের লোক, বুড়ো রাজার মন টল্‌মল্‌ করা সত্ত্বেও টিঁকে গেলুম।

এখানে আসবার আগে মা বললেন, "ভালো কাজ পেয়েছ, এবার বাবা বিয়ে করো।" আমি বললুম, অর্থাৎ ভালো কাজ মাটি করো।

তার পরে বোবা পাথরকে প্রশ্ন করে করে বেড়াচ্ছিলুম পাহাড়ে জঙ্গলে। সে

সময়টাতে পলাশফুলের রাঙা রঙে বনে বনে নেশা লেগে গিয়েছে। শালগাছে অজস্র মঞ্জরী, মৌমাছিদের অনবরত গুঞ্জন। ব্যাবসাদারেরা মৌ সংগ্রহে লেগেছে, কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসর-রেশমের গুটি, সাঁওতালরা কুড়চ্ছে পাকা মহুয়া ফল। ঝির্‌ঝির্‌ শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপ্‌ছিপে নদী। শুনেছি এখানকার কোনো অধিবাসিনী তার নাম দিয়েছেন তনিকা। তাঁর কথা পরে হবে।

দিনে দিনে বুঝতে পারছি এ জায়গাটা ঝিমিয়ে-পড়া ঝাপসা চেতনার দেশ, এখানে একলা মনের সন্ধান পেলে প্রকৃতি মায়াবিনী তাকে নিয়ে রঙরেজিনীর কাজ করে, যেমন করে সে অস্তসূর্যের উত্তরীয়ে।

মনটাতে একটু আবেশের ঘোর লাগছিল। ক্ষণে ক্ষণে ঢিলে হয়ে আসছিল কাজের চাল। নিজের উপর বিরক্ত হচ্ছিলুম, ভিতর থেকে কষে জোর লাগাচ্ছিলুম দাঁড়ে। ভয় হচ্ছিল ট্রপিকাল মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ছি বুঝি। শয়তান ট্রপিক্‌স্‌ জন্মকাল থেকে এদেশে হাতপাখার হাওয়ায় ডাইনে বাঁয়ে হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের ললাটে, মনে মনে পণ করছি এর স্বেদসিক্ত জাদু এড়াতেই হবে।

বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে নুড়ি পাথর ঠেলে ঠেলে দুই শাখায় ভাগ হয়ে চলে গিয়েছে নদী। সেই বালুর দ্বীপে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সারি সারি বকের দল। দিনাবসানে তাদের এই ছুটির ছবি দেখে রোজ আমি চলে যাই আমার কাজের বাঁক ফেরাতে। ঝুলিতে মাটি পাথর অভ্রের টুকরো নিয়ে সেদিন ফিরছিলুম আমার বাংলাঘরে, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার কাজে। অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের যে একটা ফালতো পোড়ো সময় থাকে সেইখানটাতে একলা মানুষের মন এলিয়ে পড়ে। তাই আমি নিজেকে চেতিয়ে রাখবার জন্যে এই সময়টা লাগিয়েছি পরখ করার কাজে। ডাইনামো দিয়ে বিজলি বাতি জ্বালাই, কেমিক্যাল নিয়ে মাইক্রস্‌কোপ দিয়ে নিক্তি নিয়ে বসি। এক-একদিন রাত দুপুর পেরিয়ে যায়।

আজ একটা পুরোনো পরিত্যক্ত তামার খনির খবর পেয়ে দ্রুত উৎসাহে তারই সন্ধানে চলেছিলুম। কাকগুলো মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে ফিকে আলোর আকাশে কা কা শব্দে। অদূরে একটা ঢিবির উপরে তাদের পঞ্চায়েত বসবার পড়েছে হাঁকডাক।

হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজের রাস্তায়। পাঁচটা গাছের চক্রমণ্ডলী ছিল বনের পথের ধারে একটা উঁচু ডাঙার 'পরে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল

একটিমাত্র অবকাশে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে দিয়ে একটি আশ্চর্য দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। সেই গাছগুলোর ফাঁকটার ভিতর দিয়ে রাঙা আলোর ছোরা চিরে ফেলেছিল ভিতরকার ছায়াটাকে।

ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, পা ছুটি বুকের কাছে গুটিয়ে নিয়ে। পাশে ঘাসের উপর পড়ে আছে একখানা খাতা, বোধ হয় ডায়ারি।

বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, থমকিয়ে গেলুম। দেখলুম যেন বিকেলের ম্লান রৌদ্রে গড়া একটি সোনার প্রতিমা। চেয়ে রইলুম গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব ছবি এক মুহূর্তে চিহ্নিত হয়ে গেল মনের চিরস্মরণীয়াগারে।

আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হল জীবনের একটা কোন্ চরমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছলুম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যস্ত নয়। যে আঘাতে মানুষের নিজের অজানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে।

অত্যন্ত ইচ্ছা করছিল ওর কাছে গিয়ে কথার মতো কথা একটা-কিছু বলি। কিন্তু জানি নে কী কথা যে পরিচয়ের সবপ্রথম কথা, যে কথায় জানিয়ে দেবে খৃষ্টীয় পুরাণের প্রথম সৃষ্টির বাণী— আলো হোক, ব্যক্ত হোক যা অব্যক্ত।

আমি মনে মনে ওর নাম দিলুম— অচিরা। তার মানে কী। তার মানে এক মুহূর্তেই যার প্রকাশ, বিদ্যুতের মতো।

একসময়ে মনে হল অচিরা যেন জানতে পেরেছে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে আড়ালে। স্তব্ধ উপস্থিতির একটা নিঃশব্দ শব্দ আছে বুঝি।

একটু তফাতে গিয়ে কোমরবন্ধ থেকে ভুজালি নিয়ে একান্ত মনোযোগের ভান করে মাটি খোঁচাতে লাগলুম। ঝুলিতে যা হয় কিছু দিলুম পুরে, গোটা কয়েক কাঁকরের ঢেলা। চলে গেলুম মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন সন্ধান করতে করতে। কিন্তু নিশ্চয় মনে জানি যাঁকে ভোলাতে চেয়েছিলুম তিনি ভোলেন নি। মুগ্ধ পুরুষচিত্তের বিহ্বলতার আরও অনেক দৃষ্টান্ত আরও অনেকবার তাঁর গোচর হয়েছে সন্দেহ নেই। আশা করলুম আমার বেলায় এটা তিনি উপভোগ করলেন, সকৌতুকে কিংবা সগর্বে, কিংবা হয়তো বা একটু মুগ্ধ মনে। কাছে যাবার বেড়া যদি আর-একটু ফাঁক করতুম তা হলে কী জানি কী হত। রাগ করতেন, না রাগের ভান করতেন?

অত্যন্ত চঞ্চল মনে চলেছি আমার বাংলাঘরের দিকে এমন সময় চোখে পড়ল ছুই

টুকরোয় ছিন্নকরা একখানা চিঠির খাম। তাতে নাম লেখা, ভবতোষ মজুমদার আই. সি. এস, ছাপরা। তার বিশেষত্ব এই যে, এতে টিকিট আছে, কিন্তু সে টিকিটে ডাকঘরের ছাপ নেই। বুঝতে পারলুম ছেঁড়া চিঠির খামের মধ্যে একটা ট্র্যাজেডির ক্ষতচিহ্ন আছে। পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমার কাজ। সেই রকম কাজে লাগলুম ছেঁড়া খামটা নিয়ে।

ইতিমধ্যে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে আমার নিজের অন্তঃকরণটা। নিজের অপ্রমত্ত কঠিন মনটাকে চিনে নিয়েছি ব'লে স্পষ্ট ধারণা ছিল। আজ এই প্রথম দেখলুম তার পাশের পাড়াতেই লুকিয়ে বসে আছে বুদ্ধিশাসনের বহির্ভূত একটা অবোধ।

নির্জন অরণ্যের সুগভীর কেন্দ্রস্থলে একটা সুনিবিড় সম্মোহন আছে যেখানে চলছে তার বুড়ো বুড়ো গাছপালার কানে কানে চক্রান্ত, যেখানে ভিতরে ভিতরে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে সৃষ্টির আদিম প্রাণের মন্ত্রগুঞ্জরণ। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে তার সুর উদাত্ত পর্দায়, রাতে দুপুরে তার মন্ত্রগম্ভীর ধ্বনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবচেতনায়, বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে। জিয়লজি-চর্চার ভিতরে ভিতরেই মনের আন্তর্ভৌম প্রদেশে ব্যাপ্ত হচ্ছিল এই আরণ্যক মায়ার কাজ। হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠে সে এক মুহূর্তে আমার দেহমনকে আবিষ্ট করে দিল যখনই দেখলুম অচিরাকে কুসুমিত ছায়ালোকের পরিবেষ্টনে।

বাঙালি মেয়েকে ইতিপূর্বে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে এমন বিশুদ্ধ স্বপ্রকাশ স্বাতন্ত্র্যে দেখি নি। লোকালয়ে যদি এই মেয়েটিকে দেখতুম তা হলে যাকে দেখা যেত নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়িত বিমিশ্রিত এ মেয়ে সে নয়, এ দেখা দিল পরিবিস্তৃত নির্জন সবুজ নিবিড়তার পরিপ্রেক্ষিতে একান্ত স্বকীয়তায়। মনে হল না বেণী দুলিয়ে এ কোনো কালে ডায়োসিশনে পর্সেণ্টেজ রাখতে গেছে, শাড়ির উপরে গাউন ঝুলিয়ে ডিগ্রি নিতে গেছে কনভোকেশনে, বালিগঞ্জে টেনিস-পার্টিতে চা ঢালছে উচ্চ কলহাস্যে। অল্পবয়সে শুনেছি পুরোনো বাংলা গান— "মনে রইল সই মনের বেদনা"— তারই সরল সুরের সঙ্গে মিশিয়ে চিরকালের বাঙালি মেয়ের একটা করুণ চেহারা আমি দেখতে পেতুম, অচিরাকে দেখে মনে হল সেইরকম বারোয়াঁ গানে তৈরি বাণীমূর্তি, যে গান রেডিয়োতে বাজে না, গ্রামোফোনে পাড়া মুখর করে না। এদিকে আমার আপনার মধ্যে দেখলুম মনের নিচের তলাকার তপ্তবিগলিত একটা প্রদীপ্ত রহস্য হঠাৎ উপরের আলোতে উদ্‌গীর্ণ হয়ে উঠেছে।

বুঝতে পারছি আমি যখন রোজ বিকেলে এই পথ দিয়ে কাজে ফিরেছি অচিরা আমাকে দেখেছে, অন্যমনস্ক আমি ওকে দেখি নি। নিজের চেহারা সম্বন্ধে যে বিশ্বাস

এনেছি বিলেত থেকে, এই ঘটনা সম্পর্কে মনের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া যে হয় নি তা বলতে পারি নে। কিন্তু সন্দেহও ছিল। বিলেতফেরত কোনো কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছি, বিলিতি মেয়ের রুচির সঙ্গে বাঙালি মেয়ের রুচি মেলে না। এরা পুরুষের রূপে খোঁজে মেয়েলি মোলায়েম ছাঁদ। বাঙালি কার্তিক আর যাই হোক কোনো কালে দেবসেনাপতি ছিল না। এটা বলতে হবে আমাকেও ময়ূরে চড়ালে মানাবে না। এতদিন এসব আলোচনা আমার মনের ধার দিয়েও যায় নি। কিন্তু কয়েকদিন ধরে আমাকে ভাবিয়েছে। রোদেপোড়া আমার রঙ, লম্বা আমার দেহ, শক্ত আমার বাহু, দ্রুত আমার চলন, নাক চিবুক কপাল নিয়ে খুব স্পষ্ট রেখায় আঁকা আমার চেহারা। আমি নবনীনিন্দিত কষিতকাঞ্চনকান্তি বাঙালি মায়ের আদরের ধন নই।

আমার নিকটবর্তিনী বঙ্গনারীর সঙ্গে আমি মনে মনে ঝগড়া করেছি, একলা ঘরের কোণে বুক ফুলিয়ে বলেছি, 'তোমার পছন্দ পাই আর নাই পাই একথা নিশ্চয় জেনো তোমার দেশের চেয়ে বড়ো বড়ো দেশের স্বয়ম্বরসভার বরমাল্য উপেক্ষা করে এসেছি।' এই বানানো ঝগড়ার উষ্মায় একদিন হেসে উঠেছি আপন ছেলেমানুষিতে। আবার এদিকে বিজ্ঞানীর যুক্তিও কাজ করেছে ভিতরে ভিতরে। আপন মনে তর্ক করেছি, একান্ত নিভৃতে থাকাই যদি ওর প্রার্থনীয় তা হলে বারবার আমার সুস্পষ্ট দৃষ্টিপাত এড়িয়ে এতদিনে ও তো ঠাঁই বদল করত। কাজ সেরে এ পথ দিয়ে আগে যেতুম একবার মাত্র, আজকাল যখন-তখন যাতায়াত করি, যেন এই জায়গাটাতেই সোনার খনির খবর পেয়েছি। কখনও স্পষ্ট যখন চোখোচোখি হয়েছে আমার বিশ্বাস সেটাকে চার চোখের অপঘাত ব'লে ওর ধারণা হয় নি। এক-একদিন হঠাৎ পিছন-ফিরে দেখেছি আমার তিরোগমনের দিকে অচিরা তাকিয়ে আছে, ধরা পড়তেই দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগলুম। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কেম্ব্রিজের সতীর্থ প্রোফেসর আছেন বঙ্কিম। তাঁকে চিঠি লিখলুম, 'তোমাদের বেহার সিভিল সার্ভিসে আছেন এক ভদ্রলোক, নাম ভবতোষ। আমার কোনো বন্ধু, তাঁর মেয়ের জন্যে লোকটিকে উদ্বাহবন্ধনে জড়াবার দুষ্কর্মে সাহায্য করতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। জানতে চাই রাস্তা খোলসা কি না, আর লোকটার মতিগতি কী রকম।'

উত্তর এল, 'পাকা দেয়াল তোলা হয়ে গেছে, রাস্তা বন্ধ। তার পরেও লোকটার মতিগতি সম্বন্ধে যদি কৌতূহল থাকে তবে শোনো। এ দেশে থাকতে আমি যাঁর ছাত্র ছিলুম তাঁর নাম নাই জানলে। তিনি পরম পণ্ডিত আর ঋষিতুল্য লোক। তাঁর নাতনিটিকে যদি দেখ তা হলে জানবে সরস্বতী কেবল যে আবির্ভূত হয়েছেন

অধ্যাপকের বিদ্যামন্দিরে তা নয় তিনি দেহ নিয়ে এসেছেন তাঁর কোলে। এমন বুদ্ধিতে উজ্জ্বল অপরূপ সুন্দর চেহারা কখনও দেখি নি।"

"ভবতোষ ঢুকল শয়তান তাঁর স্বর্গলোকে। স্বল্পজল নদীর মতো বুদ্ধি তার অগভীর ব'লেই জল্ জল্ করে আর সেই জন্যেই তার বচনের ধারা অনর্গল। ভুললেন অধ্যাপক, ভুললেন নাতনি। রকমসকম দেখে আমাদের তো হাত নিস্‌পিস্ করতে থাকত। কিছু বলবার পথ ছিল না— বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি, বিলেত গিয়ে সিভিলিয়ান হয়ে আসবে তারই ছিল অপেক্ষা। তারও পাথেয় এবং খরচ জুগিয়েছেন কন্যার পিতা। লোকটার সর্দির ধাত, একান্ত মনে কামনা করেছিলুম নিউমোনিয়া হবে। হয় নি। পাস করলে পরীক্ষায়; দেশে ফেরবামাত্রই বিয়ে করলে ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ মুরব্বির মেয়েকে। লোকসমাজে নাতনির লজ্জা বাঁচাবার জন্যে মর্মাহত অধ্যাপক কোথায় অন্তর্ধান করেছেন জানি নে। অনতিকালের মধ্যে ভবতোষের অপ্রত্যাশিত পদোন্নতির সংবাদ এল। মস্ত একটা বিদায়ভোজের আয়োজন হল। শুনেছি খরচটা দিয়েছে ভবতোষ গোপনে নিজের পকেট থেকে। আমরাও নিজের পকেট থেকেই খরচ দিয়ে গুণ্ডা লাগিয়ে ভোজটা দিলুম লণ্ডভণ্ড করে। কাগজে কংগ্রেস-ওয়ালাদের প্রতিই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল ভবতোষেরই ইশারায়। আমি জানি এই সৎকার্যে তারা লিপ্ত ছিল না। যে নাগরা জুতো লেগেছিল পলায়মানের পিঠে, সেটা অধ্যাপকেরই এক প্রাক্তন ছাত্রের প্রশস্ত পায়ের মাপে। পুলিশ এল গোলমালের অনেক পরে— ইনস্পেক্টর আমার বন্ধু, লোকটা সহৃদয়।'

চিঠিখানা পড়লুম, প্রাক্তন ছাত্রটির প্রতি ঈর্ষা হল।

অচিরার সঙ্গে প্রথম কথাটি শুরু করাই সব চেয়ে কঠিন কাজ। আমি বাঙালি মেয়েকে ভয় করি। বোধ করি চেনা নেই ব'লেই। অথচ কাজে যোগ দেবার কিছু আগেই কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি। সিনেমামঞ্চপথবর্তিনী বাঙালি মেয়ের নতুন চাস-করা ভ্রূবিলাস দেখে তো স্তম্ভিত হয়েছি— তারা সব জাতবান্ধবী-- থাক্ তাদের কথা। কিন্তু অচিরাকে দেখলুম একালের ঠেলাঠেলি ভিড়ের বাইরে— নির্মল আত্ম-মর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে। আমি তাই ভাবছি প্রথম কথাটি শুরু করব কী করে।

জনরব এই যে কাছাকাছি ডাকাতি হয়ে গেছে। ভাবলুম, হিতৈষী হয়ে বলি 'রাজা-বাহাদুরকে ব'লে আপনার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করে দিই।' ইংরেজ মেয়ে হলে হয়তো গায়েপড়া আনুকূল্য সইতে পারত না, মাথা বাঁকিয়ে বলত, 'সে ভাবনা আমার।' এই বাঙালি মেয়ে অচেনার কাছ থেকে কী ভাবে কথাটা নেবে আমার জানা নেই, হয়তো আমাকেই ডাকাত ব'লে সন্দেহ করবে।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল সেটা উল্লেখযোগ্য।

দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অচিরার সময় হয়েছে ঘরে ফেরবার। এমন সময় একটা হিন্দুস্থানী গোঁয়ার এসে তার হাত থেকে তার খাতা আর থলিটা নিয়ে যখন ছুটেছে আমি তখনই বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললুম, "কোনো ভয় নেই আপনার।" এই বলে ছুটে সেই লোকটার ঘাড়ের উপর পড়তেই সে ব্যাগ খাতা ফেলে দৌড় মারলে। আমি লুঠের মাল নিয়ে এসে অচিরাকে দিলুম। অচিরা বললে, "ভাগ্যিস আপনি—"

আমি বললেম, "আমার কথা বলবেন না, ভাগ্যিস ঐ লোকটা এসেছিল।"

"তার মানে!"

"তার মানে তারই কৃপায় আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়ে গেল।"

অচিরা বিস্মিত হয়ে বললে, "কিন্তু ও যে ডাকাত।"

"এমন অন্যায় অপবাদ দেবেন না। ও আমার বরকন্দাজ, রামশরণ।"

অচিরা মুখের উপর খয়েরি রঙের আঁচল টেনে নিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। হাসি থামতে চায় না। কী মিষ্টি তার ধ্বনি। যেন ঝর্নার নিচে নুড়িগুলো ঠুন্‌ঠুন্ করে উঠে সুরে সুরে। হাসি-অবসানে সে বললে, "কিন্তু সত্যি হলে খুব মজা হত।"

"মজা কার পক্ষে?"

"যাকে নিয়ে ডাকাতি।"

"আর উদ্ধারকর্তার?"

"বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে দিতুম আর গোটা দুয়েক স্বদেশী বিস্কুট।"

"আর এই ফাঁকি উদ্ধারকর্তার কী হবে।"

"যে রকম শোনা গেল তাঁর তো আর-কিছুতে দরকার নেই, কেবল প্রথম কথাটা।"

"ঐ প্রথম পদক্ষেপেই গণিতের অগ্রগতিটা কি বন্ধ হবে।"

"কেন হবে। ওকে চালাবার জন্যে বরকন্দাজের সাহায্য দরকার হবে না।"

বসলুম সেখানেই ঘাসের উপরে। একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপরে বসে ছিল অচিরা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি হলে আমাকে প্রথম কথাটা কী বলতেন।"

"বলতুম, রাস্তায় ঘাটে ঢেলা কুড়িয়ে কুড়িয়ে করছেন কী। আপনার কি বয়স হয় নি।"

"বলেন নি কেন।"

"ভয় করেছিল।"

"আমাকে ভয় কিসের?"

"আপনি যে মস্ত লোক, দাদুর কাছে শুনেছি। তিনি আপনার লেখা প্রবন্ধ বিলিতি কাগজে পড়েছেন। তিনি যা পড়েন আমাকে শোনাতে চেষ্টা করেন।"

"এটাও কি করেছিলেন।"

"নিষ্ঠুর তিনি, করেছিলেন। লাটিন শব্দের ভিড় দেখে জোড়হাত করে তাঁকে বলেছিলুম, দাদু এটা থাক্। বরঞ্চ তোমার সেই কোয়াণ্টম থিয়োরির বইখানা খোলো।"

"সে থিয়োরিটা বুঝি আপনার জানা আছে?"

"কিছুমাত্র না। কিন্তু দাদুর দৃঢ় বিশ্বাস সবাই সবকিছু বুঝতে পারে। আর তাঁর অদ্ভুত এই একটা ধারণা যে, মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের বুদ্ধির চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। তাই ভয়ে ভয়ে আছি অবিলম্বে আমাকে 'টাইম-স্পেস'এর জোড়মিলনের ব্যাখ্যা শুনতে হবে। দিদিমা যখন বেঁচে ছিলেন, দাদু বড়ো বড়ো কথা পাড়লেই তিনি মুখ বন্ধ করে দিতেন; এটাই যে মেয়েদের বুদ্ধির প্রমাণ, দাদু কিন্তু সেটা বোঝেন নি।"

অচিরার দুই চোখ স্নেহে আর কৌতুকে ছল্‌ছল্ জল্‌জল্ করে উঠল।

দিনের আলো নিঃশেষ হয়ে এল। সন্ধ্যার প্রথম তারা জ্বলে উঠেছে একটা একলা তালগাছের মাথার উপরে। সাঁওতাল মেয়েরা ঘরে চলেছে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, "কোথায় তুমি। অন্ধকার হয়ে এল যে! আজকাল সময় ভালো নয়।"

অচিরা উত্তর দিল, "সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাই জন্যে একজন ভলণ্টিয়র নিযুক্ত করেছি।"

আমি অধ্যাপকের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি পরিচয় দিলুম, "আমার নাম শ্রীনবীনমাধব সেনগুপ্ত।"

বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "বলেন কি! আপনিই ডাক্তার সেনগুপ্ত? কিন্তু আপনাকে যে বড়ো ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে।"

আমি বললুম, "ছেলেমানুষ না তো কী। আমার বয়স এই ছত্রিশের বেশি নয়— সাঁইত্রিশে পড়ব।"

আবার অচিরার সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি। আমার মনে যেন দুন লয়ের ঝংকারে

সেতার বাজিয়ে দিল। বললে, "দাদুর কাছে সবাই ছেলেমানুষ। আর উনি নিজে সব ছেলেমানুষের আগরওয়াল।"

অধ্যাপক হেসে বললেন, "আগরওয়াল, ভাষায় নতুন শব্দের আমদানি।"

অচিরা বললে, "মনে নেই, সেই যে তোমার মাড়োয়ারি ছাত্র কুন্দনলাল আগরওয়ালা, আমাকে এনে দিত বোতলে করে কাঁচা আমের চাট্‌নি। তাকে জিগ্‌গেসা করেছিলুম আগরওয়াল শব্দের অর্থ কী— সে ফস্‌ করে বলে দিল পায়োনিয়র।"

অধ্যাপক বললেন, "ডাক্তার সেনগুপ্ত, আপনার সঙ্গে আলাপ হল যদি আমাদের ওখানে খেতে যেতে হবে তো।"

"কিছু বলতে হবে না দাদু, যাবার জন্যে ওঁর মন লাফালাফি করছে। আমি যে এইমাত্র ওঁকে বলে দিয়েছি দেশকালের মিলনতত্ত্ব তুমি ব্যাখ্যা করবে।"

মনে মনে বললুম, 'বাস্‌ রে, কী দুষ্টুমি।'

অধ্যাপক উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, "আপনার বুঝি 'টাইম-স্পেস'এর—"

আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলুম, "কিছু জানা নেই— বোঝাতে গেলে আপনার বৃথা সময় নষ্ট হবে।"

বৃদ্ধ ব্যগ্র হয়ে বলে উঠলেন, "এখানে সময়ের অভাব কোথায়। আচ্ছা, এক কাজ করুন না, আজই চলুন আমার ওখানে আহার করবেন।"

আমি লাফ দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম, 'এখ্‌খনি।' অচিরা বলে উঠল, "দাদু, সাধে তোমাকে বলি ছেলেমানুষ। যখন খুশি নেমন্তন্ন করে ফেল, আমি পড়ি মুশকিলে। ওঁরা বিলেতের ডিনার-খাইয়ে সর্বগ্রাসী মানুষ, কেন তোমার নাতনির বদনাম করবে।"

অধ্যাপক ধমক-খাওয়া বালকের মতো বললেন, "আচ্ছা, তবে আর কোন্‌ দিন আপনার সুবিধে হবে বলুন।"

"সুবিধে আমার কালই হতে পারবে কিন্তু অচিরা দেবীকে রসদ নিয়ে বিপন্ন করতে চাই নে। পাহাড়ে পর্বতে ঘুরি, সঙ্গে রাখি থলি ভরে চিঁড়ে, ছড়াকয়েক কলা, বিলিতি বেগুন, কাঁচা ছোলার শাক, চিনেবাদাম। আমিই বরঞ্চ সঙ্গে নিয়ে আসব ফলারের আয়োজন। অচিরা দেবী যদি স্বহস্তে দই দিয়ে মেখে দেন লজ্জা পাবে ফিরপোর দোকান।"

"দাদু, বিশ্বাস কোরো না এইসব মুখমিষ্টি লোককে। উনি নিশ্চয় পড়েছেন তোমার সেই লেখাটা বাংলা কাগজে, সেই ভিটামিনের গুণপ্রচার। তাই তোমাকে খুশি করবার জন্যে শোনালেন চিঁড়েকলার ফর্দ।"

মুশকিলে ফেললে। বাংলা কাগজ পড়া তো আমার ঘটেই ওঠে না।

অধ্যাপক উৎফুল্ল হয়ে জিগ্‌গেসা করলেন, "সেটা পড়েছেন বুঝি।"

অচিরার চোখের কোণে দেখতে পেলুম একটু হাসি। তাড়াতাড়ি শুরু করে দিলুম, "পড়ি আর নাই পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে" — আসল কথাটা আর হাতড়ে পাইনে।

অচিরা দয়া করে ধরিয়ে দিলে, "আসল কথা উনি নিশ্চিত জানেন, কাল যদি তোমার ওখানে নেমন্তন্ন জোটে তা হলে ওঁর পাতে পশুপক্ষী স্থাবরজঙ্গম কিছুই বাদ যাবে না। তাই অত নিশ্চিন্ত মনে বিলিতি বেগুনের নামকীর্তন করলেন। দাদু, তুমি সবাইকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস কর, এমনকি, আমাকেও। সেইজন্যেই ঠাট্টা করে তোমাকে কিছু বলতে সাহস হয় না।"

কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে ওঁদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি এমন সময় অচিরা হঠাৎ আমাকে বলে উঠল, "বাস্‌ আর নয়— এইবার যান বাসায় ফিরে।"

আমি বললুম, "দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেব।"

অচিরা বললে, "সর্বনাশ, দরজা পেরলেই আলুথালু উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের দুজনের সম্মিলিত রচনা। আপনি অবজ্ঞা করে বলবেন বাঙালি মেয়েরা অগোছালো। একটু সময় দিন, কাল দেখলে মনে হবে শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজার অপূর্ব কীর্তি, মেমসাহেবী সৃষ্টি।"

অধ্যাপক কিছু কুণ্ঠিত হয়ে আমাকে বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না— দিদি বড়ো বেশি কথা কচ্ছে। কিন্তু ওটা ওর স্বভাব নয় মোটে। এখানে অত্যন্ত নির্জন, তাই ও আমার মনের ফাঁক ভরে রেখে দেয় কথা কয়ে। সেটা ওর অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। ও যখন চুপ করে থাকে ঘরটা ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে, আমার মনটাও। ও নিজে জানে না সে কথা। আমার ভয় হয় পাছে বাইরের লোকে ওকে ভুল বোঝে।"

বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে অচিরা বললে "বুঝুক-না দাদু। অত্যন্ত অনিন্দনীয়া হতে চাই নে, সেটা অত্যন্ত আনইণ্টারেস্টিঙ।"

অধ্যাপক সগর্বে বলে উঠলেন, "আমার দিদি কিন্তু কথা বলতে জানে, অমন আর কাউকে দেখি নি।"

"তুমিও আমার মতো কাউকে দেখ নি, আমিও কাউকে দেখি নি তোমার মতো।"

আমি বললুম, "আচার্যদেব, আজ বিদায় নেবার পূর্বে আমাকে একটা কথা দিতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আপনি যতবার আমাকে আপনি বলেন, আমি মনে মনে ততবার জিভ কাটি। আমাকে দয়া করে তুমি ব'লে যদি ডাকেন তা হলে মন সহজে সাড়া দেবে। আপনার নাতনিও সহকারিতা করবেন।"

অচিরা দুই হাত নেড়ে বললে, "অসম্ভব, আরও কিছুদিন যাক। সর্বদা দেখাশুনো হতে হতে বড়োলোকের তিলকলাঞ্ছন যখন ঘষা পয়সার মতো পালিশ করা হয়ে যাবে তখন সবই সম্ভব হবে। দাদুর কথা স্বতন্ত্র। আমি বরঞ্চ ওঁকে পড়িয়ে নিই। বলো তো দাদু, তুমি কাল খেতে এসো। দিদি যদি মাছের ঝোলে নুন দিতে ভোলে মুখ না বেঁকিয়ে বোলো, কী চমৎকার। বোলো সবটা আমারই পাতে দেওয়া ভালো, অন্যরা এরকম রান্না তো প্রায়ই ভোগ করে থাকেন।"

অধ্যাপক সস্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই, তুমি বুঝতে পারবে না আসলে এই মেয়েটি লাজুক তাই যখন আলাপ করা কর্তব্য মনে করে তখন সংকোচ ঠেলে উঠতে গিয়ে কথা বেশি হয়ে পড়ে।"

"দেখেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত, দাদু আমাকে কী রকম মধুর করে শাসন করেন। অনায়াসে বলতে পারতেন, তুমি বড়ো মুখরা, তোমার বকুনি অসহ্য। আপনি কিন্তু আমাকে ডিফেণ্ড করবেন। কী বলবেন বলুন তো।"

"আপনার মুখের সামনে বলব না।"

"বেশি কঠোর হবে?"

"আপনি মনে মনেই জানেন।"

"থাক্, থাক্, তা হলে বলে কাজ নাই। এখন বাড়ি যান।"

আমি বললুম, "তার আগে সব কথাটা শেষ করে নিই। কাল আপনাদের ওখানে আমার নেমন্তন্নটা নামকর্তন-অনুষ্ঠানের। কাল থেকে নবীনমাধব নামটা থেকে কাটা পড়বে ডাক্তার সেনগুপ্ত। সূর্যের কাছাকাছি এলে ধূমকেতুর কেতুটা পায় লোপ, মুণ্ডুটা থাকে বাকি।"

এইখানে শেষ হল আমার বড়োদিন। দেখলুম বার্ধক্যের কী সৌম্যসুন্দর মূর্তি। পালিশ-করা লাঠি হাতে, গলায় শুভ্র পাটকরা চাদর, ধুতি যত্নে কোঁচানো, গায়ে তসরের জামা, মাথায় শুভ্র চুল বিরল হয়ে এসেছে কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্পষ্ট বোঝা যায়, নাতনির হাতের শিল্পকার্য এঁর বেশভূষণে এঁর দিনযাত্রায়। অতিলালনের অত্যাচার ইনি সস্নেহে সহ্য করেন, খুশি রাখবার জন্যে নাতনিটিকে।

এই গল্পের পক্ষে অধ্যাপকের ব্যাবহারিক নাম অনিলকুমার সরকার। তিনি গত

জেনেরেশনের কেম্ব্রিজের বড়ো পদবীধারী। মাস আষ্টেক আগে কোনো কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে এখানকার এস্টেটের একটা পোড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজের খরচে সেটা বাসযোগ্য করেছেন।

অন্তপর্ব

আমার গল্পের আদিপর্ব হল শেষ। ছোটো গল্পের আদি ও অন্তের মাঝখানে বিশেষ একটা ছেদ থাকে না— ওর আকৃতিটা গোল।

অচিরার সঙ্গে আমার অপরিচয়ের ব্যবধান ক্ষয় হয়ে আসছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যেন পরিচয়টাই ব্যবধান। কাছাকাছি আসছি বটে কিন্তু তাতে একটা প্রতিঘাত জাগছে। কেন? অচিরার প্রতি আমার ভালোবাসা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে, অপরাধ কি তারই মধ্যে। কিংবা আমার দিকে ওর সৌহৃদ্য স্ফুটতর হয়ে উঠছে, সেইটেতেই ওর গ্লানি। কে জানে।

সেদিন চড়িভাতি তনিকা নদীর তীরে।

অচিরা ডাক দিলে, "ডাক্তার সেনগুপ্ত।"

আমি বললুম, "সেই প্রাণীটার কোনো ঠিকানা নেই, সুতরাং কোনো জবাব মিলবে না।"

"আচ্ছা, তা হলে নবীনবাবু।"

"সেও ভালো, যাকে বলে মন্দর ভালো।"

"কাণ্ডটা কী দেখলেন তো?"

আমি বললুম, "আমার সামনে লক্ষ্য করবার বিষয় কেবল একটিমাত্রই ছিল, আর কিছুই ছিল না।"

এইটুকু ঠাট্টায় অচিরা সত্যই বিরক্ত হয়ে বললে, "আপনার আলাপ ক্রমেই যদি অমন ইশারাওয়ালা হয়ে উঠতে থাকে তা হলে ফিরিয়ে আনব ডাক্তার সেনগুপ্তকে, তাঁর স্বভাব ছিল গম্ভীর।"

আমি বললুম, "আচ্ছা তা হলে কাণ্ডটা কী হয়েছিল বলুন।"

"ঠাকুর যে ভাত রেঁধেছিল সে কড়্‌কড়ে, আদ্ধেক তার চাল। আমি বললুম, দাদু, এ তো তোমার চলবে না। দাদু অমনি ব'লে বসলেন, জান তো ভাই, খাবার জিনিস শক্ত হলে ভালো করে চিবোবার দরকার হয়, তাতেই হজমের সাহায্য করে। পাছে আমি দুঃখ করি দাদুর জেগে উঠল সায়েন্সের বিদ্যে। নিমকিতে নুনের বদলে যদি চিনি দিত তা হলে নিশ্চয় দাদু বলত, চিনিতে শরীরের এনার্জি বাড়িয়ে দেয়।"

"দাদু, ও দাদু, তুমি ওখানে বসে বসে কী পড়ছ। আমি যে এদিকে তোমার চরিত্রে অতিশয়োক্তি-অলংকার আরোপ করছি, আর নবীনবাবু সমস্তই বেদবাক্য ব'লে বিশ্বাস করে নিচ্ছেন।"

কিছু দূরে পোড়ো মন্দিরের সিঁড়ির উপরে বসে অধ্যাপক বিলিতি ত্রৈমাসিক পড়ছিলেন। অচিরার ডাক শুনে সেখান থেকে উঠে আমাদের কাছে বসলেন। ছেলেমানুষের মতো হঠাৎ আমাকে জিগ্‌গেসা করলেন, "আচ্ছা নবীন, তোমার কি বিবাহ হয়েছে।"

কথাটা এতই সুস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জক যে আর কেউ হলে বলত 'না', কিংবা ঘুরিয়ে বলত।

আমি আশাপ্রদ ভাষায় উত্তর দিলুম, "না, এখনও হয় নি।"

অচিরার কাছে কোনো কথা এড়ায় না। সে বললে, "ঐ এখনও শব্দটা সংশয়গ্রস্ত কন্যাকর্তাদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে, ওর কোনো যথার্থ অর্থ নেই।"

"একেবারেই নেই নিশ্চিত ঠাওরালেন কী করে।"

"ওটা গণিতের প্রব্লেম, সেও হাইয়ার ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স্ নয়। পূর্বেই শোনা গেছে আপনি ছত্রিশ বছরের ছেলেমানুষ। হিসেব করে দেখলুম এর মধ্যে আপনার মা অন্তত পাঁচ-সাতবার বলেছেন, 'বাবা ঘরে বউ আনতে চাই।' আপনি জবাব করেছেন, 'তার পূর্বে ব্যাঙ্কে টাকা আনতে চাই।' মা চোখের জল মুছে চুপ করে রইলেন, তার পরে মাঝখানে আপনার আর-সব ঘটেছিল কেবল ফাঁসি ছিল বাকি। শেষকালে এখানকার রাজ-সরকারে মোটা মাইনের কাজ জুটল। মা বললেন, 'এইবার বউ নিয়ে এসো ঘরে। বড়ো কাজ পেয়েছ।' আপনি বললেন, 'বিয়ে করে সে কাজ মাটি করতে পারব না।' আপনার ছত্রিশ বছরের গণিতফল গণনা করতে ভুল হয়েছে কি না বলুন।"

এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা বলা নিরাপদ নয়। কিছুদিন আগেই আমার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। কথায় কথায় অচিরা আমাকে বলেছিল, "আমাদের দেশের মেয়েরা আপনাদের সংসারের সঙ্গিনী হতে পারে কিন্তু বিলেতে যারা জ্ঞানের তাপস তাদের তপস্যার সঙ্গিনী তো জোটে, যেমন ছিলেন অধ্যাপক কুরির সধর্মিণী মাদাম কুরি। আপনার কি তেমন কেউ জোটে নি।"

মনে পড়ে গেল ক্যাথারিনকে। সে একইকালে আমার বিজ্ঞানের এবং জীবনযাত্রার সাহচর্য করতে চেয়েছিল।

অচিরা জিগ্‌গেসা করলে, "আপনি কেন তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন না।"

কী উত্তর দেব ভাবছিলুম, অচিরা বললে, "আমি জানি কেন। আপনার সত্যভঙ্গ

হবে এই ভয় ছিল ; নিজেকে আপনার মুক্ত রাখতেই হবে। আপনি যে সাধক। আপনি তাই নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর নিজের প্রতি, নিষ্ঠুর তার 'পরে যে আপনার পথের সামনে আসে। এই নিষ্ঠুরতায় আপনার বীরত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে বললে, "বাংলা সাহিত্য বোধ হয় আপনি পড়েন না। কচ ও দেবযানী ব'লে একটা কবিতা আছে। তার শেষ কথাটা এই, মেয়েদের ব্রত পুরুষকে বাঁধা, আর পুরুষের ব্রত মেয়ের বাঁধন কাটিয়ে স্বর্গলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে, আর আপনি মায়ের অনুনয়— একই কথা।"

আমি বললুম, "দেখুন, আমি হয়তো ভুল করেছিলুম। মেয়েদের নিয়ে পুরুষের কাজ যদি না চলে তা হলে মেয়েদের সৃষ্টি কেন।"

অচিরা বললে, "বারো-আনার চলে, মেয়েরা তাদের জন্যেই। কিন্তু বাকি মাইনরিটি যারা সব কিছু পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছে তাদের চলে না। সব-পেরোবার মানুষকে মেয়েরা যেন চোখের জল ফেলে রাস্তা ছেড়ে দেয়। যে দুর্গম পথে মেয়েপুরুষের চিরকালের দ্বন্দ্ব সেখানে পুরুষেরা হোক জয়ী। যে মেয়েরা মেয়েলি, প্রকৃতির বিধানে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি, তারা ছেলে মানুষ করে, সেবা করে ঘরের লোকের। যে পুরুষ যথার্থ পুরুষ, তাদের সংখ্যা খুব কম ; তারা অভিব্যক্তির শেষ কোঠায়। মাথা তুলছে দুটি-একটি করে। মেয়েরা তাদের ভয় পায়, বুঝতে পারে না, টেনে আনতে চায় নিজের অধিকারের গণ্ডিতে। এই তত্ত্ব শুনেছি আমার দাদুর কাছে।

"দাদু, তোমার পড়া রেখে আমার কথা শোনো। মনে আছে, তুমি একদিন বলেছিলে, পুরুষ যেখানে অসাধারণ সেখানে সে নিরতিশয় একলা, নিদারুণ তার নিঃসঙ্গতা, কেননা তাকে যেতে হয় যেখানে কেউ পৌঁছয় নি। আমার ডায়ারিতে লেখা আছে।"

অধ্যাপক মনে করবার চেষ্টা করে বললেন, "বলেছিলুম নাকি? হয়তো বলেছিলুম।"

অচিরা খুব বড়ো কথাও কয় হাসির ছলে, আজ সে অত্যন্ত গম্ভীর।

খানিক বাদে আবার সে বললে, "দেবযানী কচকে কী অভিসম্পাত দিয়েছিল জানেন?"

"না।"

"বলেছিল, 'তোমার সাধনায় পাওয়া বিদ্যা তোমার নিজের ব্যবহারে লাগাতে

পারবে না।' যদি এই অভিসম্পাত আজ দিত দেবতা য়ুরোপকে, তা হলে য়ুরোপ বেঁচে যেত। বিশ্বের জিনিসকে নিজের মাপে ছোটো করেই ওখানকার মানুষ মরছে লোভের তাড়ায়। সত্যি কি না বলো দাদু।"

"খুব সত্যি, কিন্তু এত কথা কী করে ভাবলে।"

"নিজের বুদ্ধিতে না। একটা তোমার মহদ্‌গুণ আছে, কখন কাকে কী যে বল, ভোলানাথ তুমি সব ভুলে যাও। তাই চোরাই মালের উপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভাবনা থাকে না।"

আমি বললুম, "নিজের ছাপ যদি লাগে তা হলেই অপরাধ খণ্ডন হয়।"

"জানেন, নবীনবাবু, ওঁর কত ছাত্র ওঁর কত মুখের কথা খাতায় টুকে নিয়ে বই লিখে নাম করেছে। উনি তাই পড়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশংসা করেছেন, বুঝতেই পারেন নি নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন। কোন্ কথা আমার কথা আর কোন্ কথা ওঁর নিজের সে ওঁর মনে থাকে না— লোকের সামনে আমাকে বলে বসেন ওরিজিন্যাল, তখন সেটার প্রতিবাদ করার মতো মনের জোর পাওয়া যায় না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নবীনবাবুরও এ ভ্রম ঘটছে। কী করব বলো, আমি তো কোটেশন-মার্কা দিয়ে দিয়ে কথা বলতে পারি নে।"

"নবীনবাবুর এ ভ্রম কোনোদিন ঘুচবে না।"

অচিরা বললে, "দাদু একদিন আমাদের কলেজ-ক্লাসে কচ ও দেবযানীর ব্যাখ্যা করছিলেন। কচ হচ্ছে পুরুষের প্রতীক, আর দেবযানী মেয়ের। সেই দিন নির্মম পুরুষের মহৎ গৌরব মনে মনে মেনেছি, মুখে কক্‌খনো স্বীকার করি নে।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু দিদি, আমার কোনো কথায় মেয়েদের গৌরবের আমি কোনোদিন লাঘব করি নি।"

"তুমি আবার করবে। হায় রে। মেয়েদের তুমি যে অন্ধ ভক্ত। তোমার মুখের স্তবগান শুনে মনে মনে হাসি। মেয়েরা নির্লজ্জ হয়ে সব মেনে নেয়। তার উপরেও বুক ফুলিয়ে সতীসাধ্বীগিরির বড়াই করে নিজের মুখে। সস্তায় প্রশংসা আত্মসাৎ করা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

অধ্যাপক বললেন, "না দিদি, অবিচার কোরো না। অনেক কাল ওরা হীনতা সহ্য করেছে, হয়তো সেইজন্যেই নিজেদের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে একটু বেশি জোর দিয়ে তর্ক করে।"

"না দাদু, ও তোমার বাজে কথা। আসল হচ্ছে এটা স্ত্রীদেবতার দেশ— এখানে পুরুষেরা স্ত্রৈণ, মেয়েরাও স্ত্রৈণ। এখানে পুরুষরা কেবলই 'মা মা' করছে, আর মেয়েরা

চিরশিশুদের আশ্বাস দিচ্ছে যে তারা মায়ের জাত। আমার তো লজ্জা করে। পশু-পক্ষীদের মধ্যেও মায়ের জাত নেই কোথায়?"

চিত্তচাঞ্চল্যে কাজের এত বাধা ঘটছে যে লজ্জা পাচ্ছি মনে মনে। সদরে বাজেটের মিটিঙে রিসর্চবিভাগে আরও কিছু দান মঞ্জুর করিয়ে নেবার প্রস্তাব ছিল। তার সমর্থক রিপোর্টখানা অর্ধেকের বেশি লেখাই হয় নি। অথচ এদিকে ক্রোচের এস্‌থেটিক্‌স্‌ নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা শুনে আসছি। অচিরা নিশ্চিত জানে বিষয়টা আমার উপলব্ধি ও উপভোগের সম্পূর্ণ বাইরে। তা হলেও চলত, কিন্তু আমার বিশ্বাস ব্যাপারটাকে সে ইচ্ছে করে শোচনীয় করে তুলেছে। ঠিক এই সময়টাতেই সাঁওতালদের পার্বণ। তারা পচাই মদ খাচ্ছে আর মাদল বাজিয়ে মেয়ে-পুরুষে নৃত্য করছে। অচিরা ওদের পরম বন্ধু। মদের পয়সা জোগায়, সালু কিনে দেয় সাঁওতাল ছেলেদের কোমর বাঁধবার জন্যে, বাগান থেকে জবাফুলের জোগান দেয় সাঁওতাল মেয়েদের চুলে পরবার। ওকে না হলে তাদের চলেই না। অচিরা অধ্যাপককে বলেছে, ও তো এ কদিন থাকতে পারবে না অতএব এই সময়টাতে বিরলে আমাকে নিয়ে ক্রোচের রসতত্ত্ব যদি পড়ে শোনান তা হলে আমার সময় আনন্দে কাটবে। একবার সসংকোচে বলেছিলুম, 'সাঁওতালদের উৎসব দেখতে আমার বিশেষ কৌতূহল আছে।' স্বয়ং অধ্যাপক বললেন, না, সে আপনার ভালো লাগবে না। আমার ইনটেলেক্‌চুয়ল মনোবৃত্তির নির্জলা একান্ততার 'পরে তাঁর এত বিশ্বাস। মধ্যাহ্নভোজনের পরেই অধ্যাপক গুন গুন করে পড়ে চলেছেন। দূরে মাদলের আওয়াজ এক-একবার থামছে। পরক্ষণেই দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠছে। কখনও বা পদশব্দ কল্পনা করছি, কখনও বা হুতাশ হয়ে ভাবছি অসমাপ্ত রিপোর্টের কথা। সুবিধে এই অধ্যাপক জিগ্‌গেসাই করেন না কোথাও আমার ঠেকছে কিনা। তিনি ভাবেন সমস্তই জলের মতো সোজা। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ উপলক্ষে প্রশ্ন করেন, আপনারও কি এই মনে হয় না। আমি খুব জোরের সঙ্গে বলি, নিশ্চয়।

ইতিমধ্যে কিছুদূরে আমাদের অর্ধসমাপ্ত কয়লার খনিতে মজুরদের হল স্ট্রাইক। ঘটালেন যিনি, এই তাঁর ব্যাবসা, স্বভাব এবং অভাব বশত; সমস্ত কাজের মধ্যে এইটেই সব চেয়ে সহজ। কোনো কারণ ছিল না, কেননা আমি নিজে সোশালিস্ট, সেখানকার বিধিবিধান আমার নিজের হাতে বাঁধা, কারও সেখানে না ছিল লোকসান, না ছিল অসম্মান।

নূতন যন্ত্র এসেছে জর্মনি থেকে, তারই খাটাবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি। এমন

সময় উত্তেজিত ভাবে এসে উপস্থিত অচিরা। বললে, "আপনি মোটা মাইনে নিয়ে ধনিকের নায়েবি করছেন, এদিকে গরিবের দারিদ্র্যের সুযোগটাকে নিয়ে আপনি—"

চন্ করে উঠল মাথা। বাধা দিয়ে বললুম, "কাজ চালাবার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা যাদের তারাই অন্যায়কারী, আর জগতে যারা কোনো কাজই করে না করতে পারেও না, দয়ামায়া কেবল তাদেরই— এই সহজ অহংকারের মত্ততায় সত্যমিথ্যার প্রমাণ নিতেও মন চায় না।"

অচিরা বললে, "সত্য নয় বলতে চান?"

আমি বললুম, "সত্য শব্দটা আপেক্ষিক। যা কিছু যত ভালোই হোক, তার চেয়ে আরও ভালো হতেও পারে। এই দেখুন-না আমার মোটা মাইনে বটে, তার থেকে মাকে পাঠাই পঞ্চাশ, নিজে রাখি ত্রিশ, আর বাকি— সে হিসেবটা থাক। কিন্তু মার জন্যে পনেরো নিজের জন্যে পাঁচ রাখলে আইডিয়ালের আরও কাছ ঘেঁষে যেত, কিন্তু একটা সীমা আছে তো।"

অচিরা বললে, "সীমাটা কি নিজের ইচ্ছের উপরেই নির্ভর করে।"

আমি বললুম, "না, অবস্থার উপরে। যে কথাটা উঠল সেটা একটু বিচার করে দেখুন। য়ুরোপে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে। যাদের হাতে টাকা ছিল এবং টাকা করবার প্রতিভা ছিল তারাই এটা গড়েছে। গড়েছে নিছক টাকার লোভে, সেটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু ঐ ঘুষটুকু যদি না পেত তা হলে একেবারে গড়াই হত না, এতদিন পরে আজ ওখানে পড়েছে হিসেবনিকেশের তলব।"

অচিরা বললে, "আপনি বলতে চান পায়ে তেল শুরুতে, কানমলা তার পরে?"

"নিশ্চয়। আমাদের দেশে ভিত-গাঁথা সবে আরম্ভ হয়েছে এখনই যদি মার লাগাই তা হলে শুরুতেই হবে শেষ, সুবিধে হবে বিদেশী বণিকদের। মানছি আজ আমি লোভীদের ঘুষ দেওয়ার কাজ নিয়েছি, টাকাওয়ালার নায়েবি আমি করি। আজ সেলাম করছি বাদশার দরবারে এসে, কাল ওদের সিংহাসনের পায়ায় লাগাব কুড়ুল। ইতিহাসে তো এই দেখা গেছে।"

অচিরা বললে, "সব বুঝলুম। কিন্তু আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছি দেখতে, এই স্ট্রাইক মেটাতে আপনি নিজে কবে যাবেন। নিশ্চয়ই আপনাকে ডাকও পড়েছিল। কিন্তু কেন যান নি?"

চাপা গলায় বলতে চেষ্টা করলুম, "এখানে কাজ ছিল বিস্তর।" কিন্তু ফাঁকি দেব কী করে। আমার ব্যবহারে তো আমার কৈফিয়তের প্রমাণ হয় না।

কঠিন হাসি হেসে দ্রুতপদে চলে গেল অচিরা।

আর চলবে না। একটা শেষ নিষ্পত্তি করাই চাই। নইলে অপমানের অন্ত থাকবে না।

সাঁওতালী পার্বণ শেষ হয়েছে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছি। অচিরা সঙ্গে ছিল। উত্তরের দিকে একটা পাহাড় উঠেছে, আকাশের নীলের চেয়ে ঘন নীল। তার গায়ে গায়ে চারা শাল আর বৃদ্ধ শাল গাছে বন অন্ধকার। মাঝখান দিয়ে কাঠুরেদের পায়ে-চলার পথ। অধ্যাপক একটা অর্কিড ফুল বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ করছেন, তাঁর পকেটে সর্বদা থাকে আতস কাচ।

গাছগুলোর মধ্যে অন্ধকার যেখানে ভ্রূকুটিল হয়ে উঠেছে আর ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে তীব্র আওয়াজে, অচিরা বসল একটা শেওলাঢাকা পাথরের উপর। পাশে ছিল মোটা জাতের বাঁশগাছ, তারই ছাঁটা কঞ্চির উপর আমি বসলুম। আজ সকাল থেকে অচিরার মুখে বেশি কথা ছিল না। সেইজন্যেই তার সঙ্গে আমার কথা কওয়া বাধা পাচ্ছিল।

সামনের দিকে তাকিয়ে এক সময় সে আস্তে আস্তে বলে উঠল, "সমস্ত বনটা মিলে প্রকাণ্ড একটা বহুঅঙ্গওয়ালা প্রাণী। গুঁড়ি মেরে বসে আছে শিকারি জন্তুর মতো। যেন স্থলচর অক্টোপাশ, কালো চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নিরন্তর হিপনটিজমে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে আমার মনের মধ্যে একটা ভয়ের বোঝা যেন নিরেট হয়ে উঠেছে।"

আমি বললুম, "কতকটা এইরকম কথাই এই সেদিন আমার ডায়ারিতে লিখেছি।"

অচিরা বলে চলল, "মনটা যেন পুরোনো ইমারত, সকল কাজের বার। নিষ্ঠুর অরণ্য যেখানে পেয়েছে তার ফাটল, চালিয়ে দিয়েছে শিকড়, সমস্ত ভিতরটাকে টানছে ভাঙনের দিকে। এই বোবা কালা মহাকায় জন্তু মনের ফাটল আবিষ্কার করতে মজবুত—আমার ভয় বেড়ে চলেছে। দাদু বলেছিলেন, 'লোকালয় থেকে একান্ত দূরে থাকলে মানুষের মনঃপ্রকৃতি আসে অবশ হয়ে, প্রবল হয়ে ওঠে তার প্রাণ-প্রকৃতি।' আমি জিগ্‌গেস করলুম, 'এর প্রতিকার কী।' তিনি বললেন, 'মানুষের মনের শক্তিকে আমরা সঙ্গে করে আনতে পারি, এই দেখো-না এনেছি তাকে আমার লাইব্রেরিতে।' দাদুর উপযুক্ত এই উত্তর। কিন্তু আপনি কী বলেন।"

আমি বললুম, "আমাদের মন খোঁজে এমন একজন মানুষের সঙ্গ যে আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ জাগিয়ে রাখতে পারে, চেতনার বন্যা বইয়ে দেয় জনশূন্যতার মধ্যে। এ তো লাইব্রেরির সাধ্য নয়।"

অচিরা একটু অবজ্ঞা করে বললে, "আপনি যার খোঁজ করছেন তেমন মানুষ পাওয়া যায় বইকি, যদি বড্ড দরকার পড়ে। তারা চৈতন্যকে উসকিয়ে তোলে নিজের দিকেই, বন্যা বইয়ে দিয়ে সাধনার বাঁধ ভেঙে ফেলে। এ সমস্তই কবিদের বানানো কথা, মোহরস দিয়ে জারানো। আপনাদের মতো বুকের-পাটাওয়ালা লোকের মুখে মানায় না। প্রথম যখন আপনাকে দেখেছিলুম, তখন দেখেছি আপনি রস খুঁজে বেড়ান নি, পথ খুঁড়ে বেরিয়েছিলেন কড়া মাটি ভেঙে। দেখেছি আপনার নিরাসক্ত পৌরুষের মূর্তি— সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আপনাকে প্রণাম করেছি। আজ আপনি কথার পুতুল দিয়ে নিজেকে ভোলাতে বসেছেন। এ দশা ঘটালে কে। স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করি, এর কারণ কি আমি।"

আমি বললুম, "তা হতে পারে। কিন্তু আপনি তো সাধারণ মেয়ে নন। পুরুষকে আপনি শক্তি দেবেন।"

"হাঁ, শক্তি দেব, যদি নিজেকেই মোহ জড়িয়ে না ধরে। আভাসে বুঝেছি আপনি আমার ইতিহাস কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন। আপনার কাছে কিছু ঢাকবার দরকার নেই। আপনি শুনেছেন আমি ভবতোষকে ভালোবেসেছিলুম।"

"হাঁ শুনেছি।"

"এও জানেন আমার ভালোবাসার অপমান ঘটেছে।"

"হাঁ জানি।"

"সেই অপমানিত ভালোবাসা অনেকদিন ধরে আমাকে আঁকড়ে ধরে দুর্বল করেছে। আমি জেদ করে বসেছিলুম তারই একনিষ্ঠ স্মৃতিকে জীবনের পূজামন্দিরে বসাব। চিরদিন একমনে সেই নিষ্ফল সাধনা করব মেয়েরা যাকে বলে সতীত্ব। নিজের ভালোবাসার অহংকারে সংসারকে ঠেলে ফেলে নির্জনে চলে এসেছি। কর্তব্যকে অবজ্ঞা করেছি নিজের দুঃখকে সম্মান করব ব'লে। আমার দাদুকে অনায়াসে সরিয়ে এনেছি তাঁর কাজের ক্ষেত্র থেকে— যেন এই মেয়েটার হৃদয়ের অহমিকা পৃথিবীর সবকিছুর উপরে। মোহ, মোহ, অন্ধ মোহ।"

খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সে বলে উঠল, "জানেন, আপনিই সেই মোহ ভাঙিয়ে দিয়েছেন।"

বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সে বললে, "আপনিই এই আত্মাবমাননা থেকে ছিনিয়ে এনে আমাকে বাঁচালেন।"

স্তব্ধ রইলুম নিরুত্তর প্রশ্ন নিয়ে।

"আপনি তখনও আমাকে দেখেন নি। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখেছি আপনার

দুঃসাধ্য প্রয়াসের দিনগুলি— সঙ্গ নেই, আরাম নেই, ক্লান্তি নেই, একটু কোথাও ছিদ্র নেই অধ্যবসায়ে। দেখেছি আপনার প্রশস্ত ললাট, আপনার চাপা ঠোঁটে অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তির লক্ষণ, আর দেখেছি মানুষকে কী রকম অনায়াসে প্রভুত্বের জোরে চালনা করেন। দাদুর কাছে আমি মানুষ, আমি পুরুষের ভক্ত, যে পুরুষ সত্য যে পুরুষ তপস্বী। সেই পুরুষকেই দেখবার জন্যে আমার ভক্তিপিপাসু নারী ভিতরে ভিতরে অপেক্ষা করে ছিল নিজের অগোচরে। মাঝখানে এসেছিল অপদেবতা প্রবৃত্তির টানে। অবশেষে নিষ্কাম পুরুষের সুদৃঢ় শক্তিরূপ আপনিই আনলেন আমার চোখের সামনে।"

আমি জিগ্‌গেসা করলুম, "তার পর কি ভাবের পরিবর্তন হয়েছে।"

"হাঁ হয়েছে। আপনার বেদি থেকে নেমে এসেছেন প্রতিদিন। স্থানীয় কাগজে পড়লুম, দূরে অন্য-এক জায়গায় সন্ধানের কাজে আপনার ডাক পড়েছে। আপনি নড়লেন না, ভিতরে ভিতরে আত্মগ্লানি ভোগ করলেন। আপনার পথের সামনেকার ঢেলাখানার মতো আমাকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না কেন। কেন নিষ্ঠুর হতে পারলেন না। যদি পারতেন তবে আমি ধন্য হতুম। আমার ব্রতের পারণা হত আমার কান্না দিয়ে।"

মৃদুস্বরে বললুম, "যাবার জন্যেই কাগজপত্তর গুছিয়ে নিচ্ছিলুম।"

"না, না, কখনোই না। মিথ্যে ছুতো করে নিজেকে ভোলাচ্ছিলেন। যতই দেখলুম আপনার দুর্বলতা, ভয় হতে লাগল আমার নিজেকে নিয়ে। ছি, ছি, কী পরাভবের বিষ এনেছি নারীর জীবনে, কেবল অন্যের জন্যে নয়, নিজের জন্যেও। ক্রমশই একটা চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসল, সে যেন এই বনের বিষনিশ্বাস থেকে। একদিন এখান-কার পিশাচী রাত্রি এমন আমাকে আবিষ্ট করে ধরেছিল যে মনে হল যে এত বড়ো প্রবৃত্তি রাক্ষসীও আছে যে আমার দাদুর কাছ থেকেও আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তখনই সেই রাত্রেই ছুটে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করে এসেছি।"

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিল, "দাদু।"

অধ্যাপক গাছতলায় বসে পড়ছিলেন। উঠে এসে স্নেহের স্বরে বললেন, "কী দিদি? দূর থেকে বসে বসে ভাবছিলুম, তোমার উপরে আজ বাণী ভর দিয়েছেন— জ্বল্ জ্বল্ করছে তোমার চোখ দুটি।"

"আমার কথা থাক্, তুমি শোনো। তুমি সেদিন বলেছিলে মানুষের চরম অভিব্যক্তি তপস্যার মধ্য দিয়ে।"

"হাঁ, আমি তাই তো বলি। বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার মধ্য দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা আছে সামনে, স্থূল আবরণ যুগে যুগে ত্যাগ করতে করতে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু দেবতা ছিলেন না অতীতে, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে। মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

অচিরা বললে, "দাদু, এইবার এসো, তোমার-আমার কথাটা আপসে চুকিয়ে দিই, কদিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।"

আমি উঠে পড়লুম, বললুম, "তা হলে যাই।"

"না, আপনি বসুন।— দাদু, সেই যে কলেজের অধ্যক্ষপদটা তোমার ছিল, সেটা খালি হয়েছে। তোমাকে ডাক দিয়েছে ওরা।"

অধ্যাপক আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কী করে জানলে ভাই।"

"তোমার কাছে চিঠি এসেছে, সে আমি চুরি করেছি।"

"চুরি করেছ!"

"করব না! আমাকে সব চিঠিই দেখাও কেবল কলেজের ছাপ-মারা ঐ চিঠিটাই দেখালে না। তোমার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে চুরি করে দেখতে হল।"

অধ্যাপক অপরাধীর মতো ব্যস্ত হয়ে বললেন,, "আমারই অন্যায় হয়েছে।"

"কিছু অন্যায় হয় নি। আমাকে লুকোতে চেয়েছিলে যে আমার জীবনের অভি-সম্পাত এখনও তুমি নিজের উপর টেনে নিয়ে চলবে। তোমার আপন আসন থেকে আমি যে নামিয়ে এনেচি তোমাকে। আমাদের তো ঐ কাজ।"

"কী বলছ দিদি।"

"সত্যি কথাই বলছি। তুমি শিক্ষাদানযজ্ঞের হোতা, এখানে এনে আমি তোমাকে করেছি শুধু গ্রন্থকীট। বিশ্বসৃষ্টি বাদ দিলে কী দশা হয় বিশ্বকর্তার। ছাত্র না থাকলে তোমার হয় ঠিক তেমনি। সত্যি কথা বলো।"

"বরাবর ইস্কুলমাস্টারি করে এসেছি কিনা।"

"তুমি আবার ইস্কুলমাস্টার! কী যে বল তুমি! তুমি যে স্বভাবতই আচার্য। দেখেন নি, নবীনবাবু, ওঁর মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে কি, আর দয়ামায়া থাকে না। অমনি আমাকে নিয়ে পড়েন— বারো আনাই বুঝতেই পারি নে। নইলে হাতড়িয়ে বের করেন এই নবীনবাবুকে, সে হয় আরও শোচনীয়। দাদু, ছাত্র তোমার নিতান্তই চাই জানি, কিন্তু বাছাই করে নিয়ো, রূপকথার রাজা সকালে ঘুম থেকে উঠেই যার মুখ দেখত তাকেই কন্যা দান করত। তোমার বিদ্যাদান অনেকটা সেই রকম।"

"না দিদি, আমাকে বাছাই করে নেয় যারা তারাই সাহায্য পায় আমার। এখনকার দিনে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করে, আগেকার দিনে সন্ধান করে শিক্ষক লাভ করত শিক্ষার্থী।"

"আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখনকার সিদ্ধান্ত এই যে, তোমাকে তোমার সেই কাজটা ফিরিয়ে নিতে হবে।"

অধ্যাপক হতবুদ্ধির মতো নাতনির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অচিরা বললে, "তুমি ভাবছ, আমার গতি কী হবে। আমার গতি তুমি। আর আমাকে ছাড়লে তোমার কী গতি জানই তো। এখন যে তোমার পনেরোই আশ্বিনে পনেরোই অক্টোবরে এক হয়ে যায়, নিজের নূতন ছাতার সঙ্গে পরের পুরোনো ছাতার স্বত্বাধিকারে ভেদজ্ঞান থাকে না, গাড়ি চড়ে ড্রাইভারকে এমন ঠিকানা বাতলিয়ে দাও সেই ঠিকানায় আজ পর্যন্ত কোনো বাড়ি তৈরি হয় নি, আর চাকরের ঘুম ভাঙবার ভয়ে সাবধানে পা টিপে টিপে কলতলায় নিজে গিয়ে কুঁজোয় জল ভরে নিয়ে আস।"

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কী তুমি বল, নবীন।"

কী জানি ওঁর হয়তো মনে হয়েছিল ওঁদের এই পারিবারিক প্রস্তাবে আমার ভোটেরও একটা মূল্য আছে।

আমি খানিক ক্ষণ চুপ করে রইলুম, তার পরে বললুম, "অচিরা দেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।"

অচিরা তখনই উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। বোধ হল যেন চোখ থেকে জল পড়ল আমার পায়ে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হটে গেলুম।

অচিরা বললে, সংকোচ করবেন না। আপনার তুলনায় আমি কিছুই নই সে কথা নিশ্চয় জানবেন। এই কিন্তু শেষ বিদায়, যাবার আগে আর দেখা হবে না।"

অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে বললেন, "সে কী কথা, দিদি।"

অচিরা বাষ্পগদগদ কণ্ঠ সামলিয়ে হেসে বললে, "দাদু, তুমি অনেক-কিছু জান, কিন্তু আরও-কিছু সম্বন্ধে আমার বুদ্ধি তোমার চেয়ে অনেক বেশি, এ কথাটা মেনে নিয়ো।"

এই বলে চলতে উদ্যত হল। আবার ফিরে এসে বললে, "আমাকে ভুল বুঝবেন না— আজ আমার তীব্র আনন্দ হচ্ছে যে আপনাকে মুক্তি দিলুম— তার থেকে আমারও মুক্তি। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে— লুকোব না, জল আরও পড়বে। নারীর চোখের জল তাঁরই সম্মানে যিনি সব বন্ধন কাটিয়ে জয়যাত্রায় বেরিয়েছেন।"

দ্রুতপদে অচিরা চলে গেল।

আমি পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলুম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, "আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার সামনে কীর্তির পথ প্রশস্ত।"

ছোটো গল্প ফুরল। পরেকার কথাটা খনি-খোঁড়ার ব্যাপার নিয়ে। তারও পরে আরও বাকি আছে— সে ইতিহাস নিরতিশয় একলার অভিযান, জনতার মাঝখান দিয়ে দুর্গম পথে রুদ্ধ দুর্গের দ্বার-অভিমুখে।

বাড়ি ফিরে গিয়ে যত আমার প্ল্যান আর নোট আর রেকর্ড উলটে পালটে নাড়া-চাড়া করলুম। দেখলুম, সামনে দিগন্তবিস্তৃত কাজের ক্ষেত্র, তাতেই আমার বৃহৎ ছুটি।

সন্ধেবেলায় বারান্দায় এসে বসলুম। খাঁচা ভেঙে গেছে। পাখির পায়ে আটকে রইল ছিন্ন শিকল। সেটা নড়তে চড়তে পায়ে বাজবে।

৪।১০।৩৯

প্রবন্ধ

বিশ্বপরিচয়

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু

প্রীতিভাজনেষু

এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকারপ্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হল না। কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমতো নিড়ানি চালিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হল। যাই হোক আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।

শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথমপরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি। কিন্তু এর জবাবদিহি একা কেবল সাহিত্যের কাছেই নয়, বিজ্ঞানের কাছেও বটে। তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করবার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না। অল্প সাধ্যসত্ত্বেও যথাসম্ভব সতর্ক হয়েছি। বস্তুত আমি কর্তব্যবোধে লিখেছি কিন্তু কর্তব্য কেবল ছাত্রের প্রতি নয় আমার নিজের প্রতিও। এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার নিজেকেও শিক্ষা দিয়ে চলতে হয়েছে। এই ছাত্রমনোভাবের সাধনা হয়তো ছাত্রদের শিক্ষাসাধনার পক্ষে উপযোগী হতেও পারে।

আমার কৈফিয়তটা তোমার কাছে একটু বড়ো করেই বলতে হচ্ছে, তা হলেই এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার মনস্তত্ত্ব তোমার কাছে স্পষ্ট হতে পারবে।

বিশ্বজগৎ আপন অতিছোটোকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অতিবড়োকে ছোটো করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মানুষের সহজ শক্তির কাঠামোর

মধ্যে ধরতে পারে নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মানুষ আর যাই হোক সহজ মানুষ নয়। মানুষ একমাত্র জীব যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানাতে পারলেই খুশি হয়েছে। মানুষ সহজশক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ ক'রে বিশ্বব্যাপারের মূলরহস্য কেবলই অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে তার সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হল তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্তদেশে একঘরে হয়ে রইল।

বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।

আমাদের মতো আনাড়ি এই অভাব অল্পমাত্র দূর করবার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হলে তারাই সব চেয়ে কৌতুক বোধ করবে যারা আমারই মতো আনাড়ির দলে। কিন্তু আমার তরফে সামান্য কিছু বলবার আছে। শিশুর প্রতি মায়ের ঔৎসুক্য আছে কিন্তু ডাক্তারের মতো তার বিদ্যা নেই। বিদ্যাটি সে ধার করে নিতে পারে কিন্তু ঔৎসুক্য ধার করা চলে না। এই ঔৎসুক্য শুশ্রূষায় যে-রস জোগায় সেটা অবহেলা করবার জিনিস নয়।

আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয়-দশ বছর; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত [ঘোষ] মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতিসাধারণ দুই-একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন

আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত। মনে আছে আগুনে বসালে তলার জল গরমে হালকা হয়ে উপরে ওঠে আর উপরের ঠাণ্ডা ভারী জল নিচে নামতে থাকে, জল গরম হওয়ার এই কারণটা যখন তিনি কাঠের গুঁড়োর যোগে স্পষ্ট করে দিলেন, তখন অনবচ্ছিন্ন জলে একই কালে যে উপরে নিচে নিরন্তর ভেদ ঘটতে পারে তারই বিস্ময়ের স্মৃতি আজও মনে আছে। যে-ঘটনাকে স্বতই সহজ ব'লে বিনা চিন্তায় ধরে নিয়েছিলুম সেটা সহজ নয় এই কথাটা বোধ হয় সেই প্রথম আমার মনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তার পরে বয়স তখন হয়তো বারো হবে (কেউ কেউ যেমন রঙ-কানা থাকে আমি তেমনি তারিখ-কানা এই কথাটি বলে রাখা ভালো) পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে ক'রে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।

তার পরে বয়স আরও বেড়ে উঠল। ইংরেজি ভাষা অনেকখানি আন্দাজে বোঝবার মতো বুদ্ধি তখন আমার খুলেছে। সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়ি নি। মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছ্র তার উপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি। তার থেকে একটা এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয় আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না এ কথাও বলা চলে না। জলস্থল-বিভাগের মতোই আমরা যা বুঝি তার চেয়ে না বুঝি অনেক বেশি, তবুও চলে যাচ্ছে এবং আনন্দ পাচ্ছি। কতক পরিমাণে না-বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে

ঠেলে দেয়। যখন ক্লাসে পড়াতুম এই কথাটা আমার মনে ছিল। আমি অনেক সময়েই বড়োবয়সের পাঠ্যসাহিত্য ছেলেবয়সের ছাত্রদের কাছে ধরেছি। কতটা বুঝেছে তার সম্পূর্ণ হিসাব নিই নি, হিসাবের বাইরেও তারা এক রকম ক'রে অনেকখানি বোঝে যা মোটে অপথ্য নয়। এই বোধটা পরীক্ষকের পেনসিলমার্কার অধিকারগম্য নয় কিন্তু এর যথেষ্ট মূল্য আছে। অন্তত আমার জীবনে এইরকম পড়ে-পাওয়া জিনিস বাদ দিলে অনেকখানিই বাদ পড়বে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয় নি। স্যার রবর্ট বল-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্ব্‌স্‌, ফ্লামরিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি— গলাধঃকরণ করেছি শাঁসসুদ্ধ বীজসুদ্ধ। তার পরে এক সময়ে সাহস ক'রে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করি নে।

আজ বয়সের শেষপর্বে মন অভিভূত নব্যপ্রাকৃততত্ত্বে— বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। তখন যা পড়েছিলুম তার সব বুঝি নি। কিন্তু পড়ে চলেছিলুম। আজও যা পড়ি তার সবটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব, অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেও তাই।

বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী।— মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মতো কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে যথালাভ। এই বইখানা সেই যথালাভের ঝুলি, মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে এর সংগ্রহ।

পাণ্ডিত্য বেশি নেই সুতরাং সেটাকে বেমালুম ক'রে রাখতে বেশি চেষ্টা পেতে হয় নি। চেষ্টা করেছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত-ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।

এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে— এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে একে হাল্‌কা করা কর্তব্য বোধ করি নি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে, যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে-বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। নিজের যে-শিক্ষার চেষ্টা বাল্যকালে নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলুম তার থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা। এক বয়সে দুধ যখন ভালোবাসতুম না, তখন গুরুজনদের ফাঁকি দেবার জন্যে দুধটাকে প্রায় আগাগোড়া ফেনিয়ে বাটি ভরতি করার চক্রান্ত করেছি। ছেলেদের পড়বার বই যাঁরা লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে ফেনার জোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান, জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর-একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়, এ বই লেখবার সময়ে সে কথাটা সাধ্যমতো ভুলি নি।

শ্রীমান প্রমথনাথ সেনগুপ্ত এম. এসসি. তোমারই ভূতপূর্ব ছাত্র। তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-অধ্যাপক। বইখানি লেখবার ভার প্রথমে তাঁর উপরেই দিয়েছিলেম। ক্রমশ সরে সরে ভারটা অনেকটা আমার উপরেই এসে পড়ল। তিনি না শুরু করলে আমি সমাধা করতে পারতুম

না, তা ছাড়া অনভ্যস্ত পথে শেষ পর্যন্ত অব্যবসায়ীর সাহসে কুলোত না। তাঁর কাছ থেকে ভরসাও পেয়েছি সাহায্যও পেয়েছি।

আলমোড়ায় নিভৃতে এসে লেখাটাকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। মস্ত সুযোগ হল আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু বশী সেনকে পেয়ে। তিনি যত্ন করে এই রচনার সমস্তটা পড়েছেন। পড়ে খুশী হয়েছেন এইটেতেই আমার সব চেয়ে লাভ।

আমার অসুখ অবস্থায় স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় যত্ন করে প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে বইখানি প্রকাশের কাজে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন; এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

শান্তিনিকেতন
২ আশ্বিন ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয়

পরমাণুলোক

আমাদের সজীব দেহ কতকগুলি বোধের শক্তি নিয়ে জন্মেছে, যেমন দেখার বোধ, শোনার বোধ, ঘ্রাণের বোধ, স্বাদের বোধ, স্পর্শের বোধ। এইগুলিকে বলি অনুভূতি। এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভালোমন্দ-লাগা, আমাদের সুখদুঃখ।

আমাদের এইসব অনুভূতির সীমানা বেশি বড়ো নয়। আমরা কতদূরই বা দেখতে পাই, কতটুকু শব্দই বা শুনি। অন্যান্য বোধগুলিরও দৌড় বেশি নয়। তার মানে আমরা যেটুকু বোধশক্তির সম্বল নিয়ে এসেছি সে কেবল এই পৃথিবীতেই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে চলার হিসাবমতো। আরও কিছু বাড়তি হাতে থাকে। তাতেই আমরা পশুর কোঠা পেরিয়ে মানুষের কোঠায় পৌঁছতে পারি।

যে নক্ষত্র থেকে এই পৃথিবীর জন্ম, যার জ্যোতি এর প্রাণকে পালন করছে সে হচ্ছে সূর্য। এই সূর্য আমাদের চার দিকে আলোর পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীকে ছাড়িয়ে জগতে আর যে কিছু আছে তা দেখতে দিচ্ছে না। কিন্তু দিন শেষ হয়, সূর্য অস্ত যায়, আলোর ঢাকা যায় সরে; তখন অন্ধকার ছেয়ে বেরিয়ে পড়ে অসংখ্য নক্ষত্র। বুঝতে পারি জগৎটার সীমানা পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু কতটা যে দূরে তা কেবল অনুভূতিতে ধরতে পারি নে।

সেই দূরত্বের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগ চোখের দেখা দিয়ে। সেখান থেকে শব্দ আসে না, কেননা শব্দের বোধ হাওয়ার থেকে। এই হাওয়া চাদরের মতোই পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে। এই হাওয়া পৃথিবীর মধ্যেই শব্দ জাগায়, এবং শব্দের ঢেউ চালাচালি করে। পৃথিবীর বাইরে ঘ্রাণ আর স্বাদের কোনো অর্থই নেই। আমাদের স্পর্শবোধের সঙ্গে আমাদের আর-একটা বোধ আছে, ঠাণ্ডা-গরমের বোধ। পৃথিবীর বাইরের সঙ্গে আমাদের এই বোধটার অন্তত এক জায়গায় খুবই যোগ আছে। সূর্যের থেকে রোদ্দুর আসে, রোদ্দুর থেকে পাই গরম। সেই গরমে আমাদের প্রাণ। সূর্যের চেয়ে লক্ষগুণ গরম নক্ষত্র আছে। তার তাপ আমাদের বোধে পৌঁছয় না। কিন্তু সূর্যকে তো আমাদের পর বলা যায় না। অন্য যেসব অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সূর্য তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে আমাদের আত্মীয়। তবু মানতে হবে,

সূর্য পৃথিবীর থেকে আছে দূরে। কম দূরে নয়, প্রায় ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল তার দূরত্ব। শুনে চমকে উঠলে চলবে না। যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা আছি এখানে ঐ দূরত্বটা নক্ষত্রলোকের সকলের চেয়ে নিচের ক্লাসের। কোনো নক্ষত্রই ওর চেয়ে পৃথিবীর কাছে নেই।

এইসব দূরের কথা শুনে আমাদের মনে চমক লাগে তার কারণ জলে মাটিতে তৈরি এই পিণ্ডটি, এই পৃথিবী, অতি ছোটো। পৃথিবীর দীর্ঘতম লাইনটি অর্থাৎ তার বিষুবরেখার কটিবেষ্টন ঘুরে আসবার পথ প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল মাত্র। বিশ্বের পরিচয় যতই এগোবে ততই দেখতে পাবে জগতের বৃহত্ব বা দূরত্বের ফর্দে এই পঁচিশ হাজার সংখ্যাটা অত্যন্ত নগণ্য। পূর্বেই বলেছি আমাদের বোধশক্তির সীমা অতি ছোটো। সর্বদা যেটুকু দূরত্ব নিয়ে আমাদের কারবার করতে হয় তা কতটুকুই বা। ঐ সামান্য দূরত্বটুকুর মধ্যেই আমাদের দেখার আমাদের চলাফেরার বরাদ্দ নির্দিষ্ট।

কিন্তু পর্দা যখন উঠে গেল, তখন আমাদের অনুভূতির সামান্য সীমানার মধ্যেই বৃহৎ বিশ্ব নিজেকে নিতান্ত ছোটো ক'রে একটুখানি আভাসে জানান দিলে, তা না হলে জানা হতই না, কেননা বড়ো দেখার চোখ আমাদের নয়। অন্য জীবজন্তুরা এইটুকু দেখাই মেনে নিলে। যতটুকু তাদের অনুভূতিতে ধরা দিল ততটুকুতেই তারা সন্তুষ্ট হল। মানুষ হল না। ইন্দ্রিয়বোধে জিনিসটার একটু ইশারা মাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির দৌড় তার বোধের চেয়ে আরও অনেক বেশি, জগতের সকল দৌড়ের সঙ্গেই সে পাল্লা দেবার স্পর্ধা রাখে। সে এই প্রকাণ্ড জগতের প্রকাণ্ড মাপের খবর জানতে বেরল, অনুভূতির ছেলেভুলোনো গুজব দিলে বাতিল করে। ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলকে আমরা কোনোমতেই অনুভব করতে পারি নে, কিন্তু বুদ্ধি হার মানলে না, হিসেব কষতে বসল।

বাইরের বিশ্বলোকটার কথা থাক্, আমরা যে পৃথিবীতে আছি, তার চেয়ে কাছে তো আর কিছুই নেই, তবু এর সমস্তটাকে এক ক'রে দেখা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু একটি ছোটো গ্লোবে যদি তার ম্যাপ আঁকা দেখি, তা হলে পৃথিবীর সমগ্রটাকে জানার একটুখানি গোড়াপত্তন হয়। আয়তন হিসাবে গ্লোবটি পৃথিবীর অনেক-হাজার ভাগের একভাগমাত্র। আমাদের অন্যসব বোধ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দৃষ্টিবোধের আঁচড়কাটা পরিচয় এতে আছে। বিস্তারিত বিবরণ হিসাবে, এ একেবারে ফাঁকা। বেশি দেখবার শক্তি আমাদের নেই বলেই ছোটো করেই দেখাতে হল।

প্রতিরাত্রে বিশ্বকে এই যে ছোটো করেই দেখানো হয়েছে সেও আমাদের মাথার উপরকার আকাশের গ্লোবে। দৃষ্টিবোধ ছাড়া অন্য কোনো বোধ এর মধ্যে জায়গা

পায় না। যা চিন্তা করতে মন অভিভূত হয়ে যায় এত বড়ো জিনিসকে দিকসীমানায় বদ্ধ এই আকাশটুকুর মধ্যে আমাদের কাছে ধরা হল।

কতই ছোটো করে ধরা হয়েছে তার একটুখানি আন্দাজ পেতে হলে সূর্যের দৃষ্টান্ত মনে আনতে হবে। স্বভাবতই আমরা যতকিছু বড়ো জিনিসকে জানি বা মনে আনতে পারি তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো এই পৃথিবী। এ-কে আমরা অংশ অংশ করেই দেখতে পারি। একসঙ্গে সবটার প্রকৃত ধারণা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব। অথচ সূর্য এই পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড়ো। এতবড়ো সূর্য আকাশের একটা ধারে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে একটি সোনার থালার মতো। সূর্যের ভিতরকার সমস্ত তুমুল তোলপাড়ের যখন খবর পাই আর তার পরে যখন দেখি ভোরবেলায় আমাদের আমবাগানের পিছন থেকে সোনার গোলকটি ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে, জীবজন্তু গাছপালা আনন্দিত হয়ে উঠছে, তখন মনে ভাবি আমাদের কীরকম ভুলিয়ে রাখা হয়েছে ; আমাদের বলে দিয়েছে তোমাদের জীবনের কাজে এর বেশি জানবার কোনো দরকার নেই। না ভোলালেই বা বাঁচতুম কী করে। ঐ সূর্য আপন বিরাট স্বরূপে যা, সে যদি আমাদের অনুভূতির অল্পমাত্রও কাছে আসত তা হলে তো আমরা মুহূর্তেই লোপ পেয়ে যেতুম। এই তো গেল সূর্য। এই সূর্যের চেয়ে আরও অনেক গুণ বড়ো আছে আরও অনেক অনেক নক্ষত্র। তাদের দেখছি কতকগুলি আলোর ফুটকির মতো। যে-দূরত্বের মধ্যে এইসব নক্ষত্র ছড়ানো, ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না। বিশ্বজগতের বাসা যে আকাশটাতে সেটা যে কত বড়ো সেকথা আর-একদিক থেকে ভেবে দেখা যেতে পারে। আমাদের তাপবোধে পৃথিবীর বাইরে থেকে একটা খুব বড়ো খবর খুব জোরের সঙ্গে এসে পৌঁচচ্ছে, সে হচ্ছে রৌদ্রের উত্তাপ। এ খবরটা ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের। কিন্তু ঐ তো আকাশে আকাশে আছে বহুকোটি নক্ষত্র, তাদের মধ্যে কোনো-কোনোটি সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি উত্তপ্ত। কিন্তু আমাদের ভাগ্যগুণে তাদের সম্মিলিত গরম পথেই এতটা মারা গেল যে বিশ্বজোড়া অগ্নিকাণ্ডে আমাদের আকাশটা দুঃসহ হল না। কত দূরের এই পথ, কত প্রকাণ্ড এই আকাশ। তাপের অনুভূতিকে স্পর্শ-করা ন'কোটি মাইল তার কাছে তুচ্ছ। বড়ো যজ্ঞের রান্নাঘরে যে চুলি জ্বলছে তার কাছে বসা আরামের নয়, কিন্তু বেলা দশটার কাছাকাছি শহরের সমস্ত রান্নাঘরে যে আগুন জ্বলে বড়ো আকাশে তা ছড়িয়ে যায় বলেই শহরে বাস করতে পারি। নক্ষত্রলোকের ব্যাপারটাও সেইরকম। সেখানকার আগুনের ঘটা যতই প্রচণ্ড হোক, তার চার দিকের আকাশটা আরও অনেক প্রকাণ্ড।

এই বিরাট দূরত্ব থেকে নক্ষত্রদের অস্তিত্বের খবর এনে দিচ্ছে কিসে। সহজ উত্তর হচ্ছে আলো। কিন্তু আলো যে চুপচাপ বসে খবর আউড়িয়ে যায় না, আলো যে ডাকের পেয়াদার মতো খবর পিঠে করে নিয়ে দৌড়ে চলে, বিজ্ঞানের এই একটা মস্ত আবিষ্কার। চলা বলতে সামান্য চলা নয়, এমন চলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোনো দূতেরই নেই। আমরা ছোটো পৃথিবীর মানুষ, তাই এতকাল জগতের সব চেয়ে বড়ো চলার কথাটা জানবার সুযোগ পাই নি। একদিন বিজ্ঞানীদের অত্যাশ্চর্য হিসাবের কলে ধরা পড়ে গেল, আলো চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। এমন একটা বেগ যা অঙ্কে লেখা যায়, মনে আনা যায় না। বুদ্ধিতে যার পরীক্ষা হয়, অনুভবে হয় না। আলোর এই চলনের দৌড় অনুভবে বুঝব, এই পৃথিবীটুকুতে এত বড়ো জায়গা পাব কোথায়। এইটুকুর মধ্যে ওর চলাকে আমরা না-চলার মতোই দেখে আসছি। পরখ করবার মতো স্থান পাওয়া যায় মহাশূন্যে। সূর্য আছে সেই মহাশূন্যের যে দূরত্বমাত্রা নিয়ে, সে যত কোটি মাইল হোক জ্যোতিষ্কলোকের দূরত্বের মাপকাঠিতে খুব বেশি নয়।

সুতরাং এইটুকু দূরত্বের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপে মানুষ আলোর দৌড় দেখতে পেল। খবর মিলল যে, এই শূন্য পেরিয়ে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসে প্রায় সাড়ে আট মিনিটে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টির পাল্লায় সূর্য যখন উপস্থিত, আসলে তার আগেই সে এসেছে। এই আগমনের খবরটি জানাতে আলো-নকিবের মিনিট আষ্টেক দেরি হল। এইটুকু দেরিতে বিশেষকিছু আসে যায় না। প্রায় তাজা খবরই পাওয়া গেছে। কিন্তু সৌরজগতের সব চেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র, অর্থাৎ নক্ষত্রমহলে যাকে আমাদের পাড়াপড়শি বললে চলে, যখন সে জানান দিল 'এই যে আছি' তখন তার সেই বার্তা বয়ে আনতে আলোর সময় লাগছে চার বছরের কাছাকাছি। অর্থাৎ এইমাত্র যে খবর পাওয়া গেল সেটা চার বছরের বাসি। এইখানে দাঁড়ি টানলেই যথেষ্ট হত, কিন্তু আরও দূরের নক্ষত্র আছে যেখান থেকে আলো আসতে বহু লক্ষ বছর লাগে।

আকাশে আলোর এই চলাচলের খবর বেয়ে বিজ্ঞানে একটা প্রশ্ন উঠল, তার চলার ভঙ্গীটা কী রকম। সেও এক আশ্চর্য কথা। উত্তর পাওয়া গেছে তার চলা অতি সূক্ষ্ম ঢেউয়ের মতো। কিসের ঢেউ সেকথা ভেবে পাওয়া যায় না; কেবল আলোর ব্যবহার থেকে এটা মোটামুটি জানা গেছে ওটা ঢেউ বটে। কিন্তু মানুষের মনকে হয়রান করবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই একটা জুড়িখবর তার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে হাজির হল, জানিয়ে দিলে আলো অসংখ্য জ্যোতিষ্কণা নিয়ে; অতি ছিটেগুলির মতো

ক্রমাগত তার বর্ষণ। এই দুটো উলটো খবরের মিলন হল কোন্‌খানে তা ভেবে পাওয়া যায় না। এর চেয়েও আশ্চর্য একটা পরস্পর উলটো কথা আছে, সে হচ্ছে এই যে বাইরে যেটা ঘটছে সেটা একটা-কিছু ঢেউ আর বর্ষণ, আর ভিতরে আমরা যা পাচ্ছি তা, না এটা, না ওটা, তাকে আমরা বলি আলো ;—এর মানে কী, কোনো পণ্ডিতই তা বলতে পারলেন না।

যা ভেবে ওঠা যায় না, যা দেখাশোনার বাইরে, তার এত সূক্ষ্ম এবং এত প্রকাণ্ড খবর পাওয়া গেল কী করে, এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে। নিশ্চিত প্রমাণ আছে, আপাতত এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যাঁরা প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন অসাধারণ তাঁদের জ্ঞানের তপস্যা, অত্যন্ত দুর্গম তাঁদের সন্ধানের পথ। তাঁদের কথা যাচাই করে নিতে যে বিদ্যাবুদ্ধির দরকার, তাও আমাদের অনেকের নেই। অল্প বিদ্যা নিয়ে অবিশ্বাস করতে গেলে ঠকতে হবে। প্রমাণের রাস্তা খোলাই আছে। সেই রাস্তায় চলবার সাধনা যদি কর, শক্তি যদি হয়, তবে একদিন এসব বিষয় নিয়ে সওয়ালজবাব সহজেই হতে পারবে।

আপাতত আলোর ঢেউয়ের কথাই বুঝে নেওয়া যাক। এই ঢেউ একটিমাত্র ঢেউয়ের ধারা নয়। এর সঙ্গে অনেক ঢেউ দল বেঁধেছে। কতকগুলি চোখে পড়ে, অনেকগুলি পড়ে না। এইখানে বলে রাখা ভালো, যে আলো চোখে পড়ে না, চলতি ভাষায় তাকে আলো বলে না। কিন্তু দৃশ্যই হোক অদৃশ্যই হোক একটা-কোনো শক্তির এই ধরনের ঢেউখেলিয়ে চলাই যখন উভয়েরই স্বভাব তখন বিশ্বতত্ত্বের বইয়ে ওদের পৃথক নাম অসংগত। বড়োভাই নামজাদা, ছোটোভাইকে কেউ জানে না, তবু বংশগত ঐক্য ধরে উভয়েরই থাকে একই উপাধি, এও তেমনি।

আলোর ঢেউয়ের আপন দলের আরও একটি ঢেউ আছে, সেটা চোখে দেখি নে, স্পর্শে বুঝি। সেটা তাপের ঢেউ। সৃষ্টির কাছে তার খুবই প্রতাপ। এমনিতরো আলোর-ঢেউজাতীয় নানা পদার্থের কোনোটা দেখা যায়, কোনোটা স্পর্শে বোঝা যায়; কোনোটাকে স্পষ্ট আলোরূপে জানি আবার সঙ্গে সঙ্গেই তাপরূপেও বুঝি ; কোনোটাকে দেখাও যায় না, স্পর্শেও পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে প্রকাশিত অপ্রকাশিত আলোতরঙ্গের ভিড়কে যদি এক নাম দিতে হয়, তবে তাকে তেজ বলা যেতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির আদি অন্তে মধ্যে প্রকাশ্যে আছে বা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন অবস্থায় এই তেজের কাঁপন। পাথর হোক লোহা হোক বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তাদের মধ্যে কোনো নড়াচড়া নেই। তারা যেন স্থিরত্বের আদর্শস্থল। কিন্তু এ কথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে তাদের অণু পরমাণু, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, যাদের দেখতে পাই নে অথচ

যাদের মিলিয়ে নিয়ে এরা আগাগোড়া তৈরি, তারা সকল সময়েই ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। ঠাণ্ডা যখন থাকে তখনও কাঁপছে, আর কাঁপুনি যখন আরও চড়ে ওঠে তখন গরম হয়ে বাইরে থেকেই ধরা পড়ে আমাদের বোধশক্তিতে। আগুনে পোড়ালে লোহার পরমাণু কাঁপতে কাঁপতে এত বেশি অস্থির হয়ে ওঠে যে তার উত্তেজনা আর লুকানো থাকে না। তখন কাঁপনের ঢেউ আমাদের শরীরের স্পর্শনাড়ীকে ঘা-মেরে তার মধ্য দিয়ে যে খবরটা চালিয়ে দেয় তাকে বলি গরম। বস্তুত গরমটা আমাদের মারে। আলো মারে চোখে, গরম মারে গায়ে।

ছেলেবেলায় যখন একদিন মাস্টারমশায় দেখিয়ে দিলেন লোহার টুকরো আগুনে তাতিয়ে প্রথমে হয় গরম, তার পরে হয় লাল টক্‌টকে, তার পরে হয় সাদা জ্বল্‌জ্বলে, বেশ মনে আছে তখন আমাকে এই কথা নিয়ে ভাবিয়েছিল যে, আগুন তো কোনো-একটা দ্রব্য নয় যেটা লোহার সঙ্গে বাইরে থেকে মিশিয়ে লোহাকে দিয়ে এমনতরো চেহারা বদল করাতে পারে। তার পরে আজ শুনছি আরও তাপ দিলে এই লোহাটা গ্যাস হয়ে যাবে। এ সমস্তই জাদুকর তাপের কাণ্ড, সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে।

সূর্যের আলো সাদা। এই সাদা রঙে মিলিয়ে আছে সাতটা বিভিন্ন রঙের আলো। যেন সাতরঙের রশ্মির পেখম, গুটিয়ে ফেললে দেখায় সাদা, ছড়িয়ে ফেললে দেখায় সাতরঙা। সেকালে ছিল ঝাড়লণ্ঠন, বিজলিবাতির তাড়ায় তারা হয়েছে দেশছাড়া। এই ঝাড়ের গায়ে ঝুলত তিনপিঠওয়ালা কাঁচের পরকলা। এইরকম তিনপিঠওয়ালা কাঁচের গুণ এই যে, ওর ভিতর দিয়ে রোদ্‌দুর এলে তার থেকে সাত রঙের আলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে। পরে পরে রঙ বিছানো হয়; বেগনি (Violet), অতিনীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow), নারাঙি (Orange) আর লাল (Red)। এই সাতটা রঙ চোখে দেখা যায় কিন্তু এদের দুই প্রান্তের বাইরে তেজের আরও অনেক ছোটো-বড়ো ঢেউ আছে, তারা আমাদের সহজ চেতনায় ধরা দেয় না। সেই জাতের যে ঢেউ বেগনি রঙের পরের পারে তাকে বলে ultra-violet light, সহজ ভাষায় বলা যাক বেগনি-পারের আলো। আর যে আলো লালের এলাকায় এসে পৌঁছয় নি, রয়েছে তার আগের পারে তাকে বলে infra-red light, আমরা বলতে পারি লাল-উজানি আলো। স্যর উইলিয়ম হার্শেল ছিলেন এক মস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনপিঠওয়ালা কাঁচের মধ্য দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন আলোর সাতরঙা ছটা। কালোরঙ-করা তাপ-মাপের নল নিয়ে এক-একটা রঙের কাছে ধরে দেখলেন। লালরঙের দিকে উত্তাপ ধীরে ধীরে বাড়তে

লাগল। লাল পেরিয়ে নলটিকে নিয়ে গেলেন বেগুনি অন্ধকারে, সেখানেও গরম থামতে চায় না। বোঝা গেল আরও আলো আছে ঐ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। তারপর এলেন এক জর্মন রসায়নী। একটা ফোটোগ্রাফির প্লেট নিয়ে পরীক্ষায় লাগলেন। এই প্লেটে লাল থেকে বেগনি পর্যন্ত সাতটা রঙের সাড়া পাওয়া গেল। শেষে বেগনি পেরিয়ে চললেন অন্ধকারে, সেখানে চোখে যা ধরা দেয় না প্লেটে তা ধরা পড়ল। দেখা গেল আলোর উত্তাপটা লালরঙের দিকে, আর রাসায়নিক ক্রিয়া বেগনি পারের দিকে। এক কালে মনে হয়েছিল অ-দেখারা রঙিন দলেরই পার্শ্বচর, অন্ধকারে পড়ে গেছে। যত এগোতে লাগল গুপ্ত আলোর সন্ধান, ততই সাতরঙা দলেরই আসন হল খাটো। বিজ্ঞানের জরীপে আলোর সীমানা আজ সাতরঙ-রাজার দেশ ছাড়িয়ে গেছে শতগুণ। লাল-উজানি আলোর দিকে ক্রমে আজ দেখা দিল যে ঢেউ সেই ঢেউ বেয়ে চলে আকাশবাণী, যাকে বলে রেডিয়োবার্তা ; বেগনি-পারের দিকে প্রকাশ পেল বিখ্যাত র‍্যণ্টগেন আলো, যে-আলোর সাহায্যে দেহের চামড়ার ঢাকা পেরিয়ে ভিতরকার হাড় দেখতে পাওয়া যায়।

আলো জিনিসটাতে কেবল যে নক্ষত্রের অস্তিত্বের খবর দেয় তা নয়, ওদের মধ্যে কোন্ কোন্ পদার্থ মিলিয়ে আছে, মানুষ সে খবরও আলোর যেন বুক চিরে আদায় করে নিয়েছে। কেমন করে আদায় হল বুঝিয়ে বলা যাক।

তিনপিঠওয়ালা কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যের সাদা আলো পার করলে তার সাতটা রঙের পরিচয় পরে পরে বেরিয়ে পড়ে। লোহা প্রভৃতি শক্ত জিনিস যথেষ্ট তেতে জ্বলে উঠলে তার আলো যখন ক্রমে সাদা হয়ে ওঠে তখন এই সাদা আলো ভাগ করলে সাত রঙের ছটা পাশাপাশি দেখা যায়। তাদের মাঝে মাঝে কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু লোহাকে গরম করতে করতে যখন তা গ্যাস হয়ে যায় তখন ঐ কাঁচের ভিতর দিয়ে তার আলো ভাঙলে বর্ণচ্ছটায় একটানা আলো পাই নে। দেখা যায় আলাদা আলাদা উজ্জ্বল রেখা, তাদের মধ্যে মধ্যে থাকে আলোহীন ফাঁকা জায়গা। এই বর্ণালোকচিহ্নপাতের নাম দেওয়া যাক বর্ণলিপি।

এই লিপিতে দেখা গেছে দীপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় প্রত্যেক জিনিসের আলোর বর্ণচ্ছটা স্বতন্ত্র। নুনের মধ্যে সোডিয়ম নামক এক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। তাপ দিয়ে দিয়ে তাকে গ্যাস করে ফেললে বর্ণলিপিতে তার আলোর মধ্যে খুব কাছাকাছি দেখা যায় দুটি হলদে রেখা। আর-কোনো রঙ পাই নে। সোডিয়ম ছাড়া অন্য কোনো জিনিসেরই বর্ণচ্ছটায় ঠিক ঐ জায়গাতেই ঐ দুটি রেখা মেলে না। ঐ দুটি রেখা যেখানকারই গ্যাসের বর্ণলিপিতে দেখা যাবে বুঝব সেখানে সোডিয়ম আছেই।

কিন্তু দেখা যায় সূর্যের আলোর বর্ণচ্ছটায় সোডিয়ম গ্যাসের ঐ দুটি উজ্জ্বল হলদে রেখা চুরি গেছে, তার জায়গায় রয়েছে দুটো কালো দাগ। বিজ্ঞানী বলেন উত্তপ্ত কোনো গ্যাসীয় জিনিসের আলো সেই গ্যাসেরই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্তরের ভিতর দিয়ে আসার সময় সম্পূর্ণ শোষিত হয়। এক্ষেত্রে আলোর অভাবেই যে কালো দাগের সৃষ্টি তা নয়। বস্তুত সূর্যের বর্ণমণ্ডলে যে সোডিয়ম গ্যাস সূর্যের আলো আটক করে সেও আপন উত্তাপ অনুযায়ী আলো ছড়িয়ে দেয়, আলোকমণ্ডলের তুলনায় উত্তাপ কম ব'লে এর আলো হয় অনেকটা ম্লান। এই ম্লান আলো বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল আলোর পাশে কালোর বিভ্রম জন্মায়।

মৌলিক জিনিস মাত্রেরই আলো ভেঙে প্রত্যেকটির বর্ণচ্ছটার ফর্দ তৈরি হয়ে গেছে। এই বর্ণভেদের সঙ্গে তুলনা করলেই বস্তুভেদ ধরা পড়বে তা সে যেখানেই থাক্, কেবল গ্যাসীয় অবস্থায় থাকা চাই।

পৃথিবী থেকে যে বিরেনব্বইটি মৌলিক পদার্থের খবর পাওয়া গেছে সূর্যে তার সবগুলিরই থাকা উচিত, কেননা পৃথিবী সূর্যেরই দেহজাত। প্রথম পরীক্ষায় পাওয়া গিয়েছিল ছত্রিশটি মাত্র জিনিস। বাকিগুলির কী হল সেই প্রশ্নের মীমাংসা করছেন বাঙালী বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। নূতন সন্ধানপথ বের করে সূর্যে আরও কতকগুলি মৌলিক জিনিস তিনি ধরতে পেরেছেন। তাঁর পথ বেয়ে প্রায় সবগুলিরই খবর মিলেছে। আজও যেগুলি গরঠিকানা, মাঝপথেই পৃথিবীর হাওয়া তাদের সংবাদ শুষে নেয়।

সব রঙ মিলে সূর্যের আলো সাদা, তবে কেন নানা জিনিসের নানা রঙ দেখি। তার কারণ সব জিনিস সব রঙ নিজের মধ্যে নেয় না, কোনো-কোনোটাকে বিনা ওজরে বাইরে বিদায় করে দেয়। সেই ফেরত-দেওয়া রঙটাই আমাদের চোখের লাভ। মোটা ব্লটিং যে রসটা শুষে ফেলে সে কারো ভোগে লাগে না, যে রসটা সে নেয় না সেই উদ্‌বৃত্ত রসটাই আমাদের পাওনা। এও তেমনি। চুনি পাথর সূর্যকিরণের আর-সব রকম ঢেউকেই মেনে নেয়, ফিরিয়ে দেয় লাল রঙকে। তার এই ত্যাগের দানেই চুনির খ্যাতি। যা নিজে আত্মসাৎ করেছে তার কোনো খ্যাতি নেই। লাল রঙটাই কেন যে ও নেয় না, আর নীল রঙের 'পরেই নীলা পাথরের কেন সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এ প্রশ্নের জবাব ওদের পরমাণু-মহলে লুকানো রইল। সূর্যের সব ঢেউকেই পাকা-চুল ফিরে পাঠায় তাই সে সাদা, কাঁচা-চুল কোনো ঢেউই ফিরে দেয় না, অর্থাৎ আলোর কোনো অংশই তার কাছ থেকে ছাড়া পায় না, তাই সে কালো। জগতের সব জিনিসই যদি সূর্যের সব রঙই করত আত্মসাৎ তা হলে সেই কৃপণের জগৎটা দেখা দিত কালো হয়ে, অর্থাৎ দেখাই দিত না। যেন খবর বিলোবার সাতটা

পেয়াদাকেই পোস্টমাস্টার বন্ধ করে রাখত। অথচ কোনো আলোই যদি না নিত সবই হত সাদা, তবে সেই একাকারে সব জিনিসেরই প্রভেদ যেত ঘুচে। যেন সাতটা পেয়াদার সব চিঠিই তাল পাকিয়ে একখানা করা হত, কোনো স্বতন্ত্র খবরই পাওয়া যেত না। একই চেহারায় সবাইকে দেখাকে দেখা বলে না। না-আলো আর পূর্ণ-আলো কোনোটাতেই আমাদের দেখা চলে না, আমরা দেখি ভাঙা আলোর মেলামেশায়।

সূর্যকিরণের সঙ্গে জড়ানো এমন অনেক ঢেউ আছে, যারা অতি অল্প পরিমাণে আসে ব'লে অনুভব করতে পারি নে। এমন ঢেউও আছে যারা প্রচুর পরিমাণেই নেমে আসে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তাদের আটক করে। নইলে জ্বলে পুড়ে মরতে হত। সূর্যের যে পরিমাণ দান আমরা সইতে পারি প্রথম থেকেই তাই নিয়ে আমাদের দেহতন্ত্রের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তার বাইরে আমাদের জীবনযাত্রার কারবার বন্ধ।

বিশ্বছবিতে সব চেয়ে যা আমাদের চোখে পড়ে সে হল নক্ষত্রলোক, আর সূর্য, সেও একটা নক্ষত্র। মানুষের মনে এতকাল এরা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। বর্তমান যুগে সব চেয়ে মানুষকে আশ্চর্য করে দিয়েছে এই বিশ্বের ভিতরকার লুকানো বিশ্ব, যা অতি সূক্ষ্ম, যা চোখে দেখা যায় না, অথচ যা সমস্ত সৃষ্টির মূলে।

একটা মাটির ঘর নিয়ে যদি পরখ ক'রে বের করতে চাই তার গোড়াকার জিনিসটা কী, তা হলে পাওয়া যাবে ধুলোর কণা। যখন তাকে আর গুঁড়ো করা চলবে না তখন বলব এই অতি সূক্ষ্ম ধুলোই মাটির ঘরের আদিম মালমশলা। তেমনি করেই মানুষ একদিন ভেবেছিল, বিশ্বের পদার্থগুলিকে ভাগ করতে করতে যখন এমন সূক্ষ্মে এসে ঠেকবে যে তাকে আর ভাগ করা যাবে না তখন সেইটেকেই বলব বিশ্বের আদিভূত, অর্থাৎ গোড়াকার সামগ্রী। আমাদের শাস্ত্রে তাকে বলে পরমাণু, য়ুরোপীয় শাস্ত্রে বলে অ্যাটম। এরা এত সূক্ষ্ম যে দশকোটি পরমাণুকে পাশাপাশি সাজালে তার মাপ হবে এক ইঞ্চি মাত্র।

সহজ উপায়ে ধুলোর কণাকে আর আমরা ভাগ করতে পারি নে কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাড়নে বিশ্বের সকল সামগ্রীকে আরও অনেক বেশি সূক্ষ্মে নিয়ে যেতে পেরেছে। শেষকালে এসে ঠেকেছে বিরেনব্বইটা অমিশ্র পদার্থে। পণ্ডিতেরা বললেন এদেরই যোগ-বিয়োগে জগতের যতকিছু জিনিস গড়া হয়েছে, এদের সীমান্ত পেরোবার জো নেই।

মনে করা যাক, মাটির ঘরের এক অংশ তৈরি খাঁটি মাটি দিয়ে, আর-এক অংশ মাটিতে গোবরে মিলিয়ে। তা হলে দেয়াল গুঁড়িয়ে দুরকম জিনিস পাওয়া যাবে, এক বিশুদ্ধ ধুলোর কণা, আর-এক ধুলোর সঙ্গে মেশানো গোবরের গুঁড়ো। তেমনি বিশ্বের সব জিনিস পরখ ক'রে বিজ্ঞানীরা তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, এক ভাগের নাম মৌলিক, আর-এক ভাগের নাম যৌগিক। মৌলিক পদার্থে কোনো মিশল নেই, আর যৌগিক পদার্থে এক বা আরও বেশি জিনিসের যোগ আছে। সোনা মৌলিক, ওকে সাধারণ উপায়ে যত সূক্ষ্ম ভাগ কর সোনা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। জল যৌগিক, ওকে ভাগ করলে দুটো মৌলিক গ্যাস বেরিয়ে পড়ে, একটার নাম অক্সিজেন আর-একটার নাম হাইড্রজেন। এই দুটি গ্যাস যখন স্বতন্ত্র থাকে তখন তাদের এক রকমের গুণ, আর যেই তারা মিশে হয় জল, তখনই তাদের আর চেনবার জো থাকে না, তাদের মিলনে সম্পূর্ণ নূতন স্বভাব উৎপন্ন হয়। যৌগিক পদার্থ মাত্রেরই এই দশা। তারা আপনার মধ্যে আপন আদিপদার্থের পরিচয় গোপন করে। যা হোক এইসব অ্যাটম পদবিওয়ালারাই একদিন খ্যাতি পেয়েছিল জগতের মূল উপাদান ব'লে; সবাই বলেছিল, এদের ধাতে আর একটুকুও ভাগ সয় না। কিন্তু শেষকালে তারও ভাগ বেরল। যাকে পরমাণু বলা হয়েছে তাকেও ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে পাওয়া গেল অতিপরমাণু; সে এক অপরূপ জিনিস, তাকে জিনিস বলতেও মুখে বাধে। বুঝিয়ে বলা যাক।

আজকাল ইলেকট্রিসিটি শব্দটা খুব চলতি— ইলেকট্রিক-বাতি, ইলেকট্রিক মশাল, ইলেকট্রিক পাখা এমন আরও কত কী। সকলেরই জানা আছে ওটা একরকমের তেজ। এও সবাই জানে মেঘের মধ্যে থেকে আকাশে যা চমক দেয় সেই বিদ্যুৎও ইলেকট্রিসিটি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিদ্যুৎই পৃথিবীতে আমাদের কাছে সব চেয়ে প্রবল প্রতাপে ইলেকট্রিসিটিকে, আলোয় এবং গর্জনে ঘোষণা করে। গায়ে লাগলে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ইলেকট্রিসিটি শব্দটাকে আমরা বাংলায় বলব বৈদ্যুত।

এই বৈদ্যুত আছে দুই জাতের। বিজ্ঞানীরা এক জাতের নাম দিয়েছেন পজিটিভ, আর-এক জাতের নাম নেগেটিভ। তর্জমা করলে দাঁড়ায় হাঁ-ধর্মী আর না-ধর্মী। এদের মেজাজ পরস্পরের উলটো, এই বিপরীতকে মিলিয়ে দিয়ে হয়েছে সমস্ত যা-কিছু। অথচ পজিটিভের প্রতি পজিটিভের, নেগেটিভের প্রতি নেগেটিভের একটা স্বভাবগত বিরুদ্ধতা আছে, এদের টানটা বিপরীত পক্ষের দিকে।

এই দুই জাতের অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতকণা জোট বেঁধেছে পরমাণুতে। এই দুই পক্ষকে নিয়ে প্রত্যেক পরমাণু যেন গ্রহে সূর্যে মিলন-বাঁধা। সৌরমণ্ডলের মতো।

সূর্য যেমন সৌরলোকের কেন্দ্রে থেকে টানের লাগামে ঘোরাচ্ছে পৃথিবীকে, পজিটিভ বৈদ্যুতকণা তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে থেকে টান দিচ্ছে নেগেটিভ কণাগুলোকে, আর তারা সার্কাসের ঘোড়ার মতো লাগামধারা পজিটিভের চার দিকে ঘুরছে।

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চার দিকে, নয় কোটি মাইলের দূরত্ব রক্ষা করে। আয়তনের তুলনায় অতিপরমাণুদের কক্ষপথের দূরত্ব অনুপাতে তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। পরমাণু যে অণুতম আকাশ অধিকার করে আছে তার মধ্যেও দূরত্বের প্রভূত কম-বেশি আছে। ইতিপূর্বে নক্ষত্রলোকে বৃহত্ত্বের ও পরস্পর-দূরত্বের অতি প্রকাণ্ডতার কথা বলেছি, কিন্তু অতি ছোটোকেও বলা যেতে পারে অতি প্রকাণ্ড ছোটো। বৃহৎ প্রকাণ্ডতার সীমাকে সংখ্যাচিহ্ন দিয়ে ঘের দিতে গেলে যেমন একের পিছনে বিশ-পঁচিশটা অঙ্কপাত করতে হয় ক্ষুদ্রতম প্রকাণ্ডতা সম্বন্ধে সেই একই কথা। তারও সংখ্যার ফৌজ লম্বা লাইন জুড়ে দাঁড়ায়। পরমাণুর অতি সূক্ষ্ম আকাশে যে দূরত্ব বাঁচিয়ে অতিপরমাণুরা চলাফেরা করে তার উপমা উপলক্ষ্যে একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী বলেছেন, হাওড়া স্টেশনের মতো মস্ত একটা স্টেশন থেকে অন্য সব কিছু জিনিস সরিয়ে দিয়ে কেবল গোটা পাঁচ-ছয় বোলতা ছেড়ে দিলে তবে তারই সঙ্গে তুলনা হতে পারে পরমাণুর আকাশস্থিত অতিপরমাণুদের। কিন্তু এই ব্যাপক শূন্যের মধ্যে দূরবর্তী কয়েকটি চঞ্চল পদার্থকে আটকে রাখবার জন্যে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর প্রায় সমস্ত ভার সমস্ত শক্তি কাজ করছে। এ না হলে পরমাণুজগৎ ছারখার হয়ে যেত, আর পরমাণু দিয়ে গড়া বিশ্বজগতের অস্তিত্ব থাকত না।

পদার্থের মধ্যে অণুগুলি পরস্পর কাছাকাছি আছে একটা টানের শক্তিতে। তবু সোনার মতো নিরেট জিনিসের অণুরও মাঝে মাঝে ফাঁক আছে। সংখ্যা দিয়ে সেই অতি সূক্ষ্ম ফাঁকের পরিমাণ জানাতে চাই নে, তাতে মন পীড়িত হবে। প্রশ্ন ওঠে একটুও ফাঁক থাকে কেন, গ্যাস থাকে কেন, কেন থাকে তরল পদার্থ। এর একই জাতের প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবী কেন সূর্যের গায়ে গিয়ে এঁটে যায় না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা পিণ্ডে তাল পাকিয়ে যায় না কেন। এর উত্তর এই পৃথিবী সূর্যের টান মেনেও দৌড়ের বেগে তফাত থাকতে পারে। দৌড় যদি যথেষ্ট পরিমাণ বেশি হত তা হলে টানের বাঁধন ছিঁড়ে শূন্যে বেরিয়ে পড়ত, দৌড়ের বেগ যদি ক্লান্ত হত তা হলে সূর্য তাকে নিত আত্মসাৎ ক'রে। অণুদের মধ্যে ফাঁক থেকে যায় গতির বেগে, তাতেই বাঁধনের শক্তিকে ঠেলে রেখে দেয়। গ্যাসীয় পদার্থে গতির প্রাধান্য বেশি। অণুর দল এই অবস্থায় এত দ্রুতবেগে চলে যে তাদের পরস্পরের মিল ঘটবার অবকাশ থাকে না। মাঝে মাঝে তাদের সংঘাত হয় কিন্তু মুহূর্তেই আবার যায় সরে। তরল

পদার্থে আণবিক আকর্ষণের শক্তি সামান্য ব'লেই চলন বেগের জন্যে তাদের মধ্যে অতিঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয় না। নিরেট বস্তুতে বাঁধনের শক্তিটা অপেক্ষাকৃত প্রবল। তাতে অণুর দল সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর আটকা পড়ে থাকে। তাই ব'লে তারা যে শান্ত থাকে তা নয় তাদের মধ্যে কম্পন চলছেই কিন্তু তাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র অল্পপরিসর।

অণুদের মধ্যে এই চলন কাঁপন, এই হচ্ছে তাপ। অস্থিরতা যত বাড়ে গরম ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদের একেবারে শান্ত করা সম্ভব হত যদি এদের তাপ তাপমানের শূন্য অঙ্কের নিচে আরও ২৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নামিয়ে দেওয়া সম্ভব হত।

এইবার হাইড্রজেন গ্যাসের পরমাণু মহলে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

এর চেয়ে হালকা গ্যাস আর নেই। এর পরমাণুর কেন্দ্রে বিরাজ করছে একটি-মাত্র বৈদ্যুতকণা যাকে বলে প্রোটন, আর তার টানে বাঁধা প'ড়ে চার দিকে ঘুরছে অন্য একটিমাত্র কণিকা যার নাম ইলেকট্রন। প্রোটন-কণায় যে বৈদ্যুতের প্রভাব সে পজিটিভধর্মী, আর ইলেকট্রনকণা যে বৈদ্যুতের বাহন সে নেগেটিভধর্মী। নেগেটিভ ইলেকট্রন চটুল চঞ্চল, পজিটিভ প্রোটন রাশভারি। ইলেকট্রনের ওজনটা গণ্যের মধ্যেই নয়, পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভার কেন্দ্রবস্তুতে হয়েছে জমা।

মোটের উপরে সব ইলেকট্রনই না-ধর্মী বটে কিন্তু এমন একজাতের ইলেকট্রন ধরা পড়েছে যারা হাঁ-ধর্মী, অথচ ওজনে ইলেকট্রনেরই সমান। এদের নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন।

কখনো কখনো দেখা গেছে বিশেষ হাইড্রজেনের পরমাণু সাধারণের চেয়ে ডবল ভারি। পরীক্ষায় বেরিয়ে পড়ল কেন্দ্রস্থলে প্রোটনের সঙ্গে আছে তার এক সহযোগী। পূর্বেই বলেছি প্রোটন হাঁ-ধর্মী। তার কেন্দ্রের শরিকটিকে পৃথক করে দেখা গেল সে সাম্যধর্মী, হাঁ-ধর্মীও নয়, না-ধর্মীও নয়। অতএব সে বৈদ্যুতধর্মবর্জিত। সে আপন প্রোটন শরিকের সমান ওজনের, কিন্তু প্রোটন যেমন ক'রে ইলেকট্রনকে টানে এ তেমন টানতে পারে না, আবার প্রোটনকে ঠেলে ফেলবার চেষ্টাও তার নেই। এই কণার নাম দেওয়া হয়েছে ন্যুট্রন। এটি লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে অন্য জাতের বাটখারা দিয়ে পরমাণু যতই ভারি করা যাক ইলেকট্রনের উপরে সেই সাম্যধর্মীদের কোনো জোর খাটে না—একটি প্রোটন কেবল একটিমাত্র ইলেকট্রনকে শাসনে রাখে। পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা যে পরিমাণ বেশি হয় সেই পরিমাণ ইলেকট্রনকে তারা বশে রাখে। অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণুকেন্দ্রে আছে আটটি প্রোটন, সঙ্গে থাকে আটটি ন্যুট্রন, তার প্রদক্ষিণকারী ইলেকট্রনের সংখ্যা থাকে ঠিক আটটি।

পজিটিভে নেগেটিভে যথাপরিমাণ মিলে যেখানে সন্ধি করে আছে সেখানে যদি কোনো উপায়ে গৃহবিচ্ছেদ ঘটানো যায়, গুটিকতক নেগেটিভকে দেওয়া যায় তফাত করে, তা হলে সেই জিনিসে বৈদ্যুতের পরিমাণের হিসাবে হবে গরমিল, অতিরিক্ত হয়ে পড়বে পজিটিভ বৈদ্যুতের চার্জ। মেয়েপুরুষে মিলে যেখানে গৃহস্থালীর সামঞ্জস্য সেখানে মেয়ের প্রভাবকে যে-পরিমাণে সরিয়ে দেওয়া যাবে, সে-সংসারটা সেই পরিমাণে হয়ে পড়বে পুরুষপ্রধান ; এও তেমনি।

এই চার্জ কথাটা ইলেকট্রিসিটির প্রসঙ্গে সর্বদাই ব্যবহারে লাগে। সাধারণত যে-সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করি তাদের মধ্যে বৈদ্যুতের কোনো ছটফটানি দেখা যায় না, তারা চার্জ করা নয়, অর্থাৎ দুই জাতের যে-পরিমাণ বৈদ্যুতে মিলে মিশে থাকলে শান্তি রক্ষা হয় তা তাদের মধ্যে আছে। কিন্তু কোনো জিনিসে কোনো একটা জাতের বৈদ্যুত যদি সন্ধি না মেনে আপন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাপিয়ে বাড়াবাড়ি করে তা হলে সেই বৈদ্যুতের দ্বারা জিনিসটা চার্জ করা হয়েছে বলা হয়।

এক টুকরো রেশম নিয়ে কাঁচের গায়ে ঘষা গেল। ফল হল এই যে ঘষড়ানিতে কাঁচের থেকে কিছু ইলেকট্রন এল বেরিয়ে, সেটা চালান হল রেশমে। কাঁচে নেগেটিভ কমতেই পজিটিভ বৈদ্যুতের প্রাধান্য হল, ওদিকে রেশমে নেগেটিভ বৈদ্যুতের প্রভাব বাড়ল, সেটা হল নেগেটিভ বৈদ্যুতের দ্বারা চার্জ করা। ইলেকট্রন-খোয়ানো কাঁচ তার পজিটিভ চার্জের ঝোঁকে টেনে নিতে চাইল রেশমটাকে, আবার নেগেটিভের ভিড়-বাহুল্যওয়ালা রেশমে টান পড়ল কাঁচের দিকে। কাঁচ বা রেশমে সাধারণতন্ত্র যখন অক্ষুণ্ণ ছিল তখন আপনাতে আপনি ছিল সহজ, ছিল শান্ত। শান্ত অবস্থায় এদের মধ্যে বৈদ্যুতের অস্তিত্ব জানাই যায় নি। বাইরে বৈদ্যুতিক গৃহবিপ্লবের খবর তখনই বেরিয়ে পড়ল যেমনি ভাগাভাগির অসমানতায় ক্ষোভ জন্মিয়ে দিলে।

কাঁচ কিংবা অন্য কিছুর থেকে ঘষাঘষির দ্বারা সামান্য পরিমাণ ইলেকট্রন সরিয়ে নেবার কথা বলেছি। পরিমাণটা কত যদি বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা যায় তিনি সামান্য একটু ঘাড় নেড়ে বলবেন, ঘষড়ানির মাত্রা অনুসারে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট কোটি হতে পারে। বিজলি বাতির সল্‌তে-তারের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের ঠেসাঠেসি ভিড় চলতে থাকে, তবেই সে জ্বলে। তারে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যতগুলি ইলেকট্রন একসঙ্গে যাত্রা করে আমাদের গণিতশাস্ত্রে সেই সংখ্যার কী নাম আছে আমি তা তো জানি নে। যা হোক এটা দেখা গেল যে, অতিপরমাণুদের দুরন্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভে সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্বে আছে শান্তি। ভালুকওয়ালা বাজায় ডুগডুগি, তারই তালে ভালুক নাচে, আর নানা খেলা দেখায়। ডুগডুগিওয়ালা

না যদি থাকে, পোষমানা ভালুক যদি শিকলি কেটে স্বধর্ম পায় তা হলে কামড়িয়ে আঁচড়িয়ে চার দিকে অনর্থপাত করতে থাকে। আমাদের সর্বাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই পোষমানা বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডুগডুগির ছন্দে চলেছে সৃষ্টির নাচ ও খেলা। সৃষ্টির আখড়ায় দুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ দ্বন্দ্ব মিলিয়ে বিশ্বচরাচরে রঙ্গভূমি সরগরম করে রেখেছে।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী পরমাণুজগৎকে সৌরমণ্ডলীর সঙ্গে তুলনীয় করে বললেন, পরমাণুর কেন্দ্র ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন চক্রপথে ঘুর খাচ্ছে ইলেকট্রনের দল। আর-এক পণ্ডিত প্রমাণ করলেন যে, ঘূর্ণিপাক-খাওয়া ইলেকট্রনরা তাদের এক কক্ষপথ থেকে আর-এক কক্ষপথে ঠাঁই বদল করে, আবার ফেরে আপন নির্দিষ্ট পথে।

পরমাণুলোকের যে-ছবি সৌরলোকের ছাঁদে, তাতে আছে পজিটিভ বৈদ্যুতওয়ালা একটা কেন্দ্রবস্তু, আর তার চার দিকে ইলেকট্রনদের প্রদক্ষিণ।

এ মত মেনে নেবার বাধা আছে। ইলেকট্রন যদি একটানা পথে চলত তা হলে ক্রমে তার শক্তি ক্ষয় হয়ে ক্রমে পথ খাটো করে সে পড়ত গিয়ে কেন্দ্রবস্তুর উপরে। পরমাণুর সর্বনাশ ঘটাত।

এখন এই মত দাঁড়িয়েছে, ইলেকট্রনের ডিম্বাকার চলবার পথ একটি নয়, একাধিক। কেন্দ্র থেকে এই কক্ষগুলির দূরত্ব নির্দিষ্ট। কেন্দ্রের সব চেয়ে কাছের যে পথ, কোনো ইলেকট্রন তা পেরিয়ে যেতে পারে না। ইলেকট্রন বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে দর্শন দেয়। কেন দেয় এবং হঠাৎ কখন দেখা দেবে তার কোনো বাঁধা নিয়ম পাওয়া যায় না। তেজ শোষণ ক'রে ইলেকট্রন ভিতরের পথ থেকে বাইরের পথে লাফিয়ে যায়, এই লাফের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত তেজের পরিমাণের উপর। ইলেকট্রন তেজ বিকীর্ণ করে কেবল যখন সে তার বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে আবির্ভূত হয়। ছাড়া-পাওয়া এই তেজকেই আমরা পাই আলোরূপে। যতক্ষণ একই কক্ষে চলতে থাকে ততক্ষণ তার শক্তি-বিকিরণ বন্ধ। এ মতটা ধরে-নেওয়া একটা মত, কোনো কারণ দেখানো যায় না। মতটা মেনে নিলে তবেই বোঝা যায় পরমাণু কেন টিঁকে আছে, বিশ্ব কেন বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

এসব কথার পিছনে দুরূহ তত্ত্ব আছে, সেটা বোঝবার অনেক দেরি। আপাতত কথাটা শুনে রাখা মাত্র।

পূর্বেই বলেছি বিজ্ঞানীরা খুব দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে, বিরেনব্বইটি আদিভূত বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক পদার্থ। অতিপরমাণুদের সাক্ষ্যে আজ সেকথা অপ্রমাণ

হয়ে গেল। তবু এখনও রয়ে গেল এদের সম্মানের উপাধিটা।

একদা মৌলিক পদার্থের খ্যাতি ছিল যে তাদের গুণের নিত্যতা আছে। তাদের যতই ভাঙা যাক কিছুতেই তাদের স্বভাবের বদল হয় না। বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ে দেখা গেল তাদের চরম ভাগ করলে বেরিয়ে পড়ে দুই জাতীয় বৈদ্যুতওয়ালা কণাবস্তুর জুড়িনৃত্য। যারা মৌলিক পদার্থ নামধারী তাদের স্বভাবের বিশেষত্ব রক্ষা করেছে এইসব বৈদ্যুতেরা বিশেষ সংখ্যায় একত্র হয়ে। এইখানেই যদি থামত তা হলেও পরমাণুদের রূপনিত্যতার খ্যাতি টিঁকে যেত। কিন্তু ওদের নিজের দলের থেকেই বিরুদ্ধ সাক্ষ্য পাওয়া গেল। একটা খবর পাওয়া গেল যে, হালকা যেসব পরমাণু তাদের মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটনের ঘোরাঘুরি নিত্যনিয়মিতভাবে চলে আসছে বটে কিন্তু অত্যন্ত ভারি যারা, যাদের মধ্যে ন্যুট্রন-প্রোটনসংঘের অতিরিক্ত ঠেসাঠেসি ভিড়, যেমন য়ুরেনিয়ম বা রেডিয়ম, তারা আপন তহবিল সামলাতে পারছে না, সদা সর্বক্ষণই তাদের মূল সম্বল ছিটকে পড়তে পড়তে হালকা হয়ে তারা এক রূপ থেকে অন্য রূপ ধরছে।

এতকাল রেডিয়ম নামক এক মৌলিক ধাতু লুকিয়ে ছিল স্থূল আবরণের মধ্যে। তার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর গূঢ়তম রহস্য ধরা পড়ে গেল। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তার প্রথম মোকাবিলার ইতিহাস মনে রেখে দেবার যোগ্য।

যখন র‍্যণ্টগেন রশ্মির আবিষ্কার হল, দেখা গেল তার স্থূল বাধা ভেদ করবার ক্ষমতা। তখন আঁরি বেকরেল ছিলেন প্যারিস ম্যুনিসিপাল স্কুলে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। স্বতোদীপ্তিমান পদার্থ মাত্রেরই এই বাধা ভেদ করবার শক্তি আছে কি না, সেই পরীক্ষায় তিনি লাগলেন। এইরকম কতকগুলি ধাতুপদার্থ নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তাদের কালো কাগজে মুড়ে রেখে দিলেন ফোটোগ্রাফের প্লেটের উপরে। দেখলেন তাতে মোড়ক ভেদ করে কেবল য়ুরেনিয়ম ধাতুরই চিহ্ন পড়ল। সকলের চেয়ে গুরুভার যার পরমাণু তার তেজস্ক্রিয়তা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

পিচব্লেণ্ড নামক এক খনিজ পদার্থ থেকে য়ুরেনিয়মকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। বেকরেলের এক অসামান্য বুদ্ধিমতী ছাত্রী ছিলেন মাদাম কুরি। তাঁর স্বামী পিয়ের কুরি ফরাসী বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরা স্বামীস্ত্রীতে মিলে এই পিচব্লেণ্ড নিয়ে পরখ করতে লাগলেন, দেখলেন এর তেজস্ক্রিয় প্রভাব য়ুরেনিয়মের চেয়ে আরও প্রবল। পিচব্লেণ্ডের মধ্যে এমন কোনো কোনো পদার্থ আছে যারা এই শক্তির মূলে, তারই আবিষ্কারের চেষ্টায় তিনটি নূতন পদার্থ বের হল, রেডিয়ম, পলোনিয়ম, এবং য়্যাক্‌টিনিয়ম।

পরীক্ষা করতে করতে প্রায় চল্লিশটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেছে। প্রায় এদের সবগুলিই বিজ্ঞানে নতুন জানা।

তখনকার দিনে সকলের চেয়ে চমক লাগিয়ে দিল এই ধাতুর একটি অদ্ভুত স্বভাব। সে নিজের মধ্যে থেকে জ্যোতিষ্কণা বিকীর্ণ ক'রে নিজেকে নানা মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করতে করতে অবশেষে সীসে করে তোলে। এ যেন একটা বৈজ্ঞানিক ভেলকি বললেই হয়। এক ধাতু থেকে অন্য ধাতুর যে উদ্ভব হতে পারে, সে এই প্রথম জানা গেল।

যে-সকল পদার্থ রেডিয়মের এক জাতের, অর্থাৎ তেজ-ছিটোনোই যাদের স্বভাব তারা সকলেই জাত-খোওয়াবার দলে। তারা কেবলই আপনার তেজের মূলধন খরচ করতে থাকে। এই অপব্যয়ের ফর্দে প্রথম যে তেজঃপদার্থ পড়ে, গ্রীকবর্ণমালার প্রথম অক্ষরের নামে তার নাম দেওয়া হয়েছে আল্‌ফা। বাংলা বর্ণমালা ধরে তাকে ক বললে চলে। এ একটা পরমাণু, পজিটিভ জাতের। রেডিয়মের আরও একটা ছিটিয়ে-ফেলা তেজের কণা আছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে বীটা, বলা যেতে পারে খ। সে ইলেকট্রন, নেগেটিভ চার্জ করা, বিষম তার দ্রুত বেগ। তবু পাতলা একটি কাগজ চলার রাস্তায় পড়লে আল্‌ফা-পরমাণু দেহান্তর লাভ করে, সে হয়ে যায় হীলিয়ম গ্যাস। আরও কিছু বাধা লাগে বীটাকে থামিয়ে দিতে। রেডিয়মের তূণে এই দুইটি ছাড়া আর-একটি রশ্মি আছে তার নাম গামা। সে পরমাণু বা অতিপরমাণু নয়, সে একটি বিশেষ আলোকরশ্মি। তার কিরণ স্থূল বস্তুকে ভেদ করে যেতে পারে, যেমন যায় র‍্যণ্টগেন্‌ রশ্মি। এইসব তেজস্কণার ব্যবহার সকল অবস্থাতেই সমান, লোহা-গলানো গরমেও, গ্যাস-তরল-করা ঠাণ্ডাতেও। তা ছাড়া তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আবার পূর্বের মতো দানা বেঁধে দেওয়া কারও সাধ্য নেই।

পরমাণুর কেন্দ্র-পিণ্ডটিতে যতক্ষণ না কোনো লোকসান ঘটে ততক্ষণ দুটো-চারটে ইলেকট্রন যদি ছিনিয়ে নেওয়া যায় তা হলে তার বৈদ্যুতের বাঁধা বরাদ্দে কিছু কমতি পড়তে পারে কিন্তু অপঘাতটা সাংঘাতিক হয় না। যদি ঐ কেন্দ্রবস্তুটার খাস তহবিলে লুটপাট সম্ভব হয় তা হলেই পরমাণুর জাত বদল হয়ে যায়।

পরমাণুর নিজের মধ্যে একান্ত ঐক্য নেই এ-খবরটা পেয়েই বিজ্ঞানীরা প্রথমটা আশা করেছিলেন যে, তাঁরা তেজ-ছুঁড়ে-মারা গোলন্দাজ রেডিয়মকে লাগাবেন পরমাণুর মধ্যে ভেদ ঘটিয়ে তার কেন্দ্রসম্বলভাণ্ডা লুটপাটের কাজে। কিন্তু লক্ষ্যটি অতিসূক্ষ্ম, নিশানা করা সহজ নয়, তেজের ঢেলা বিস্তর মারতে মারতে দৈবাৎ একটা লেগে যায়। তাই এ-রকম অনিশ্চিত লড়াইপ্রণালীর বদলে আজকাল প্রকাণ্ড যন্ত্র তৈরির আয়োজন

হচ্ছে যাতে অতি প্রচণ্ড শক্তিমান বৈদ্যুত উৎপন্ন হয়ে পরমাণুর কেন্দ্রকেল্লার পাহারা ভেদ করতে পারে। সেখানে আছে প্রবল পালোয়ান-শক্তির পাহারা। আজ ঠিক যে-সময়টাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারবার জন্যে সহস্রঘ্নী যন্ত্রের উদ্ভাবন হচ্ছে ঠিক সেই সময়টাতেই বিশ্বের সূক্ষ্মতম পদার্থের অলক্ষ্যতম মর্ম বিদীর্ণ করবার জন্যে বিরাট বৈদ্যুতবর্ষণীর কারখানা বসল।

পূর্বেই বলেছি আল্‌ফাকণা স্বরূপ হারিয়ে হয়ে যায় হীলিয়ম গ্যাস। এটা কাজে লেগেছে পৃথিবীর বয়স প্রমাণ করতে। কোনো পাহাড়ের একখানা পাথরের মধ্যে যদি বিশেষ পরিমাণ হীলিয়ম গ্যাস দেখা যায়, তা হলে এই গ্যাসের পরিণতির নির্দিষ্ট সময় হিসাব করে ঐ পাহাড়ের জন্মকুষ্ঠি তৈরি করা যায়। এই প্রণালীর ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বয়স বিচার করা হয়েছে।

ওজনের গুরুত্বে হাইড্রজেন গ্যাসের ঠিক উপরের কোঠাতেই পড়ে যে-গ্যাস তারই নাম দেওয়া হয়েছে হীলিয়ম। এই গ্যাস বিজ্ঞানীমহলে নূতন-জানা। এই গ্যাস প্রথম ধরা পড়েছিল সূর্যগ্রহণের সময়ে। সূর্য আপন চক্রসীমাটুকু ছাড়িয়ে বহুলক্ষ ক্রোশ দূর পর্যন্ত জলদ্‌বাষ্পের অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয় উড়িয়ে থাকে, ঝরনা যেমন জলকণার কুয়াশা ছড়ায় আপনার চারি দিকে। গ্রহণের সময় সেই তার চার দিকের আগ্নেয় গ্যাসের বিস্তার দেখতে পাওয়া যায় দুরবীনে। এই দূরবিক্ষিপ্ত গ্যাসের দীপ্তিকে য়ুরোপীয় ভাষায় বলে করোনা, বাংলায় একে বলা যেতে পারে কিরীটিকা।

কিছুকাল আগে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের সূর্যগ্রহণের সুযোগে এই কিরীটিকা পরীক্ষা করবার সময় বর্ণলিপির নীলসীমানার দিকে দেখা গেল তিনটি অজানা সাদা রেখা। পণ্ডিতেরা ভাবলেন হয়তো কোনো একটি আগের জানা পদার্থ অধিক দহনে নূতন দশা পেয়েছে, এটা তারই চিহ্ন। কিংবা হয়তো একটা নতুন পদার্থ ই বা জানান দিল। এখনও তার ঠিকানা হল না।

১৮৬৮ খৃস্টাব্দের গ্রহণের সময় বিজ্ঞানীদের এইরকমই একটা চমক লাগিয়েছিল। সূর্যের গ্যাসীয় বেড়ার ভিতর থেকে একটা লিপি এল তখনকার কোনো অচেনা পদার্থের। এই নূতন খবর-পাওয়া মৌলিক পদার্থের নাম দেওয়া হল হীলিয়ম, অর্থাৎ সৌরক। কেননা তখন মনে হয়েছিল এটা একান্ত সূর্যেরই অন্তর্গত গ্যাস। অবশেষে ত্রিশ বছর কেটে গেলে পরে বিখ্যাত রসায়নী র‍্যামজে এই গ্যাসের আমেজ পেলেন পৃথিবীর হাওয়ায় অতি সামান্য পরিমাণে। তখন স্থির হল পৃথিবীতে এ গ্যাস দুর্লভ। তার পরে দেখা গেল উত্তর-আমেরিকায় কোনো মেটে তেলের গহ্বরে যে-গ্যাস পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট পরিমাণে হীলিয়ম আছে। তখন একে কাজে লাগাবার সুবিধে

হল। অত্যন্ত হালকা ব'লে এতদিন হাইড্রজেন গ্যাস দিয়ে আকাশযানগুলোর উড়ন-শক্তির জোগান দেওয়া হত। কিন্তু হাইড্রজেন গ্যাস ওড়াবার পক্ষে যেমন কেজো, জ্বালাবার পক্ষে তার চেয়ে কম না। এই গ্যাস অনেক মস্ত মস্ত উড়োজাহাজকে জ্বালিয়ে মেরেছে। হীলিয়ম গ্যাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দুরন্ত জ্বলনচণ্ডী নেই, অথচ হাইড্রজেন ছাড়া সকল গ্যাসের চেয়ে এ হালকা। তাই জাহাজ-ওড়ানোকে নিরাপদ করবার জন্যে তারই ব্যবহার চলতি হয়েছে। চিকিৎসাতেও কোনো কোনো রোগে এর প্রয়োগ শুরু হল।

পূর্বেই বলা হয়েছে পজিটিভ চার্জওয়ালা পদার্থ ও নেগেটিভ চার্জওয়ালা পদার্থ পরস্পরকে কাছে টানে কিন্তু একই জাতীয় চার্জওয়ালারা পরস্পরকে ঠেলে ফেলতে চায়। যতই তাদের কাছাকাছি করা যায় ততই উগ্র হয়ে ওঠে তাদের ঠেলার জোর। তেমনি বিপরীত চার্জওয়ালারা যতই পরস্পরের কাছে আসে তাদের টানের জোর ততই বেড়ে ওঠে। এই জন্যে যেসব ইলেকট্রন কেন্দ্রবস্তুর কাছাকাছি থাকে তারা টানের জোর এড়াবার জন্যে দূরবর্তীদের চেয়ে দৌড়য় বেশি জোরে। সৌরমণ্ডলে যেসব গ্রহ সূর্যের যত কাছে তাদের দৌড়ের বেগ ততই বেশি। দূরের গ্রহদের বিপদ কম, তারা অনেকটা ধীরেসুস্থে চলে।

এই ইলেকট্রন প্রোটনের ব্যাস সমস্ত পরমাণুর পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে শূন্যতাই বেশি। একটা মানুষের দেহের সমস্ত পরমাণু যদি ঠেসে দেওয়া হয়, তা হলে তার থেকে একটি অদৃশ্যপ্রায় বস্তুবিন্দু তৈরি হবে।

দুই প্রোটনের পরস্পরের প্রতি বিমুখতার জোর যে কত, রসায়নী ফ্রেডরিক সডি তার হিসাব করে বলেছেন, এক গ্র্যাম পরিমাণ প্রোটন যদি ভূতলের এক মেরুতে রাখা যায় আর তার বিপরীত মেরুতে থাকে আর-এক গ্র্যাম প্রোটন তা হলে এই সুদূর পথ পেরিয়ে গিয়ে তাদের উভয়েরই ঠেলা মারার জোর হবে প্রায় ছ শো মণের চাপে। এই যদি বিধি হয় তা হলে বোঝা শক্ত হয় পরমাণুকেন্দ্রের অতি সংকীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে একটির বেশি প্রোটন কেমন করে ঘেঁষাঘেঁষি মিলে থাকতে পারে। এই নিয়ম অনুসারে হাইড্রজেন যার পরমাণুকেন্দ্রে একেশ্বর প্রোটনের অধিকার, সে ছাড়া বিশ্বে আর কোনো পদার্থ তো টিঁকতেই পারে না; তা হলে তো বিশ্বজগৎ হয়ে ওঠে হাইড্রজেনময়।

এদিকে দেখা যায় য়ুরেনিয়ম ধাতু বহন করেছে ৯২টা প্রোটন, ১৪৬টা ন্যুট্রন। এত বেশি ভিড় সে সামলাতে পারে না একথা সত্য, ক্ষণে ক্ষণে সে তার কেন্দ্রভাণ্ডার থেকে বৈদ্যুতকণার বোঝা হালকা করতে থাকে। ভার কিছু পরিমাণ কমলে সে

রূপ নেয় রেডিয়মের, আরও কমলে হয় পলোনিয়ম, অবশেষে সীসের রূপ ধরে স্থিতি পায়।

ওজন এত ছেঁটে ফেলেও স্থিতি পায় কী করে এ সন্দেহ তো দূর হয় না। বিকিরণের পালা শেষ করে সমস্ত বাদসাদ দিয়েও সীসের দখলে বাকি থাকে ৮২টা প্রোটন। পজিটিভ বৈদ্যুতের স্বজাত-ঠেলা-মারা মেজাজ নিয়ে এই প্রোটনগুলো পরমাণুলোকের শান্তিরক্ষা করে কী ক'রে, দীর্ঘকাল ধরে এ প্রশ্নের ভালো জবাব পাওয়া গেল না। কেন্দ্রের বাইরে এদের ঝগড়া মেটে না, কেন্দ্রের ভিতরটাতে এদের মৈত্রী অটুট, এ একটা বিষম সমস্যা।

এই রহস্যভেদের উপযোগী ক'রে যন্ত্রশক্তির বল বৃদ্ধি করা হল। পরমাণুর কেন্দ্রগত প্রোটন-লক্ষ্যের বিরুদ্ধে পরীক্ষকেরা হাঁ-ধর্মী বৈদ্যুতকণার দল লাগিয়ে দিলেন; যত জোরের বৈদ্যুতকণা তাদের ধাক্কা দিলে তার বেগ সেকেণ্ডে ৬৭২০ মাইল। তবু কেন্দ্রস্থিত প্রোটন আপন প্রোটনধর্ম রক্ষা করলে, আক্রমণকারী বৈদ্যুতের দল'কে ছিটকিয়ে ফেললে। বৈদ্যুত তাড়নার জোর বাড়িয়ে দেওয়া হল। বিজ্ঞানী লাগালেন ধাক্কা ৭৭০০ মাইলের বেগে, শিকারটিকে হার মানাতে পারলেন না। অবশেষে ৮৫০০ মাইলের তাড়া খেয়ে বিরুদ্ধশক্তি নরম হবার লক্ষণ দেখালে। ছিটকোনো-শক্তির বেড়া ডিঙিয়ে আক্রমণশক্তি পৌঁছল কেন্দ্রদুর্গের মধ্যে। দেখা গেল দুটি সমধর্মী বৈদ্যুতকণা যত কাছে গিয়ে পৌঁছলে তাদের ঠেলাঠেলি যায় চুকে সে হচ্ছে এক ইঞ্চির বহু কোটি ভাগ ঘেঁষাঘেঁষিতে। তা হলে ধরে নিতে হবে ঐ নৈকট্যের মধ্যে প্রোটনদের পরস্পর ঠেলে ফেলার শক্তি যত তার চেয়ে প্রভূত বড়ো একটা শক্তি আছে, টেনে রাখবার শক্তি। ঐ শক্তি পরমাণুমহলে প্রোটনকেও যেমন টানে ন্যুট্রনকেও তেমনি টানে, অর্থাৎ বৈদ্যুতের চার্জ যার আছে আর যার নেই উভয়ের 'পরেই তার সমান প্রভাব। পরমাণুকেন্দ্রবাসী এই অতিপ্রবল আকর্ষণশক্তি সমস্ত বিশ্বকে রেখেছে বেঁধে। পরমাণুর মধ্যেকার ঘরোয়া বিবাদ মিটিয়েছে যে-শাসন সেই শাসনেই বিশ্বে বিরাজ করে শান্তি।

আধুনিক ইতিহাস থেকে এর উপমা সংগ্রহ করে দেওয়া যাক। চীন রিপব্লিকের শান্তি নষ্ট ক'রে কতকগুলি একাধিপত্যলোলুপ জাঁদরেল পরস্পর লড়াই ক'রে দেশটাকে ছারখার করে দিচ্ছিল। রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে এই বিরুদ্ধদলের চেয়ে প্রবলতর শক্তি যদি থাকত তা হলে শাসনের কাজে এদের সকলকে এক ক'রে রাষ্ট্রশক্তিকে বলিষ্ঠ ও নিরাপদ করে রাখা সহজ হত। পরমাণুর রাষ্ট্রতন্ত্রে সেই বড়ো শক্তি আছে সকল শক্তির উপরে, তাই যারা স্বভাবত মেলে না তারাও মিলে বিশ্বের শান্তি রক্ষা হচ্ছে।

এর থেকে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের শান্তি পদার্থটি ভালোমানুষি শান্তি নয়। যতসব দুরন্তদের মিলিয়ে নিয়ে তবে একটা প্রবল মিল হয়েছে। যারা স্বতন্ত্রভাবে সর্বনেশে তারাই মিলিতভাবে সৃষ্টির বাহন।

পরমাণুর ইতিহাসে রেডিয়মের অধ্যায়ের মূল্য বেশি, সেইজন্যে একটু বিশদ করে তার কথাটা বলে নিই।— রেডিয়ম লোহা প্রভৃতির মতোই ধাতুদ্রব্য। এর পরমাণুগুলি ভারে এবং আয়তনে বড়ো। অবশেষে একদিন কী কারণে কেউ জানে না রেডিয়মের পরমাণু যায় ফেটে, তার অল্প একটু অংশ যায় ছুটে ; এই ভাঙন-ধরা পরমাণু থেকে নিঃসৃত আল্‌ফারশ্মিতে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় তারা প্রত্যেকে দুটি প্রোটন ও দুটি ন্যুট্রনের সংযোগে তৈরি। অর্থাৎ হীলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুরই সঙ্গে তারা এক। বীটারশ্মি কেবল ইলেকট্রনের ধারা। গামারশ্মিতে কণা নেই ; তা আলোকজাতীয়। কেন যে এমন ভাঙচুর হয় তার কারণ আজও ধরা পড়ে নি। এইটুকু অপব্যয়ের দরুণ পরমাণুর বাকি অংশ আর সেই সাবেক রেডিয়মরূপে থাকে না। তার স্বভাব যায় বদলিয়ে। দুটি ইলেকট্রন আত্মসাৎ করে আল্‌ফাকণার পরিণতি ঘটে হীলিয়ম গ্যাসে। এই স্ফোরণ ব্যাপারকে বাইরের কিছুতে না পারে উসকিয়ে দিতে, না পারে থামাতে। চারি দিকের অবস্থা ঠাণ্ডাই থাক আর গরমই থাক, অন্য অণুপরমাণুদের সঙ্গে মেলামেশাই করুক, অর্থাৎ তার বাইরের ব্যবস্থা যে রকমই হোক তার ফেটে যাওয়ার কাজটা ঘটতে থাকে ভিতরের থেকে। গড়ের উপরে রেডিয়মের আয়ু প্রায় দু হাজার বছর, কিন্তু তার যে-পরমাণু থেকে একটা আল্‌ফাকণা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তার মেয়াদ প্রায় দিন-চারেকের। তার পরে তার থেকে পরে পরে স্ফোরণ ঘটতে থাকে, অবশেষে গিয়ে ঠেকে সীসেতে। আল্‌ফাকণা যখন শুরু করে তার দৌড় তখন তার বেগ থাকে এক সেকেণ্ডে প্রায় দশ হাজার মাইল। কিন্তু যখন তাকে কোনো বস্তুপদার্থের এমন কি বাতাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তখন দুতিনইঞ্চি-খানেক পথ যেতে যেতেই তার চলন সহজ হয়ে আসে। আল্‌ফারশ্মি চলে একেবারে সোজা রেখা ধ'রে। কী ক'রে পারে সে একটা ভাববার কথা। কেননা বাতাসে যে অক্সিজেন বা নাইট্রজেন পরমাণু আছে হীলিয়মের পরমাণু তার চেয়ে অনেক হালকা আর ছোটো। এই তিন ইঞ্চি রাস্তায় বাতাসের বিস্তর ভারি ভারি অণু তাকে ঠেলে যেতে হয়। এ কিন্তু ভিড় ঠেলে যাওয়া নয়, ভিড় ভেদ করে যাওয়া। পরমাণু বলতে বোঝায় একটি কেন্দ্রবস্তু আর তাকে ঘিরে দৌড়-খাওয়া ইলেকট্রনের দল। এদের পাহারার ভিতর দিয়ে যেতে প্রচণ্ড বেগের জোর চাই। সেই জোর আছে আল্‌ফাকণার। সে অন্য মণ্ডলীর ভিতর দিয়ে চলে যায়। অন্য পরমাণুর ভিতর দিয়ে

যেতে যেতে লোকসান ঘটাতে থাকে। কোনো পরমাণুর দিলে হয়তো একটা ইলেকট্রন সরিয়ে, ক্রমে দুটো-তিনটে গেল হয়তো তার খসে, তখন ইলেকট্রনগুলো বাঁধনছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। অন্য পরমাণুদের সঙ্গে জোড় বাঁধে। যে-পরমাণু ইলেকট্রন হারিয়েছে তাকে লাগে পজিটিভ বৈদ্যুতের চার্জ আর যে-পরমাণু ছাড়া-ইলেকট্রনটাকে ধরেছে তার চার্জ নেগেটিভ বৈদ্যুতের। তারা যদি পরস্পরের যথেষ্ট কাছাকাছি আসে তা হলে আবার হিসেব সমান করে নেয়। অসাম্য ঘুচলে তখন বৈদ্যুতধর্মের চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে যায়। স্বভাবত হীলিয়ম পরমাণুর থাকে দুটো ইলেকট্রন। কিন্তু রেডিয়ম থেকে আল্‌ফাকণারূপে নিঃসৃত হয়ে সে যখন অন্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে ছুটতে থাকে তখনকার মতো তার সঙ্গী দুটো যায় ছিন্ন হয়ে। অবশেষে উপদ্রবের অন্ত হলে ছুটো ইলেকট্রনদের মধ্যে থেকে অভাব পূরণ করে নিয়ে স্বধর্মে ফিরে আসে।

এইখানে আর-একটা কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করে দেওয়া যাক। সকল বস্তুরই পরমাণুর ইলেকট্রন প্রোটন ও ন্যুট্রন একই পদার্থ। তাদেরই ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বস্তুর ভেদ। যে-পরমাণুর আছে মোট ছয়টা পজিটিভ চার্জ সেই হল কার্বনের অর্থাৎ আঙ্গারিক বস্তুর পরমাণু। সাতটা ইলেকট্রনওয়ালা পরমাণু নাইট্রজেনের, আটটা অক্সিজেনের। কেবল হাইড্রজেন পরমাণুর আছে একটা ইলেকট্রন। আর বিরেনব্বইটা আছে য়ুরেনিয়মের। পরমাণুদের মধ্যে পজিটিভ চার্জের সংখ্যাভেদ নিয়েই তাদের জাতিভেদ। সৃষ্টির সমস্ত বৈচিত্র্য এই সংখ্যার ছন্দে।

বৈদ্যুতসন্ধানীরা যখন আপন কাজে নিযুক্ত আছেন তখন তাদের হিসাবে গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ একটা অজানা শক্তির অস্তিত্ব ধরা দিল। তার বিকিরণকে নাম দেওয়া হল মহাজাগতিক রশ্মি, কস্‌মিক রশ্মি। বলা যেতে পারে আকস্মিক রশ্মি। কোথা থেকে আসছে বোঝা গেল না কিন্তু দেখা গেল সর্বত্রই। কোনো বস্তু বা কোনো জীব নেই যার উপরে এর করক্ষেপ চলছে না। এমন কি ধাতুদ্রব্যের পরমাণুগুলোকে ঘা মেরে উত্তেজিত করে দিচ্ছে। হয়তো এরা জীবের প্রাণশক্তির সাহায্য করছে, কিংবা বিনাশ করছে— কী করছে জানা নেই, আঘাত করছে এইটেই নিঃসংশয়।

এই যে ক্রমাগতই কস্‌মিকরশ্মি-বর্ষণ চলেছে এর উৎপত্তির রহস্য অজানা রয়ে গেল। কিন্তু জানা গেছে বিপুল এর উদ্যম, সমস্ত আকাশ জুড়ে এর সঞ্চরণ, জলে স্থলে আকাশে সকল পদার্থেই এর প্রবেশ। এই মহা আগন্তুকের পিছনে বিজ্ঞানের চর লেগেই আছে, কোন্‌ দিন এর গোপন ঠিকানা ধরা পড়বে।

অনেকে বলেন কস্‌মিক আলো আলোই বটে, র‍্যাণ্টগেন রশ্মির চেয়ে বহুগুণে

জোরালো। তাই এরা সহজে পুরু সীসে বা মোটা সানার পাত পার হয়ে চলে যায়। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এটুকু জানা গেছে এই আলোর সঙ্গে আছে বৈদ্যুতকণা। পৃথিবীর যে ক্ষেত্রে চৌম্বকশক্তি বেশি এরা তারই টানে আপন পথ থেকে সরে গিয়ে মেরুপ্রদেশে জমা হয়, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কস্‌মিক রশ্মির সমাবেশের কমিবেশি দেখা যায়।

কস্‌মিক রশ্মির সম্বন্ধে এখনও নানা মতের আনাগোনা চলেইছে। পরমাণুর নূতন তত্ত্বের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞানমহলে মননের ও মতের তোলাপাড়ার অন্ত নেই, বিশ্বের মূল কারখানার ব্যবস্থায় ধ্রুবত্বের পাকা সংকেত-খুঁজে বের করা অসাধ্য হল। নিত্য ব'লে যদি কিছু খ্যাতি পেতে পারে তবে সে কেবল এক আদিজ্যোতি, যা রয়েছে সবকিছুরই ভূমিকায়, যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র্য।

নক্ষত্রলোক

এই তো দেখা গেল বিশ্বব্যাপী অরূপ বৈদ্যুতলোক। এদের সম্মিলনের দ্বারা প্রকাশবান রূপলোক গ্রহনক্ষত্রে।

গোড়াতেই বলে রাখি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসল চেহারা কী জানবার জো নেই। বিশ্বপদার্থের নিতান্ত অল্পই আমাদের চোখে পড়ে। তা ছাড়া আমাদের চোখ কান স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিজের বিশেষত্ব আছে। তাই বিশ্বের পদার্থগুলি বিশেষ ভাবে বিশেষ রূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়। ঢেউ লাগে চোখে, দেখি আলো। আরও সূক্ষ্ম বা আরও স্থূল ঢেউ সম্বন্ধে আমরা কানা। দেখাটা নিতান্ত অল্প, না-দেখাটাই অত্যন্ত বেশি। পৃথিবীর কাজ চালাব বলেই সেই অনুযায়ী আমাদের চোখ কান, আমরা যে বিজ্ঞানী হব প্রকৃতি সে খেয়ালই করে নি। মানুষের চোখ অণুবীক্ষণ ও দুরবীন এই দুইএর কাজই সামান্য পরিমাণে করে থাকে। বোধের সীমা বাড়লে বা বোধের প্রকৃতি অন্য রকম হলে আমাদের জগৎটাও হত অন্য রকম।

বিজ্ঞানীর কাছে সেই অন্য রকমই তো হয়েছে। এতই অন্য রকমের যে, যে-ভাষায় আমরা কাজ চালাই এ জগতের পরিচয়ে তার অনেকখানিই কাজে লাগে না। প্রত্যহ এমন চিহ্নওয়ালা ভাষা তৈরি করতে হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে না।

একদিন মানুষ ঠিক করেছিল বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রে পৃথিবীর আসন অবিচলিত, তাকে প্রদক্ষিণ করছে সূর্যনক্ষত্র। মনে যে করেছিল, সে জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না— সে দেখেছিল পৃথিবী-দেখা সহজ চোখে। আজ তার চোখ বেড়ে গেছে, বিশ্ব-দেখা চোখ বানিয়ে নিয়েছে। ধরে নিতে হয়েছে পৃথিবীকেই ছুটতে হয় সূর্যের চার দিকে, দরবেশি নাচের মতো পাক খেতে খেতে। পথ সুদীর্ঘ, লাগে ৩৬৫ দিনের কিছু বেশি। এর চেয়ে বড়ো পথওয়ালা গ্রহ আছে, তারা ঘুরতে এত বেশি সময় নেয় যে ততদিন বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের পরমায়ুর বছর বাড়াতে হবে।

রাত্রের আকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় লেপে দেওয়া আলো। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা। এদের মধ্যে কতকগুলি সুদূরবিস্তৃত অতি হালকা গ্যাসের মেঘ, আবার কতকগুলি নক্ষত্রের সমাবেশ। দুরবীনে এবং ক্যামেরার যোগে জানা গেছে যে, যে-ভিড় নিয়ে এই শেষোক্ত নীহারিকা, তাতে যত নক্ষত্র জমা হয়েছে, বহু কোটি তার সংখ্যা, অদ্ভুত দ্রুত তাদের গতি। এই যে নক্ষত্রের ভিড় নীহারিকামণ্ডলে অতি দ্রুতবেগে ছুটছে, এরা পরস্পর ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায় না কেন। উত্তর দিতে গিয়ে চৈতন্য হল এই নক্ষত্রপুঞ্জকে ভিড় বলা ভুল হয়েছে। এদের মধ্যে গলাগলি ঘেঁষাঘেঁষি একেবারেই নেই। পরস্পরের কাছ থেকে অত্যন্তই দূরে দূরে এরা চলাফেরা করছে। পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রনদের গতিপথের দূরত্ব সম্বন্ধে স্যর জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ যে উপমা দিয়েছেন এই নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধেও অনুরূপ উপমাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। লণ্ডনে ওয়াটর্লু নামে এক মস্ত স্টেশন আছে। যতদূর মনে পড়ে সেটা হাওড়া স্টেশনের চেয়ে বড়োই। স্যর জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ বলেন সেই স্টেশন থেকে আর-সব খালি করে ফেলে কেবল ছ'টি মাত্র ধুলোর কণা যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে আকাশে নক্ষত্রদের পরস্পর দূরত্ব এই ধূলিকণাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে তুলনীয় হতে পারবে। তিনি বলেন, নক্ষত্রের সংখ্যা ও আয়তন যতই হোক আকাশের অচিন্তনীয় শূন্যতার সঙ্গে তার তুলনাই হতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, সৃষ্টিতে রূপবৈচিত্র্যের পালা আরম্ভ হবার অনেক আগে কেবল ছিল একটা পরিব্যাপ্ত জলন্ত বাষ্প। গরম জিনিস মাত্রেরই ধর্ম এই যে ক্রমে ক্রমে সে তাপ ছড়াতে থাকে। ফুটন্ত জল প্রথমে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হতে হতে সেই বাষ্প জমে হয় জলের কণা। অত্যন্ত তাপ দিলে কঠিন পদার্থও ক্রমে যায় গ্যাস হয়ে; সেই রকম তাপের অবস্থায় বিশ্বের হালকা ভারি সব জিনিসই ছিল গ্যাস। কোটি কোটি বছর ধরে কালে কালে তা ঠাণ্ডা হচ্ছে। তাপ কমতে কমতে গ্যাস থেকে ছোটো ছোটো টুকরো ঘন হয়ে ভেঙে পড়েছে। এই বিপুলসংখ্যক কণা

তারার আকারে জোট বেঁধে নীহারিকা গড়ে তুলছে। য়ুরোপীয় ভাষায় এদের বলে নেব্যুলা, বহুবচনে নেব্যুলী। আমাদের সূর্য আছে এই রকম একটি নীহারিকার অন্তর্গত হয়ে।

আমেরিকার পর্বতচূড়ায় বসানো হয়েছে মস্ত বড়ো এক দূরবীন, তার ভিতর দিয়ে খুব বড়ো এক নীহারিকা দেখা গেছে। সে আছে অ্যাণ্ড্রমিডা নামধারী নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে। ঐ নীহারিকার আকার অনেকটা গাড়ির চাকার মতো। সেই চাকা ঘুরছে। এক পাক ঘোরা শেষ করতে তার লাগে প্রায় দু কোটি বছর। নয় লাখ বছর লাগে এর কাছ থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে।

আমাদের সব চেয়ে কাছের যে তারা, যাকে আমাদের তারা-পাড়ার পড়শী বললে চলে, সংখ্যা সাজিয়ে তার দূরত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। সংখ্যাবাঁধা যে-পরিমাণ দূরত্ব মোটামুটি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ, তার সীমা পৃথিবীর গোলকটির মধ্যেই বদ্ধ, যাকে আমরা রেলগাড়ি দিয়ে মোটর দিয়ে স্টীমার দিয়ে চলতে চলতে মেপে যাই। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্র-বস্তির সীমানা মাড়ালেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপ বলে মনে হয়। গণিতশাস্ত্র নাক্ষত্রিক হিসাবটার উপর দিয়ে সংখ্যার যে-ডিম পেড়ে চলে সে যেন পৃথিবীর বহুপ্রসূ কীটেরই নকলে।

সাধারণত আমরা দূরত্ব গনি মাইল বা ক্রোশ হিসাবে, নক্ষত্রদের সম্বন্ধে তা করতে গেলে অঙ্কের বোঝা দুর্বহ হয়ে উঠবে। সূর্যই তো আমাদের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে, তার চেয়ে বহু লক্ষগুণ দূরে আছে নক্ষত্রের দল, সংখ্যা দিয়ে তাদের দূরত্ব গোনা কড়ি দিয়ে হাজার হাজার মোহর গোনার মতো। সংখ্যা-সংকেত বানিয়ে মানুষ লেখনের বোঝা হালকা করেছে, হাজার লিখতে তাকে হাজারটা দাঁড়ি কাটতে হয় না। কিন্তু জ্যোতিষ্কলোকের মাপ এ সংকেতে কুলোল না। তাই আর-এক সংকেত বেরিয়েছে। তাকে বলা যায় আলো-চলার মাপ। ৩৬৬ দিনের বছর হিসাবে সে চলে পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার কোটি মাইল। সূর্যপ্রদক্ষিণের যেমন সৌর বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের পরিমাপে, তেমনি নক্ষত্রদের গতিবিধি, তাদের সীমা-সরহদ্দের মাপ, আলো-চলা বছরের মাত্রা গণনা ক'রে। আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাস আন্দাজ একলক্ষ আলো-বছরের মাপে। আরও অনেক লক্ষ নাক্ষত্রজগৎ আছে এর বাইরে। সেইসব ভিন্ন গাঁয়ের নক্ষত্রদের মধ্যে একটির পরিচয় ফোটোগ্রাফে ধরা হয়েছে, হিসেব মতে সে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ আলো-বছর দূরে। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্রের দূরত্ব পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। এর থেকে বোঝা যাবে কী বিপুল শূন্যতার মধ্যে বিশ্ব ভাসছে। আজকাল শুনতে পাই পৃথিবীতে স্থানাভাব নিয়েই লড়াই বাধে। নক্ষত্রদের

মাঝখানে কিছুমাত্র যদি জায়গার টানাটানি থাকত তা হলে সর্বনেশে ঠোকাঠুকিতে বিশ্ব যেত চুরমার হয়ে।

চোখে দেখার যুগ থেকে এল দুরবীনের যুগ। দুরবীনের জোর বাড়তে বাড়তে বেড়ে চলল দ্যুলোকে আমাদের দৃষ্টির পরিধি। পূর্বে যেখানে ফাঁক দেখেছি সেখানে দেখা দিল নক্ষত্রের ঝাঁক। তবু বাকি রইল অনেক। বাকি থাকবারই কথা। আমাদের নাক্ষত্রজগতের বাইরে এমনসব জগৎ আছে যাদের আলো দুরবীনদৃষ্টিরও অতীত। একটা বাতির শিখা ৮৫৭৫ মাইল দূরে যেটুকু দীপ্তি দেয় এমনতরো আভাকে দুরবীন যোগে ধরবার চেষ্টায় হার মানলে মানুষের চক্ষু। দুরবীন আপন শক্তি অনুসারে খবর এনে দেয় চোখে, চোখের যদি শক্তি না থাকে সেই অতিক্ষীণ খবরটুকু বোধের কোঠায় চালান করে দিতে, তা হলে আর উপায় থাকে না। কিন্তু ফোটোগ্রাফ-ফলকের আলো-ধরা শক্তি চোখের শক্তির চেয়ে ঢের বেশি স্থায়ী। সেই শক্তির উদ্বোধন করলে বিজ্ঞান, দূরতম আকাশে জাল ফেলবার কাজে লাগিয়ে দিলে ফোটোগ্রাফ। এমন ফোটোগ্রাফি বানালে যা অন্ধকারে-মুখঢাকা আলোর উপর সমন জারি করতে পারে। দুরবীনের সঙ্গে ফোটোগ্রাফি, ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বর্ণলিপিযন্ত্র জুড়ে দিলে। সম্প্রতি এর শক্তি আরও বিচিত্র ক'রে তুলে দেওয়া হয়েছে। সূর্যে নানা পদার্থ গ্যাস হয়ে জ্বলছে। তারা সকলে একসঙ্গে মিলে যখন দেখা দেয় তখন ওদের তন্ন তন্ন করে দেখা সম্ভব হয় না। সেইজন্যে এক আমেরিকান বিজ্ঞানী সূর্য-দেখা দুরবীন বানিয়েছেন যাতে জ্বলন্ত গ্যাসের সব রকম রঙ থেকে এক-একটি রঙের আলো ছাড়িয়ে নিয়ে তার সাহায্যে সূর্যের সেই বিশেষ গ্যাসীয় রূপ দেখা সম্ভব হয়েছে। ইচ্ছামতো কেবলমাত্র জ্বলন্ত ক্যালসিয়মের রঙ কিংবা জ্বলন্ত হাইড্রজেনের রঙে সূর্যকে দেখতে পেলে তার গ্যাসীয় অগ্নিকাণ্ডের অনেক খবর মেলে যা আর কোনো উপায়ে পাওয়া যায় না।

সাদা আলো ভাগ করতে পারলে তার বর্ণসপ্তকের একদিকে পাওয়া যায় লাল অন্যদিকে বেগনি— এই দুই সীমাকে ছাড়িয়ে চলেছে যে আলো সে আমাদের চোখে পড়ে না।

ঘন নীলরঙের আলোর ঢেউয়ের পরিমাপ এক ইঞ্চির দেড়কোটি ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ এই আলোর রঙে যে ঢেউ খেলে তার একটা ঢেউয়ের চূড়া থেকে পরবর্তী ঢেউয়ের চূড়ার মাপ এই। এক ইঞ্চির মধ্যে রয়েছে দেড়কোটি ঢেউ। লাল রঙের আলোর ঢেউ প্রায় এর দ্বিগুণ লম্বা। একটা তপ্ত লোহার জ্বলন্ত লাল আলো যখন ক্রমেই নিভে আসে, আর দেখা যায় না, তখনও আরও বড়ো মাপের অদৃশ্য আলো

তার থেকে ঢেউ দিয়ে উঠতে থাকে। আমাদের দৃষ্টিকে সে যদি জাগিয়ে তুলতে পারত তা হলে সেই লাল-উজানি রঙের আলোয় আমরা নিভে-আসা লোহাকে দেখতে পেতুম, তা হলে গরমিকালের সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে রৌদ্র মিলিয়ে গেলেও লাল-উজানি আলোয় গ্রীষ্মতপ্ত পৃথিবী আমাদের কাছে আভাসিত হয়ে দেখা দিত।

একান্ত অন্ধকার ব'লে কিছুই নেই। যাদের আমরা দেখতে পাই নে তাদেরও আলো আছে। নক্ষত্রলোকের বাহিরের নিবিড়-কালো আকাশেও অনবরত নানাবিধ কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছে। এইসকল অদৃশ্য দূতকেও দৃশ্যপটে তুলে তাদের কাছ থেকে গোপন অস্তিত্বের খবর আদায় করতে পারছি এই বর্ণলিপিযুক্ত দুরবীন-ফোটোগ্রাফের সাহায্যে।

বেগনি-পারের আলো জ্যোতিষীদের কাছে লাল-উজানি আলোর মতো এত বেশি কাজে লাগে না। তার কারণ এই খাটো ঢেউয়ের আলোর অনেকখানি পৃথিবীর হাওয়া পেরিয়ে আসতে নষ্ট হয়, দূরলোকের খবর দেবার কাজে লাগে না। এরা খবর দেয় পরমাণুলোকের। একটা বিশেষ পরিমাণ উত্তেজনায় পরমাণু সাদা আলোয় স্পন্দিত হয়। তেজ আরও বাড়লে দেখা দেয় বেগনি-পারের আলো। অবশেষে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু যখন বিচলিত হতে থাকে তখন সেই প্রবল উত্তেজনায় বের হয় আরও খাটো ঢেউ যাদের বলি গামা রশ্মি। মানুষ তার যন্ত্রের শক্তি এতদূর বাড়িয়ে তুলেছে যে এক্স-রশ্মি বা গামা-রশ্মির মতো রশ্মিকে মানুষ ব্যবহার করতে পারে।

যে কথা বলতে যাচ্ছিলুম সে হচ্ছে এই যে, বর্ণলিপি-বাঁধা দুরবীন-ফোটোগ্রাফ দিয়ে মানুষ নক্ষত্রবিশ্বের অতি দূর অদৃশ্য লোককে দৃষ্টিপথে এনেছে। আমাদের আপন নাক্ষত্রলোকের সুদূর বাইরে আরও অনেক নাক্ষত্রলোকের ঠিকানা পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, নক্ষত্রেরা যে সবাই মিলে আমাদের নাক্ষত্র-আকাশে এবং দূরতর আকাশে ঘুর খাচ্ছে তাও ধরা পড়েছে এই যন্ত্রের দৃষ্টিতে।

দূর আকাশের কোনো জ্যোতির্ময় গ্যাসের পিণ্ড, যাকে বলে নক্ষত্র, যখন সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে কিংবা পিছিয়ে যায় তখন আমাদের দৃষ্টিতে একটা বিশেষত্ব ঘটে। ঐ পদার্থটি স্থির থাকলে যে-পরিমাণ দৈর্ঘ্যের আলোর ঢেউ আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছিয়ে দিতে পারত কাছে এলে তার চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের ধারণা জন্মায়, দূরে গেলে তার চেয়ে বেশি। যেসব আলোর ঢেউ দৈর্ঘ্যে কম, তাদের রঙ ফোটে বর্ণসপ্তকের বেগনির দিকে, আর যারা দৈর্ঘ্যে বেশি তারা পৌঁছয় লাল রঙের কিনারায়। এই কারণে নক্ষত্রের কাছে-আসা দূরে-যাওয়ার সংকেত ভিন্ন রঙের

সিগন্যালে জানিয়ে দেয় বর্ণলিপি। শিঙে বাজিয়ে রেলগাড়ি পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় কানে তার আওয়াজ পূর্বের চেয়ে চড়া ঠেকে। কেননা শৃঙ্গধ্বনি বাতাসে যে ঢেউ-তোলা আওয়াজ আমাদের কানে বাজায়, গাড়ি কাছে এলে সেই ঢেউগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে কানে চড়া সুরের অনুভূতি জাগায়। আলোতে চড়া রঙের সপ্তক বেগনির দিকে।

কোনো কোনো গ্যাসীয় নীহারিকার যে উজ্জ্বলতা সে তার আপন আলোতে নয়। যে নক্ষত্রগুলি তাদের মধ্যে ভিড় করে আছে তারাই ওদের আলোকিত করেছে। আবার কোথাও নীহারিকার পরমাণুগুলি নক্ষত্রের আলোককে নিজেরা শুষে নিয়ে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোতে তাকে চালান করে।

নীহারিকার আর-একটি বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তার মাঝে মাঝে মেঘের মতো কালো কালো লেপ দেওয়া আছে, নিবিড়তম তারার ভিড়ের মধ্যে এক এক জায়গায় কালো ফাঁক। জ্যোতিষী বার্নার্ডের পর্যবেক্ষণে এমনতরো প্রায় দুশোটা কালো আকাশ-প্রদেশ দেখা দিয়েছে। বার্নার্ড অনুমান করেন এগুলি অস্বচ্ছ গ্যাসের মেঘ, ওর পিছনের তারাগুলিকে ঢেকে রেখেছে। কোনোটা কাছে, কোনোটা দূরে, কোনোটা ছোটো, কোনোটা প্রকাণ্ড বড়ো।

নক্ষত্রলোকের অন্তবর্তী আকাশে যে বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে তার নিবিড়তা হিসাব করলে জানা যায় যে সে অত্যন্ত কম, প্রত্যেক ঘন-ইঞ্চিতে আধ ডজন মাত্র পরমাণু। সে যে কত কম এই বিচার করলে বোঝা যাবে যে, বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে সব চেয়ে জোরের পাম্প দিয়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি করা হয় তার মধ্যেও ঘনইঞ্চিতে বহু কোটি পরমাণু বাকি থেকে যায়।

আমাদের আপন নাক্ষত্রলোকটি প্রকাণ্ড একটা চ্যাপটা ঘুরপাক-খাওয়া জগৎ, বহু শত কোটি নক্ষত্রে পূর্ণ। তাদের মধ্যে মধ্যে যে আকাশ তাতে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস কোথাও বা অত্যন্ত বিরল, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত ঘন, কোথাও বা উজ্জ্বল, কোথাও বা অস্বচ্ছ। সূর্য আছে এই নাক্ষত্রলোকের কেন্দ্র থেকে তার ব্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দূরে, একটা নাক্ষত্রমেঘের মধ্যে। নক্ষত্রগুলির বেশি ভিড় নীহারিকার কেন্দ্রের কাছে।

অ্যাণ্টারীজ নক্ষত্রের ব্যাস উনচল্লিশ কোটি মাইল, আর সূর্যের ব্যাস আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার মাইল। সূর্য মাঝারি বহরের তারা বলেই গণ্য। যে নাক্ষত্রজগতের একটি মধ্যবিত্ত তারা এই সূর্য, তার মতো এমন আরও আছে লক্ষ লক্ষ জগৎ। সব নিয়ে এই যে ব্রহ্মাণ্ড কোথায় তার সীমা তা আমরা জানি নে।

আমাদের সূর্য তার সব গ্রহগুলিকে নিয়ে ঘুর খাচ্ছে আর তার সঙ্গেই ঘুরছে এই

নাক্ষত্রচক্রবর্তীর সব তারাই, একটি কেন্দ্রের চার দিকে। এই মহলে সূর্যের ঘূর্ণিপাকের গতিবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল। চলতি চাকার থেকে ছিটকে-পড়া কাদার মতোই সে ঘোরার বেগে নাক্ষত্রচক্র থেকে ছিটকে পড়ত ; এই চক্রের হাজার কোটি নক্ষত্র ওকে টেনে রাখছে, সীমার বাইরে যেতে দেয় না।

এই টানের শক্তির খবরটা নিশ্চয়ই পাঠকদের জানা তবু সেটা এই বিশ্ববর্ণনা থেকে বাদ দিলে চলবে না।

সত্য হোক মিথ্যে হোক একটা গল্প চলিত আছে যে, বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ন্যুটন একদিন দেখতে পেলেন একটা আপেল ফল গাছ থেকে পড়ল, তখনই তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল ফলটা নিচেই বা পড়ে কেন, উপরেই বা যায় না কেন উড়ে। তাঁর মনে আরও অনেক প্রশ্ন ঘুরছিল। ভাবছিলেন চাঁদ কিসের টানে পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে, পৃথিবীই বা কিসের টানে ঘুরছে সূর্যের চার দিকে। ফল পড়ার ব্যাপারে তিনি বুঝলেন একটা টান দেবার শক্তি আছে এই পৃথিবীর। সব-কিছুকে সে নিজের ভিতরের দিকে টানছে। তাই যদি হবে তবে চন্দ্রকেই বা সে ছাড়বে কেন। নিশ্চয়ই এই শক্তিটা দূরে কাছে এমন জিনিস নেই যাকে টানবে না। ভাবনাটা ক্রমেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারা গেল একা পৃথিবী নয় সব-কিছুই টানে সব-কিছুকে। যার মধ্যে যতটা আছে বস্তু, তার টানবার জোর ততটা। তা ছাড়া দূরত্বের কম-বেশিতে এই টানের জোরও বাড়ে-কমে। দূরত্ব দ্বিগুণ বাড়ে যদি, টান কমে যায় চার গুণ, চার গুণ বাড়লে টান কমবে ষোলো গুণ। এ না হলে সূর্যের টানে পৃথিবীর যা-কিছু সম্বল সব লুঠ হয়ে যেত। এই টানাটানির পালোয়ানিতে কাছের জিনিসের 'পরে পৃথিবীর জিত রয়ে গেল। ন্যুটনের মৃত্যুর বছর-সত্তর পরে আর-একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী লর্ড ক্যাভেণ্ডিশ তাঁর পরখ করবার ঘরে দুটো সীসের গোলা ঝুলিয়ে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়েছেন তারা ঠিক নিয়ম মেনেই পরস্পরকে টানছে। এই নিয়মের হিসাবটি বাঁচিয়ে আমিও এই লেখার টেবিলে বসে সব-কিছুকেই টানছি। পৃথিবীকে, চন্দ্রকে, সূর্যকে, বিশ্বে যত তারা আছে তার প্রত্যেকটাকেই। যে পিঁপড়েটা এসেছে আমার ঘরের কোণে আহারের খোঁজে তাকেও টানছি ; সেও দূর থেকে দিচ্ছে আমায় টান, বলা বাহুল্য আমাকে বিশেষ ব্যস্ত করতে পারে নি। আমার টানে ওরও তেমন ভাবনার কারণ ঘটল না। পৃথিবী এই আঁকড়ে ধরার জোরে অসুবিধা ঘটিয়েছে অনেক। চলতে গেলে পা তোলার দরকার। কিন্তু পৃথিবী টানে তাকে নিচের দিকে ; দূরে যেতে হাঁপিয়ে পড়ি সময়ও লাগে বিস্তর। এই টেনে রাখার ব্যবস্থা গাছপালার পক্ষে খুবই ভালো। কিন্তু মানুষের পক্ষে একেবারেই নয়। তাই জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল

পর্যন্ত এই টানের সঙ্গে মানুষকে লড়াই করে চলতে হয়েছে। অনেক আগেই সে আকাশে উড়তে পারত কিন্তু পৃথিবী কিছুতেই তাকে মাটি ছাড়তে দিতে চায় না। এই চব্বিশঘণ্টা টানের থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে মানুষ কল বানিয়েছে বিস্তর— এতে পৃথিবীকে কিছু ফাঁকি দেওয়া চলে— সম্পূর্ণ না। কিন্তু এই টানকে নমস্কার করি যখন জানি, পৃথিবী হঠাৎ যদি তার টান আলগা করে তা হলে যে ভীষণ বেগে পৃথিবী পাক খাচ্ছে তাতে আমরা তার পিঠের উপর থেকে কোথায় ছিটকে পড়ি তার ঠিকানা থাকে না। বস্তুত পৃথিবীর টানটা এমন ঠিক মাপে হয়েছে যাতে আমরা চলতে পারি অথচ পৃথিবী ছাড়তে পারি নে।

বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতকণার যুগলমিলনে যে সৃষ্টি হল সেই জগৎটার মধ্যে সর্বব্যাপী দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া, চলা আর টানা, মুক্তি আর বন্ধন। একদিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহা দৌড় আর-একদিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহা টান। সবই চলছে আর সবই টানছে। চলাটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে। আর টানটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে। আজকের বিজ্ঞানে বস্তুর বস্তুত্ব এসেছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে, সব চেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে চলা আর টানা। চলা যদি একা থাকত তা হলে চলন হত একেবারে সিধে রাস্তায় অন্তহীনে। টানা তাকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনছে অন্তবানে, ঘোরাচ্ছে চক্রপথে। সূর্য এবং গ্রহের মধ্যে আছে বহুলক্ষ মাইল ফাঁকা, সেই দূরত্বের শূন্য পার হয়ে নিরন্তর চলেছে অশরীরী টানের শক্তি, অদৃশ্য লাগামে বেঁধে গ্রহগুলোকে ঘোরাচ্ছে সার্কাসের ঘোড়ার মতো। এদিকে সূর্যও ঘুরছে বহুকোটি ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্রে-তৈরি এক মহা জ্যোতিশ্চক্রের টানে। বিশ্বের অণীয়সী গতিশক্তির দিকে তাকাও সেখানেও বিরাট চলা-টানার একই ছন্দের লীলা। সূর্য আর গ্রহের মাঝখানের যে দূরত্ব, তুলনা করলে দেখা যাবে অতিপরমাণু জগতে প্রোটন ইলেকট্রনের মধ্যেকার দূরত্ব কম-বেশি সেই পরিমাণে। টানের জোর সেই শূন্যকে পেরিয়ে নিত্যকাল বাঁধা পথে ঘোরাচ্ছে ইলেকট্রনের দলকে। গতি আর সংযমের অসীম সামঞ্জস্য নিয়ে সব-কিছু। এইখানে বলে রাখা দরকার, ইলেকট্রন প্রোটনের টানাটানি মহাকর্ষের নয়, সেটা বৈদ্যুত টানের। পরমাণুদের অন্তরের টানটা বৈদ্যুতের টান, বাহিরের টানটা মহাকর্ষের, যেমন মানুষের ঘরের টানটা আত্মীয়তার, বাইরের টানটা সমাজের।

মহাকর্ষ সম্বন্ধে এই যে মতের আলোচনা করা গেল ন্যুটনের সময় থেকে এটা চলে আসছে। এর থেকে আমাদের মনে এই একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, দুই বস্তুর মাঝখানের অবকাশের ভিতর দিয়ে একটা অদৃশ্য শক্তি টানাটানি করছে।

কিন্তু এই ছবিটা মনে আনবার কিছু বাধা আছে। মহাকর্ষের ক্রিয়া একটুও সময়

নেয় না। আকাশ পেরিয়ে আলো আসতে সময় লাগে সেকথা পূর্বে বলেছি। বৈদ্যুতিক শক্তিরাও ঢেউ খেলিয়ে আসে আকাশের ভিতর দিয়ে। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও মহাকর্ষের বেলায় সে রকম সময় নিয়ে চলার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রভাব তাৎক্ষণিক। আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আলো বা উত্তাপ পথের বাধা মানে কিন্তু মহাকর্ষ তা মানে না। একটা জিনিসকে আকাশে ঝুলিয়ে রেখে পৃথিবী আর তার মাঝখানে যত বাধাই রাখা যাক না তার ওজন কমে না। ব্যবহারে অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায় না।

অবশেষে আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারেই প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে-আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়। এমনকি আলোককেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়। তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বোঝার পক্ষে টানের ছবি সহজ ছিল কিন্তু যে নূতন জ্যামিতির সাহায্যে এই বাঁকা আকাশের ঝোঁক হিসেব ক'রে জানা যায় সে কজন লোকেরই বা আয়ত্তে আছে।

যাই হোক ইংরেজিতে যাকে গ্র্যাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না ব'লে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।

আমাদের এই যে নাক্ষত্রজগৎ, এ যেন বিরাট শূন্য আকাশের দ্বীপের মতো। এখান থেকে দেখা যায় দূরে দূরে আরও অনেক নাক্ষত্রদ্বীপ। এই দ্বীপগুলির মধ্যে সব চেয়ে আমাদের নিকটের যেটি, তাকে দেখা যায় অ্যাণ্ড্রমিডা নক্ষত্র দলের কাছে। দেখতে একটা ঝাপসা তারার মতো। সেখান থেকে যে আলো চোখে পড়ছে সে যাত্রা করে বেরিয়েছে ন লক্ষ বছর পূর্বে। কুণ্ডলীচক্র-পাকানো নীহারিকা আরও আছে আরও দূরে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে দূরবর্তীর সম্বন্ধে হিসাবে স্থির হয়েছে যে, সে আছে তিন হাজার লক্ষ আলো-বছর দূরত্বের পথে। বহুকোটি নক্ষত্র-জড়ো-করা এইসব নাক্ষত্রজগতের সংখ্যা একশো কোটির কম হবে না।

একটা আশ্চর্যের কথা উঠেছে এই যে কাছের দুটো তিনটে ছাড়া বাকি নাক্ষত্রজগৎগুলো আমাদের জগতের কাছ থেকে কেবলই সরে চলেছে। যেগুলি যত বেশি দূরে তাদের দৌড়-বেগও তত বেশি। এইসব নাক্ষত্রজগতের সমষ্টি নিয়ে যে বিশ্বকে আমরা জানি, কোনো কোনো পণ্ডিত ঠিক করেছেন সে ক্রমশই ফুলে উঠছে। সুতরাং যতই ফুলছে ততই নক্ষত্রপুঞ্জের পরস্পরের দূরত্ব যাচ্ছে বেড়ে। যে-বেগে

তা'রা সরছে তাতে আর একশো ত্রিশ কোটি বছর পরে তাদের পরস্পরের দূরত্ব এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ হবে।

অর্থাৎ এই পৃথিবীর ভূগঠনের সময়ের মধ্যে নক্ষত্রবিশ্ব আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ ফেঁপে গিয়েছে।

শুধু এই নয়, একদল বিজ্ঞানীর মতে এই বস্তুপুঞ্জসংঘটিত বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গোলকরূপী আকাশটাও বিস্ফারিত হয়ে চলেছে। এঁদের মতে আকাশের কোনো-এক বিন্দু থেকে সিধে লাইন টানলে সে লাইন অসীমে চলে না গিয়ে ঘুরে এসে এক সময়ে সেই প্রথম বিন্দুতে এসে পৌঁছয়। এই মত অনুসারে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আকাশ-গোলকে নক্ষত্রজগৎগুলি আছে, যেমন আছে পৃথিবী-গোলককে ঘিরে জীবজন্তু গাছপালা। সুতরাং বিশ্বজগৎটার ফেঁপে-ওঠা সেই আকাশমণ্ডলেরই বিস্ফারণের মাপে। কিন্তু মতের স্থিরতা হয় নি এ কথা মনে রাখা উচিত; আকাশ অসীম, কালও নিরবধি, এই মতটাও মরে নি। আকাশটাও বুদ্‌বুদ কি না এই প্রসঙ্গে আমাদের শাস্ত্রের মত এই যে সৃষ্টি চলেছে প্রলয়ের দিকে। সেই প্রলয়ের থেকে আবার নূতন সৃষ্টি উদ্ভাসিত হচ্ছে, ঘুম আর জাগার পালার মতো। অনাদিকাল থেকে সৃষ্টি ও প্রলয়ের পর্যায় দিন ও রাত্রির মতো বারে বারে ফিরে ফিরে আসছে, তার আদিও নেই অন্তও নেই, এই কল্পনাই মনে আনা সহজ।

পর্সিয়ুস রাশিতে অ্যালগল নামে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। তার উজ্জ্বলতা স্থির থাকে ষাট ঘণ্টা। তার পরে পাঁচ ঘণ্টার শেষে তার প্রভা কমে যায় এক-তৃতীয়াংশ। আবার উজ্জ্বল হতে শুরু করে। পাঁচ ঘণ্টা পরে পূর্ণ উজ্জ্বলতা পায়, সেই ভরা ঐশ্বর্য থাকে ষাট ঘণ্টা। এইরকম উজ্জ্বলতার কারণ ঘটায় ওর জুড়ি নক্ষত্র। প্রদক্ষিণের সময় ক্ষণে ক্ষণে গ্রহণ লাগে গ্রহণ ছাড়ে।

আর-একদল তারা আছে তাদের দীপ্তি বাইরের কোনো কারণ থেকে নয়, কিন্তু ভিতরেরই কোনো জোয়ার ভাঁটায় একবার কমে একবার বাড়ে। কিছুদিন ধরে সমস্ত তারাটা হয়ে যায় বিস্ফারিত, আবার ক্রমে যায় সংকুচিত হয়ে। তার আলোটা যেন নাড়ির দব্‌দবানি। সিফিউস নক্ষত্রমণ্ডলীতে এইসব তারা প্রথম খুঁজে পাওয়া গেছে ব'লে এদের নাম হয়েছে সিফাইড্‌স্। এদের খোঁজ পাওয়ার পর থেকে নাক্ষত্রজগতের দূরত্ব বের করার একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে।

আরও একদল নক্ষত্রের কথা বলবার আছে, তারা নাম পেয়েছে নতুন নক্ষত্র। তাদের আলো হঠাৎ অতিক্রত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অনেক হাজার গুণ থেকে অনেক লক্ষ গুণ পর্যন্ত। তার পরে ধীরে ধীরে অত্যন্ত ম্লান হয়ে যায়। এক কালে এই

হঠাৎ-জলে ওঠা তারাদের আবির্ভাবকে নতুন আবির্ভাব মনে করে এদের নাম দেওয়া হয়েছিল নতুন তারা।

কিছুকাল পূর্বে লাসের্টা অর্থাৎ গোধিকা নামধারী নক্ষত্ররাশির কাছে একটি, যাকে বলে নতুন তারা, হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। পরে পরে চারটে জ্যোতির খোলস দিলে ছেড়ে। দেখা গেল ছাড়া খোলস দৌড় দিয়েছে এক সেকেণ্ডে ২২০০ মাইল বেগে। এই নক্ষত্র আছে প্রায় ২৬০০ আলো-চলা-বছর দূরে। অর্থাৎ এই যে তারার গ্যাস জ্বলনের উৎপতন আজ আমাদের চোখে পড়ল এটা ঘটেছিল খ্রীস্টজন্মের সাড়ে ছশো বছর পূর্বে। তার এইসব ছেড়ে-ফেলা গ্যাসের খোলসগুলির কী হল এ নিয়ে আন্দাজ চলেছে। সে কি ওর বন্ধন কাটিয়ে মহাশূন্যে বিবাগী হয়ে যাচ্ছে, না ওর টানে বাঁধা পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে ওর আনুগত্য ক'রে চলেছে। এই যে তারা জ্বলে-ওঠা, এ ঘটনাকে বিচার করে কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন হয়তো এমনি করেই নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে ছাড়া-পাওয়া গ্যাসপুঞ্জ হতেই গ্রহের উৎপত্তি ; হয়তো সূর্য এক সময়ে এইরকম নতুন তারার রীতি অনুসারে আপন উৎসারিত বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই গ্রহসন্তানদের জন্ম দিয়েছে। এ মত যদি সত্য হয় তা হলে সম্ভবত প্রত্যেক প্রাচীন নক্ষত্রেরই এক সময়ে একটা বিস্ফোরণের দশা আসে, আর গ্রহবংশের সৃষ্টি করে। হয়তো আকাশে নিঃসন্তান নক্ষত্র অল্পই আছে।

দ্বিতীয় মত এই যে, বাহিরের একটা চলতি তারা অন্য আর-একটা তারার টানের এলাকার মধ্যে এসে প'ড়ে ঘটিয়েছে এই প্রলয় কাণ্ড। এই মত অনুসারে পৃথিবীর উৎপত্তির আলোচনা পরে করা যাবে।

আমাদের নাক্ষত্রজগতে যেসব নক্ষত্র আছে তারা নানা রকমের। কেউ বা সূর্যের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি আলো দেয়, কেউ বা দেয় একশো ভাগ কম। কারও বা পদার্থপুঞ্জ অত্যন্ত ঘন, কারও বা নিতান্তই পাতলা। কারও উপরিতলের তাপমাত্রা বিশ-ত্রিশ হাজার সেন্টিগ্রেড পরিমাণে, কারও বা তিন হাজার সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়, কেউ বা বারে বারে প্রসারিত কুঞ্চিত হতে হতে আলো-উত্তাপের জোয়ার-ভাঁটা খেলাচ্ছে, কেউ বা চলেছে একা একা ; কারাও বা চলেছে জোড় বেঁধে, তাদের সংখ্যা নক্ষত্রদলের একতৃতীয়াংশ। জুড়ি নক্ষত্রেরা ভারাবর্তনের জালে ধরা প'ড়ে যাপন করছে প্রদক্ষিণের পালা। জুড়ির মধ্যে যার জোর কম প্রদক্ষিণের দায়টা পড়ে তারই 'পরে। যেমন সূর্য আর পৃথিবী। অবশ্য পৃথিবী যে কিছু টান দিচ্ছে না তা নয় কিন্তু সূর্যকে বড়ো বেশি বিচলিত করতে পারে না। প্রদক্ষিণের অনুষ্ঠানটা একা সম্পন্ন করছে পৃথিবীই। যেখানে দুই জ্যোতিষ্ক প্রায় সমান জোরের সেখানে উভয়ের

মাঝামাঝি জায়গায় একটা লক্ষ্য স্থির থাকে, দুই নক্ষত্র সেটাকেই প্রদক্ষিণ করে।

এই জুড়ি নক্ষত্র হল কী ক'রে তা নিয়ে আলাদা আলাদা মত শুনি। কেউ কেউ বলেন এর মূলে আছে দস্যুবৃত্তি। অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার নীতি অনুসারে একটা তারা আর-একটাকে বন্দী ক'রে আপন সঙ্গী ক'রে রেখেছে। অন্য মতে জুড়ির জন্ম মূল নক্ষত্রের নিজেরই অঙ্গ থেকে। বুঝিয়ে বলি। নক্ষত্র যতই ঠাণ্ডা হয় ততই আঁট হয়ে ওঠে। এমনি ক'রে যতই হয় ঘন ততই তার ঘুরপাক হয় দ্রুত। সেই দ্রুতগতির ঠেলায় প্রবল হতে থাকে বাহির-মুখো বেগ। গাড়ির চাকা যখন ঘোরে খুব জোরে তখন তার মধ্যে এই বাহির-মুখো বেগ জোর পায় বলেই তার গায়ের কাদা ছিটকে পড়ে, আর তার জোড়গুলো যদি কাঁচা থাকে তা হলে তার অংশগুলো ভেঙে ছুটে যায়। নক্ষত্রের ঘুরপাকের জোর বাড়তে বাড়তে এই বাহির-মুখো বেগ বেড়ে যাওয়াতে অবশেষে একদিন সে ভেঙে দুখানা হয়ে যায়। তখন থেকে এই দুই অংশ দুই নক্ষত্র হয়ে যুগলযাত্রায় চলা শুরু করে।

কোনো কোনো জুড়ির প্রদক্ষিণের এক পাক শেষ করতে লাগে অনেক হাজার বছর। কখনও দেখা যায় ঘুরতে ঘুরতে একটি আর-একটিকে আমাদের দৃষ্টিলক্ষ্য থেকে আড়াল করে দেয়, উজ্জ্বলতায় দেয় বাধা। কিন্তু উজ্জ্বলতায় বিশেষ লোকসান ঘটত না যদি আড়ালকারী নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল না হত। নক্ষত্রে নক্ষত্রে উজ্জ্বলতার ভেদ যথেষ্ট আছে। এমনও আছে যে কোনো নক্ষত্র তার সব দীপ্তি হারিয়েছে। প্রকাণ্ড আয়তন ও প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে যেসব নক্ষত্র তাদের বাল্যদশা শুরু করেছে, তিনকাল যাবার সময় তা'রা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে খরচ করবার মতো আলোর পুঁজি ফুঁকে দিয়েছে। শেষ দশায় এইসব দেউলে নক্ষত্র থাকে অখ্যাত হয়ে অন্ধকারে।

বেটলজিয়ুজ নামে এক মহাকায় নক্ষত্র আছে, তার লাল আলো দেখলে বোঝা যায় তার বয়স হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু তবু জলজল করছে। অথচ আছে অনেক দূরে, পৃথিবীতে তার আলো পৌঁছতে লাগে ১৯০ বছর। আসল কথা, আয়তন এর অত্যন্ত প্রকাণ্ড, নিজের দেহের মধ্যে বহুকোটি সূর্যকে জায়গা দিতে পারে। ওদিকে বৃশ্চিক রাশিতে অ্যাণ্টারীজ নামক নক্ষত্র আছে, তার আয়তন বেটলজিয়ুজের প্রায় দুনো। আবার এমন নক্ষত্র আছে যারা গ্যাসময় বটে কিন্তু যাদের বস্তুপদার্থ ওজনে লোহার চেয়ে অনেক ভারি।

মহাকায় নক্ষত্রদের কায়া যে বড়ো তার কারণ এ নয় যে, তাদের বস্তুপরিমাণ বেশি, তারা অত্যন্ত বেশি ফেঁপে আছে মাত্র। আবার এমন অনেক ছোটো নক্ষত্র আছে তা'রা যে ছোটো তার কারণ তাদের গ্যাসের সম্বল অত্যন্ত ঠাসা ক'রে পোঁটলা-বাঁধা।

সূর্যের ঘনত্ব এদের মাঝামাঝি, অর্থাৎ জলের চেয়ে কিছু বেশি; ক্যাপেলা নক্ষত্রের গড়পড়তা ঘনত্ব আমাদের হাওয়ার সমান। কিন্তু সেখানে বায়ুপরিবর্তন করবার কথা যদি চিন্তা করি তা হলে মনে রাখতে হবে পরিবর্তন হবে দারুণ বেশি। আবার একেও ছাড়িয়ে গেছে কালপুরুষমণ্ডলীভুক্ত লালরঙের দানব তারা বেটলজিয়ুজ এবং বৃশ্চিক রাশির অ্যাণ্টারীজ। এদের ঘনত্বের এত অত্যন্ত কমতি, পৃথিবীর কোনো পদার্থের সঙ্গে তার সুদূর তুলনাও হতে পারে না। বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারের খুব কষে পাম্প-করা পাত্রে যেটুকু গ্যাস বাকি থাকে তার চেয়েও কম।

আবার অপর কিনারায় আছে সাদা রঙের বেঁটে তারাগুলো। তাদের ঘনত্বের কাছে লোহা প্লাটিনম কিছুই ঘেঁষতে পারে না। অথচ এরা জমাট কঠিন নয়, এরা গ্যাসদেহী সূর্যেরই সগোত্র। তাদের অন্দরমহলে জলুনির যে প্রচণ্ড তাপ তাতে ইলেকট্রনগুলো প্রোটনের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা'রা খালাস পায় তাঁবেদারির দায়িত্ব থেকে— উভয়ে উভয়ের মান বাঁচিয়ে চললে যে-জায়গা জুড়ত সেটা যায় কমে, ক্রমাগতই উচ্ছৃঙ্খল ভাঙা পরমাণুর মধ্যে মাথা-ঠোকাঠুকি চলতে থাকে। পরমাণুর সেই আয়তনখর্বতা অনুসারে নক্ষত্রের আয়তন হয়ে যায় ছোটো। এদিকে এই ভাঙাচোরার বে-আইনি শান্তিভঙ্গ থেকে উষ্মা বেড়ে ওঠে সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে, ঘন গ্যাস ভারি হয়ে ওঠে প্লাটিনমের তিন হাজার গুণ বেশি। সেইজন্যে বেঁটে তারাগুলো মাপে হয় ছোটো, তাপে কম হয় না, ওজনের বাড়াবাড়িতেও বড়োদের ছাড়িয়ে যায়। সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অস্পষ্ট সঙ্গী তারা আছে। সাধারণ গ্রহের মতো ছোটো তার মাপ, অথচ সূর্যের মতো তার বস্তুপুঞ্জের পরিমাণ। সূর্যের ঘনত্ব জলের দেড়গুণের কিছু কম, সিরিয়সের সঙ্গীটির ঘনত্ব গড়ে জলের চেয়ে পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি। একটা দেশালাই-বাক্সের মধ্যে এর গ্যাস ভরলে সেটা ওজনে পঞ্চাশ মণ ছাড়িয়ে যাবে। আবার পর্সিয়ুস নক্ষত্রের খুদে সঙ্গীটির ঐ পরিমাণ পদার্থ ওজনে হাজার-দশেক মণ যাবে পেরিয়ে। আবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এ মত মানেন না। পৃথিবীর যখন নতুন গড়নপিটন হচ্ছিল তখন জলে স্থলে ঘন ঘন পরস্পরের প্রতিবাদ চলছিল, আজ যেখানে গহ্বর কাল সেখানে পাহাড়, কিছুকাল থেকে প্রাকৃতবিজ্ঞানে এই দশা ঘটিয়েছে। কত মত উঠছে আর নামছে তার ঠিকানা নেই।

আমাদের নাক্ষত্রজগতের নক্ষত্রের দল কেউ পুবের দিকে কেউ পশ্চিমের দিকে নানা রকম পথ ধরে চলেছে। সূর্য দৌড়েছে সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল বেগে, একটা দানব তারা আছে তার দৌড়ের বেগ সেকেণ্ডে সাতশো মাইল।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এদের মধ্যে কেউ এই নাক্ষত্রজগতের শাসন ছাড়িয়ে বাইরে

উধাও হয়ে যায় না। এক বাঁকা-টানের মহাজালে বহুকোটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগৎটা লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে। আমাদের নাক্ষত্রজগতের দূরবর্তী বাইরেকার জগতেও এই ঘূর্ণিপাক। এদিকে পরমাণুজগতের অণুতম আকাশেও চলেছে প্রোটন-ইলেকট্রনের ঘুরখাওয়া। কালস্রোত বেয়ে চলেছে নানা জ্যোতির্লোকের নানা আবর্ত। এই জন্যেই আমাদের ভাষায় এই বিশ্বকে বলে জগৎ। অর্থাৎ এর সংজ্ঞা হচ্ছে এ চলছে— চলাতেই এর উৎপত্তি, চলাই এর স্বভাব।

নাক্ষত্রজগতের দেশকালের পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি একথা মানতে হবে বিশ্বে সকলের চেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জানছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব-ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছঘেঁষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে— এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি কালে কী জানি আর-কোনো লোকে আর-কোনো চিত্তকে অধিকার ক'রে আর-কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি না। কিন্তু একথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।

সৌরজগৎ

সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধের বাঁধন বিচার করলে দেখা যায় গ্রহগুলির প্রদক্ষিণের রাস্তা সূর্যের বিষুবরেখার প্রায় সমক্ষেত্রে। এই গেল এক। আর-এক কথা, সূর্য যেদিক দিয়ে আপন মেরুদণ্ডকে বেষ্টন করে ঘুর দেয়, গ্রহেরাও সেই দিক দিয়ে পাক খায় আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এর থেকে বোঝা যায় সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধ জন্মগত। তাদের সেই জন্মবিবরণের আলোচনা করা যাক।

নক্ষত্রেরা পরস্পর বহু কোটি মাইল দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে তাদের গায়ে পড়া বা অতিশয় কাছে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। কেউ কেউ আন্দাজ করেন যে, প্রায় দুশো কোটি বছর আগে এইরকমের একটি দুঃসম্ভব ঘটনাই হয়তো ঘটেছিল। একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র এসে পড়েছিল তখনকার যুগের সূর্যের কাছে। ঐ নক্ষত্রের টানে সূর্য এবং আগন্তুক নক্ষত্রের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে উথলে উঠল অগ্নিবাষ্পের জোয়ারের

ঢেউ। অবশেষে টানের চোটে কোনো কোনো ঢেউ বেড়ে উঠতে উঠতে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। সেই বড়ো নক্ষত্র হয়তো এদের কতকগুলোকে আত্মসাৎ করে থাকবে, বাকিগুলো সূর্যের প্রবল টানে তখন থেকে ঘুরতে লাগল সূর্যের চারি দিকে। তেজ ছড়িয়ে দিয়ে এরা ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হল। সেই ছোটো-বড়ো জ্বলন্ত বাষ্পের টুকরোগুলি থেকেই গ্রহদের উৎপত্তি ; পৃথিবী তাদেরই মধ্যে একটি। এরা ক্রমশ আপন তেজ ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গ্রহের আকার ধরেছে। আকাশে নক্ষত্রের দূরত্ব, সংখ্যা ও গতি হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রায় পাঁচ-ছ' হাজার কোটি বছরে একবার-মাত্র এরকম অপঘাত ঘটতেও পারে। গ্রহসৃষ্টির এই মত মেনে নিলে বলতে হবে যে গ্রহপরিচয়ওয়ালা নক্ষত্রসৃষ্টি এই বিশ্বে প্রায় অঘটনীয় ব্যাপার। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অণ্ডগোলকসীমা ফেঁপে উঠতে-উঠতে নক্ষত্রেরা ক্রমশই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে এ মত যদি স্বীকার করতে হয় তা হলে পূর্বযুগে আকাশগোলক যখন সংকীর্ণ ছিল তখন তারায় তারায় ঠোকাঠুকির ব্যাপার সদা-সর্বদা ঘটত বলে ধরে নিতে হয়। সেই নক্ষত্র-মেলার ভিড়ের দিনে অনেক নক্ষত্রেরই ছিন্ন অংশ থেকে গ্রহের উৎপত্তি-সম্ভাবনা ছিল একথা যুক্তিসংগত। যে অবস্থায় আমাদের সূর্য অন্য সূর্যের ঠেলা খেয়েছিল সেই অবস্থাটা সেই সংকুচিত বিশ্বের দিনে এখনকার হিসাবমতে দুর সম্ভাবনীয় ছিল না বলেই মনে করে নিতে হবে। যাঁরা এই মত মেনে নেন নি তাঁদের অনেকে বলেন যে, প্রত্যেক নক্ষত্রের বিকাশের বিশেষ অবস্থায় ক্রমশ এমন একটা সময় আসে যখন সে পাকা শিমুলফলের মতো ফেটে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে চারি দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নি-বাষ্প ছড়িয়ে ফেলে দেয়। কোনো কোনো নক্ষত্র থেকে হঠাৎ এরকম জ্বলন্ত গ্যাস বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। ছোটো একটি নক্ষত্র ছিল, কয়েক বছর আগে তাকে ভালো দুরবীন ছাড়া কখনও দেখা যায় নি। একসময় হঠাৎ দীপ্তিতে সে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠল। আবার কয়েকমাস পরে আস্তে আস্তে তার প্রবল প্রতাপ এত ক্ষীণ হয়ে গেল যে, পূর্বের মতোই তাকে দুরবীন ছাড়া দেখাই গেল না। উজ্জ্বল অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে এই নক্ষত্রটি পুঞ্জপুঞ্জ যে জ্বলন্ত বাষ্প চারি দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সেইগুলিই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি ঘটাতে পারে বলে অনুমান করা অসংগত নয়। এই মত স্বীকার করলে বলতে হবে যে কোটি কোটি নক্ষত্র এই অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়েছে, অতএব সৌরজগতের মতোই আপন আপন গ্রহদলে কোটি কোটি নাক্ষত্রজগৎ এই বিশ্ব পূর্ণ করে আছে। পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র তারও যদি গ্রহমণ্ডলী থাকে তবে তা দেখতে হলে যত বড়ো দুরবীনের দরকার তা আজও তৈরি হয় নি।

অল্প কিছুদিন হল কেম্ব্রিজের এক তরুণ পণ্ডিত লিট্‌লটন সৌরজগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করেছেন। পূর্বেই বলেছি আকাশে অনেক জোড়ানক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। এঁর মতে আমাদের সূর্যেরও একটি জুড়ি ছিল। ঘুরতে ঘুরতে আর-একটা ভবঘুরে জ্যোতিষ্ক এসে এই অনুচরের গায়ে পড়ে ধাক্কা মেরে তাকে অনেক দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। চলে যেতে যেতে পরস্পর আকর্ষণের জোরে মস্ত বড়ো একটা জ্বলন্ত বাষ্পের টানা সূত্র বের হয়ে এসেছিল; তারই ভিতর মিশিয়ে গিয়েছিল এদের উভয়ের উপাদানসামগ্রী। এই বাষ্পসূত্রের যে অংশ সূর্যের প্রবল টানে আটকা পড়ে গেল সেই বন্দী-করা গ্যাসের থেকেই জন্মেছে আমাদের গ্রহমণ্ডলী। এরা আয়তনে ছোটো ব'লেই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে দেরি করলে না; তাপ কমতে কমতে গ্যাসের টুকরোগুলো প্রথমে হল তরল, তারপর আরও ঠাণ্ডা হতেই তাদের শক্ত হয়ে ওঠবার দিন এল।

একথা মনে রেখো ঐ-সকল আন্দাজি মতকে নিশ্চিত প্রমাণের মধ্যে ধরে নেওয়া চলবে না।

বলা আবশ্যক, সূর্যের সমস্তটাই গ্যাস। পৃথিবীর যেসব উপাদান মাটি ধাতু পাথরে শক্ত, তাদের সমস্তই সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তাপে আছে গ্যাসের অবস্থায়। বর্ণলিপিযন্ত্রের রেখাপাত থেকে তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

কিরীটিকার অতি সূক্ষ্ম গ্যাস-আবরণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই স্তর পেরিয়ে যত ভিতরে যাওয়া যাবে, ততই দেখা দেবে ঘনতর গ্যাস এবং উষ্ণতর তাপ। সূর্যের উপরিতলের তাপমাত্রা প্রায় দশহাজার ফারেনহাইট ডিগ্রির মাপে, অবশেষে নিচে নামতে নামতে এমন স্তরে পৌঁছব যেখানে ঠাসা গ্যাসের আর স্বচ্ছতা নেই। এই জায়গায় তাপমাত্রা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডিগ্রির চেয়ে বেশি। অবশেষে কেন্দ্রে গিয়ে পাওয়া যাবে প্রায় সাত কোটি বিশ লক্ষ ডিগ্রির তাপ। সেখানে সূর্যের দেহবস্তু কঠিন লোহা পাথরের চেয়ে অনেক বেশি ঘন অথচ গ্যাসধর্মী।

সূর্যের দূরত্বের কথাটা অঙ্ক দিয়ে বলবার চেষ্টা না করে একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলা যাক। আমাদের দেহে যেসব অনুভূতি ঘটছে আমাদের কাছে তার খবর-চালাচালির ব্যবস্থা করছে অসংখ্য স্পর্শনাড়ী। এই নাড়ীগুলি আমাদের শরীর ব্যাপ্ত ক'রে মিলেছে মস্তিষ্কে গিয়ে। টেলিগ্রাফের তারের মতো তাদের যোগে মস্তিষ্কে খবর আসে, আমরা জানতে পারি কোথায় পিঁপড়ে কামড়াল, জিবে যে খাদ্য লাগল সেটা মিষ্টি, যে দুধের বাটি হাতে তুললুম সে গরম। আমাদের শরীরটা হাওড়া থেকে বর্ধমানের মতো প্রশস্ত নয়, তাই খবর পেতে দেরি লাগে না। তবু অতি অল্প

একটু সময় লাগেই ; সে এতই অল্প যে তা মাপা শক্ত। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাও মেপেছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে স্থির করেছেন যে মানুষের শরীরের মধ্য দিয়ে দৈহিক ঘটনা অনুভূতিতে পৌঁছয় সেকেণ্ডে প্রায় একশো ফুট বেগে। মনে করা যাক, এমন একটা দৈত্য আছে, পৃথিবী থেকে হাত বাড়ালে যার হাত সূর্যে পৌঁছতে পারে। দুঃসাহসী দৈত্যের হাত যতই শক্ত হোক, সূর্যের গা ছোঁবামাত্রই যাবে পুড়ে। কিন্তু পুড়ে যাওয়ার যে ক্ষতি ও যন্ত্রণা নাড়ীযোগে সেটা টের পেতে তার লাগবে প্রায় একশো যাট বছর। তার আগেই সে মারা যায় তো জানবেই না।

সূর্যের ব্যাস ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল ; ১১০টি পৃথিবী পাশাপাশি এক সরল রেখায় রাখলে সূর্যের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছতে পারে। সূর্যের ওজন পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ বেশি, তাই নিজের দিকে সে টান দিতে পারে সেই পরিমাণ ওজনের জোরে। এই টানের জোরে সূর্য পৃথিবীকে আপন আয়ত্তে বেঁধে রাখে, কিন্তু দৌড়ের জোরে পৃথিবী আপন স্বাতন্ত্র্য রাখতে পেরেছে।

গোল আলুর ঠিক মাঝখান দিয়ে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত যদি একটা শলা চালিয়ে দেওয়া যায় আর সেই শলাটার চার দিকে যদি আলুটাকে ঘোরানো যায়, তা হলে সেই ঘোরা যেমন হয় সেই রকম হয় ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর একবার করে ঘুর-খাওয়া। আমরা বলি, পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘুরছে। আমাদের শলাফোঁড়া আলুটার সঙ্গে পৃথিবীর তফাত এই যে, তার এ রকম কোনো শলা নেই। মেরুদণ্ড কোনো দণ্ডই নয়। যে জায়গাটাতে শলা থাকতে পারত কাল্পনিক সোজা লাইনের সেই জায়গাটাকেই বলি মেরুদণ্ড। যেমন লাটিম। সে ঘোরে আপন মাঝখানের এমন একটা খাড়া লাইনের চার দিকে যে-লাইনটা মনে-করে-নেওয়া।

মেরুদণ্ডের চার দিকে পৃথিবীর এক পাক ঘুরতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা। সূর্যও আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘোরে। ঘুরতে কতক্ষণ লাগে তা যে উপায়ে জানা গেছে সে-কথা বলি। খুব ভোরে যখন আলোতে চোখ ধাঁধায় না তখন সূর্যের দিকে তাকালে হয়তো দেখা যাবে সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ আছে। এক-একটি কালো দাগ সময়ে সময়ে এত বড়ো হয়ে প্রকাশ পায় যে, সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ একত্র করলেও তার সমান হয় না। ছোটো দাগগুলি মিলিয়ে যেতে বেশিদিন লাগে না, কিন্তু বড়ো বড়ো দাগ দু-তিন সপ্তাহ থাকে। দুরবীন দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন এরা ক্রমাগত ডানদিকে ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে ঘুরছে এদের সবাইকে গায়ে নিয়ে সূর্য। এই কালো দাগের অনুসরণ ক'রে এই ঘুরে যাওয়ার সময়টার হিসাব পাওয়া গেছে ; প্রমাণ হয়েছে যে, পৃথিবী ঘোরে চব্বিশ ঘণ্টায়, সূর্য ঘোরে ছাব্বিশ দিনে।

সূর্যের দাগগুলো সূর্যের বাইরের আবরণে প্রকাণ্ড আবর্তগহ্বর। সেখান দিয়ে ভিতর থেকে উত্তপ্ত গ্যাস কুণ্ডলী আকারে ঘুরতে-ঘুরতে উপরে বেরিয়ে আসছে। এর কেন্দ্রপ্রদেশ ঘোর কালো, তার নাম আম্‌ব্রা ; তার চার দিকে কম-কালো বেষ্টনী, তার নাম পেনাম্‌ব্রা। এদের কালো দেখতে হয়েছে চার পাশের দীপ্তির তুলনায়— সেই আলো যদি বন্ধ করা যেত তা হলে অতি তীব্র দেখা যেত এদের জ্যোতি। সূর্যের যে দাগ খুব বড়ো তার কোনো-কোনোটার আম্‌ব্রার এক পার থেকে আর-এক পারের মাপ পঞ্চাশ হাজার মাইল, দেড় লক্ষ মাইল তার পেনাম্‌ব্রার মাপ।

সূর্যের এইসব দাগের কমা-বাড়ার প্রভাব পৃথিবীর উপরে নানা রকমে কাজ করে। যেমন আমাদের আবহাওয়ায়। প্রায় এগারো বছরের পালাক্রমে সূর্যের দাগ বাড়ে কমে। পরীক্ষায় দেখা গেছে বনস্পতির গুঁড়ির মধ্যে এই দাগি বৎসরের সাক্ষ্য আঁকা পড়ে। বড়ো গাছের গুঁড়ি কাটলে তার মধ্যে দেখা যায় প্রতি বছরের একটা করে চক্রচিহ্ন। এই চিহ্নগুলি কোনো কোনো জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি কোনো কোনো জায়গায় ফাঁক ফাঁক। প্রত্যেক চক্রচিহ্ন থেকে বোঝা যায় গাছটা বৎসরে কতখানি করে বেড়েছে। আমেরিকায় এরিজোনার মরুপ্রায় প্রদেশে ডাক্তার ডগলাস দেখেছেন যে, যে বছরে সূর্যের কালো দাগ বেশি দেখা দিয়েছে সেই বছরে গুঁড়ির দাগটা চওড়া হয়েছে বেশি। এরিজোনার পাইন গাছে পাঁচশো বছরের চিহ্ন গুনতে গুনতে ১৬৫০ থেকে ১৭২৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সূর্যের দাগের লক্ষণে একটা ফাঁক পড়ল। অবশেষে তিনি গ্রিনিজ মানযন্ত্র-বিভাগে সংবাদ নিয়ে জানলেন ঐ-কটা বছরে সূর্যের দাগ প্রায় ছিল না।

সূর্যের দেহ থেকে যে প্রচুর আলো বেরিয়ে চলেছে তার অতি সামান্য ভাগ গ্রহগুলিতে ঠেকে। অনেকখানিই চলে যায় শূন্যে, সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ; কোনো নক্ষত্রে পৌঁছয় চার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ত্রিশ হাজার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ন'লক্ষ বছরে। আমরা মনে ভাবি সূর্য আমাদেরই, আর তার আলোর দানে আমাদেরই বেশি দাবি। কিন্তু এত আলোর একটুখানি মাত্র আমাদের ছুঁয়ে যায়। তার পরে সূর্যের এই আলোকের দূত সূর্যে আর ফেরে না, কোথায় যায়, বিশ্বের কোন্ কাজে লাগে কে জানে।

জ্যোতিষ্কলোকদের সম্বন্ধে একটা আলোচনা বাকি রয়ে গেল। কোথা থেকে নিরন্তর তাদের তাপের জোগান চলছে তার সন্ধান করা দরকার পরমাণুদের মধ্যে।

ইলেকট্রন-প্রোটনের যোগে যদি কখনও একটি হীলিয়মের পরমাণু সৃষ্টি করা যায় তা হলে সেই সৃষ্টিকার্যে যে প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হবে তার আঘাতে আমাদের পৃথিবীতে

এক সর্বনাশী প্রলয়কাণ্ড ঘটবে। এ তো গ'ড়ে তোলবার কথা। কিন্তু বস্তু ধ্বংস করতে তার চেয়ে অনেকগুণ তীব্র শক্তির প্রয়োজন। প্রোটনে ইলেকট্রনে যদি সংঘাত বাধে তা হলে স্বতান্ত্র কিরণ বিকিরণ ক'রে তখনই তা'রা মিলিয়ে যাবে। এতে যে প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হয় তা কল্পনাতীত।

এইরকম কাণ্ডটাই ঘটছে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে। সেখানে বস্তুধ্বংসের কাজ চলছে বলেই অনুমান করা সংগত। এই মত অনুসারে সূর্য তিনশো যাট লক্ষ কোটি টন ওজনের বস্তুপুঞ্জ প্রত্যহ খরচ করে ফেলছে। কিন্তু সূর্যের ভাণ্ডার এত বৃহৎ যে আরও বহু বহু কোটি বৎসর এইরকম অপব্যয়ের উদ্দামতা চলতে পারবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের আয়ু সম্বন্ধে যে শেষহিসেব অবধারিত হয়েছে সেটা মেনে নিলে বস্তু-ভাঙনের চেয়ে বস্তু-গড়নের মতটাই বেশি খাটে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে একসময়ে সূর্য ছিল হাইড্রজেনের পুঞ্জ, তা হলে সেই হাইড্রজেন থেকে হীলিয়ম গড়ে উঠতে যে তেজ জাগবার কথা সেটা এখনকার হিসাবের সঙ্গে মেলে।

অতএব এই বিশ্বজগৎটা ধ্বংসের দিকে, না গ'ড়ে ওঠবার দিকে চলছে, না দুই একসঙ্গে ঘটছে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মতের মিল হয় নি। কয়েক বৎসর হল যে-বিকীরণশক্তি ধরা পড়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে কস্‌মিক রশ্মি; সেটার উদ্ভব না পৃথিবীতে না সূর্যে, এমনকি না নক্ষত্রলোকে। নক্ষত্রপরপারের কোনো আকাশ হতে বিশ্বসৃষ্টির ভাঙন কিংবা গড়ন থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে এইরকম আন্দাজ করা হয়েছে।

যাই হোক, বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারের এই যে সব বিপরীত বার্তাবহ-ইশারা আসছে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে সেটা হয়তো কোনো-একটা জটিল গণনার ব্যাপারে এসে ঠেকবে। কিন্তু আমরা তো বিজ্ঞানী নই, বুঝতে পারি নে হঠাৎ অঙ্কের আরম্ভ হয় কোথা থেকে, একেবারে শেষই বা হয় কোন্‌খানে। সম্পূর্ণ-সংঘটিত বিশ্বকে নিয়ে হঠাৎ কালের আরম্ভ হল আর সম্ভোলুপ্ত বিশ্বের সঙ্গে কালের সম্পূর্ণ অন্ত হবে, আমাদের বুদ্ধিতে এর কিনারা পাই নে। বিজ্ঞানী বলবেন, বুদ্ধির কথা এখানে আসছে না, এ হল গণনার কথা; সে গণনা বর্তমান ঘটনাধারার উপরে প্রতিষ্ঠিত— এর আদি-অন্তে যদি অন্ধকার দেখি তা হলে উপায় নেই।

গ্রহলোক

গ্রহ কাকে বলে সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সূর্য হল নক্ষত্র; পৃথিবী হল গ্রহ, সূর্য থেকে ছিঁড়ে-পড়া টুকরো, ঠাণ্ডা হয়ে তার আলো গেছে নিবে। কোনো গ্রহেরই আপন আলো নেই। সূর্যের চার দিকে এই গ্রহদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথ ডিম্বরেখাকারে— কারও বা পথ সূর্যের কাছে, কারও বা পথ সূর্য থেকে বহু দূরে। সূর্যকে ঘুরে আসতে কোনো গ্রহের এক বছরের কম লাগে, কারও বা একশো বছরের বেশি। যে-গ্রহেরই ঘুরতে যত সময় লাগুক এই ঘোরার সম্বন্ধে একটি বাঁধা নিয়ম আছে, তার কখনই ব্যতিক্রম হয় না। সূর্যপরিবারের দূর বা কাছের ছোটো বা বড়ো সকল গ্রহকেই পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। এর থেকে বোঝা যায় গ্রহেরা সূর্য থেকে একই অভিমুখে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে, তাই চলবার ঝোঁক হয়েছে একই দিকে। চলতি গাড়ি থেকে নেমে পড়বার সময় গাড়ি যে মুখে চলেছে সেই দিকে শরীরের উপর একটা ঝোঁক আসে। গাড়ি থেকে পাঁচজন নামলে পাঁচজনেরই সেই একদিকে হবে ঝোঁক। তেমনি ঘূর্ণ্যমান সূর্য থেকে বেরিয়ে পড়বার সময় সব গ্রহই একই দিকে ঝোঁক পেয়েছে। ওদের এই চলার প্রবৃত্তি থেকে ধরা পড়ে ওরা সবাই এক জাতের, সবাই একঝোঁকা।

সূর্যের সব চেয়ে কাছে আছে বুধগ্রহ, ইংরেজিতে যাকে বলে মার্করি। সে সূর্য থেকে সাড়েতিন কোটি মাইল মাত্র দূরে। পৃথিবী যতটা দূর বাঁচিয়ে চলে তার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। বুধের গায়ে ঝাপসা কিছু কিছু দাগ দেখা যায়, সেইটে লক্ষ্য করে বোঝা গেছে কেবল ওর এক পিঠ ফেরানো সূর্যের দিকে। সূর্যের চার দিক ঘুরে আসতে ওর লাগে ৮৮ দিন। নিজের মেরুদণ্ড ঘুরতেও ওর লাগে তাই। সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে পৃথিবীর দৌড় প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। বুধগ্রহের দৌড় তাকে ছাড়িয়ে গেছে, তার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল। একে ওর রাস্তা ছোটো তাতে ওর ব্যস্ততা বেশি, তাই পৃথিবীর সিকি সময়েই ওর প্রদক্ষিণ সারা হয়ে যায়। বুধগ্রহের প্রদক্ষিণের যে-পথ সূর্য ঠিক তার কেন্দ্রে নেই, একটু একপাশে আছে। সেইজন্যে ঘোরবার সময় বুধগ্রহ কখনও সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছে আসে কখনও যায় দূরে।

এই গ্রহ সূর্যের এত কাছে থাকাতে তাপ পাচ্ছে খুব বেশি। অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ তাপ মাপবার একটি যন্ত্র বেরিয়েছে, ইংরেজিতে তার নাম thermo-couple। তাকে দুরবীনের সঙ্গে জুড়ে গ্রহতারার তাপের খবর জানা যায়। এই যন্ত্রের হিসাব অনুসারে, বুধগ্রহের যে-অংশ সূর্যের দিকে ফিরে থাকে তার তাপ সীসে টিন গলাতে পারে। এই

তাপে বাতাসের অণু এত বেশি বেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে যে বুধগ্রহ তাদের ধরে রাখতে পারে না, তা'রা দেশ ছেড়ে শূন্যে দেয় দৌড়। বাতাসের অণু পলাতক স্বভাবের। পৃথিবীতে তারা সেকেণ্ডে দুইমাইলমাত্র বেগে ছুটোছুটি করে, তাই টানের জোরে পৃথিবী তাদের সামলিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু যদি কোনো কারণে তাপ বেড়ে উঠে ওদের দৌড় হত সেকেণ্ডে সাত মাইল, তা হলেই পৃথিবী আপন হাওয়াকে আর বশ মানাতে পারত না।

যে-সব বিজ্ঞানী বিশ্বজগতের হিসাবনবিশ তাঁদের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রহ-নক্ষত্রের ওজন ঠিক করা। এ কাজে সাধারণ দাঁড়িপাল্লার ওজন চলে না, তাই কৌশলে ওদের খবর আদায় করতে হয়। সেই কথাটা বুঝিয়ে বলি। মনে করো একটা গড়ানে গোলা হঠাৎ এসে পথিককে দিলে ধাক্কা, সে পড়ল দশ হাত দূরে। কতখানি ওজনের গোলা এসে জোর লাগালে মানুষটা এতখানি বিচলিত হয়, তার নিয়মটা যদি জানা থাকে তা হলে এ দশ হাতের মাপটা নিয়ে গোলাটার ওজন অঙ্ক কষে বের করা যেতে পারে। একবার হঠাৎ এইরকম অঙ্ক কষার সুযোগ ঘটাতে বুধগ্রহের ওজন মাপা সহজ হয়ে গেল। সুবিধাটা ঘটিয়ে দিলে একটা ধূমকেতু। সে কথাটা বলবার আগে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ধূমকেতুরা কী রকম ধরনের জ্যোতিষ্ক।

ধূমকেতু শব্দের মানে ধোঁয়ার নিশান। ওর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। গোল মুণ্ড আর তার পিছনে উড়ছে উজ্জ্বল একটা লম্বা পুচ্ছ। সাধারণত এই হল ওর আকার। এই পুচ্ছটা অতি সূক্ষ্ম বাষ্পের। এত সূক্ষ্ম যে কখনও কখনও তাকে মাড়িয়ে গিয়েছে পৃথিবী, তবু সেটা অনুভব করতে পারি নি। ওর মুণ্ডটা উল্কাপিণ্ড দিয়ে তৈরি। এখনকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা এই মত স্থির করেছেন যে ধূমকেতুরা সূর্যের বাঁধা অনুচরেরই দলে। কয়েকটা থাকতে পারে যারা পরিবারভুক্ত নয় যারা আগন্তুক।

একবার একটি ধূমকেতুর প্রদক্ষিণপথে ঘটল অপঘাত। বুধের কক্ষপথের পাশ দিয়ে যখন সে চলছিল তখন বুধের সঙ্গে টানাটানিতে তার পথের হয়ে গেল গোলমাল। রেলগাড়ি রেলচ্যুত হলে আবার তাকে রেলে ঠেলে তোলা হয় কিন্তু টাইমটেবলের সময় পেরিয়ে যায়। এক্ষেত্রে তাই ঘটল। ধূমকেতুটা আপন পথে যখন ফিরল তখন তার নির্দিষ্ট সময় হয়েছে উত্তীর্ণ। ধূমকেতুকে যে-পরিমাণ নড়িয়ে দিতে বুধগ্রহের যতখানি টানের জোর লেগেছিল তাই নিয়ে চলল অঙ্ককষা। যার যতটা ওজন সেই পরিমাণ জোরে সে টান লাগায় এটা জানা কথা, এর থেকেই বেরিয়ে পড়ল বুধগ্রহের ওজন। দেখা গেল তেইশটা বুধগ্রহের বাটখারা চাপাতে পারলে তবেই তা পৃথিবীর ওজনের সমান হয়।

বুধগ্রহের পরের রাস্তাতেই আসে শুক্রগ্রহের প্রদক্ষিণের পালা। তার ২২৫ দিন লাগে সূর্য ঘুরে আসতে। অর্থাৎ আমাদের সাড়েসাত মাসে তার বৎসর। ওর মেরুদণ্ড-ঘোরা ঘূর্ণিপাকের বেগ কতটা তা নিয়ে এখনও তর্ক শেষ হয় নি। এই গ্রহটি বছরের এক সময়ে সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয়, তখন তাকে বলি সন্ধ্যাতারা, আবার এই গ্রহই আর-এক সময়ে সূর্য ওঠবার আগে পুবদিকে ওঠে, তখন তাকে শুকতারা বলে জানি। কিন্তু মোটেই এ তারা নয়, খুব জ্বল্‌জ্বল্‌ করে ব'লেই সাধারণের কাছে তারা খেতাব পেয়েছে। এর আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অল্প-একটু কম। এই গ্রহের পথ পৃথিবীর পথের চেয়ে আরও তিন কোটি মাইল সূর্যের কাছে। সেও কম নয়। যথোচিত দূর বাঁচিয়ে আছে তবু এর ভিতরকার খবর ভালো করে পাই নে। সে সূর্যের আলোর প্রখর আবরণের জন্যে নয়। বুধকে ঢেকেছে সূর্যেরই আলো, আর শুক্রকে ঢেকেছে এর নিজেরই ঘন মেঘ। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন শুক্রগ্রহের যে উত্তাপ তাতে জলের বিশেষ রূপান্তর হয় না। কাজেই ওখানে জলাশয় আর মেঘ দুইয়ের অস্তিত্বই আশা করতে পারি।

মেঘের উপরিতলা থেকে যতটা আন্দাজ করা যায় তাতে প্রমাণ হয় এই গ্রহের অক্সিজেন-সম্বল নিতান্তই সামান্য। ওখানে যে-গ্যাসের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায় সে হচ্ছে আঙ্গারিক গ্যাস। মেঘের উপরতলায় তার পরিমাণ পৃথিবীর ঐ গ্যাসের চেয়ে বহু হাজার গুণ বেশি। পৃথিবীর এই গ্যাসের প্রধান ব্যবহার লাগে গাছপালার খাদ্য জোগাতে।

এই আঙ্গারিক গ্যাসের ঘন আবরণে গ্রহটি যেন কম্বলচাপা। তার ভিতরের গরম বেরিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং শুক্রগ্রহের উপরিতল ফুটন্ত জলের মতো কিংবা তার চেয়ে বেশি উষ্ণ।

শুক্রে জোলো বাষ্পের সন্ধান যে পাওয়া গেল না সেটা আশ্চর্যের কথা। শুক্রের ঘন মেঘ তা হলে কিসের থেকে সে-কথা ভাবতে হয়। সম্ভব এই যে মেঘের উচ্চস্তরে ঠাণ্ডায় জল এত জমে গেছে যে তার থেকে বাষ্প পাওয়া যায় না।

এ কথাটা বিশেষ করে ভেবে দেখবার বিষয়। পৃথিবীতে সৃষ্টির প্রথম যুগে যখন গলিত বস্তুগুলো ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধতে লাগল তখন অনেক পরিমাণে জোলো বাষ্প আর আঙ্গারিক গ্যাসের উদ্ভব হল। তাপ আরও কমলে পর জোলো বাষ্প জল হয়ে গ্রহতলে সমুদ্র বিস্তার করে দিলে। তখন বাতাসে যে-সব গ্যাসের প্রাধান্য ছিল তা'রা নাইট্রজেনের মতো সব নিষ্ক্রিয় গ্যাস। অক্সিজেন গ্যাসটা তৎপর জাতের মিশুক, অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিশে যৌগিক পদার্থ তৈরি করা তার স্বভাব। এমনি

করে নিজেকে সে রূপান্তরিত করতে থাকে। তৎসত্ত্বেও পৃথিবীর হাওয়ায় এতটা পরিমাণ অক্সিজেন বিশুদ্ধ হয়ে টিঁকল কী করে।

তার প্রধান কারণ পৃথিবীর গাছপালা। উদ্ভিদেরা বাতাসের আঙ্গারিক গ্যাস থেকে অঙ্গার পদার্থ নিয়ে নিজেদের জীবকোষ তৈরি করে, মুক্তি দেয় অক্সিজেনকে। তার পরে প্রাণীদের নিশ্বাস ও লতাপাতার পচানি থেকে আবার আঙ্গারিক গ্যাস উঠে আপন তহবিল পূরণ করে। পৃথিবীতে সম্ভবত প্রাণের বড়ো অধ্যায়টা আরম্ভ হল তখনই যখন সামান্যকিছু অক্সিজেন ছিল সেই আদিকালের উদ্ভিদের মধ্যে। এই উদ্ভিদের পালা যতই বেড়ে চলল ততই তাদের নিশ্বাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুললে। কমে গেল আঙ্গারিক গ্যাস।

অতএব সম্ভবত শুক্রগ্রহের অবস্থা সেই আদিকালের পৃথিবীর মতো। একদিন হয়তো কোনো ফাঁকে উদ্ভিদ দেখা দেবে, আর আঙ্গারিক গ্যাস থেকে অক্সিজেনকে ছাড়া দিতে থাকবে। তার পরে বহু দীর্ঘকালে ক্রমশ জীবজন্তুর পালা হবে শুরু। চাঁদ আর বুধগ্রহের অবস্থা ঠিক এর উলটো। সেখানে জীবপালনযোগ্য হাওয়া টানের দুর্বলতাবশত দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সৌরমণ্ডলীতে শুক্রগ্রহের পরের আসনটা পৃথিবীর। অন্য গ্রহদের কথা শেষ করে তার পরে পৃথিবীর খবর নেওয়া যাবে।

পৃথিবীর পরের পংক্তিতেই মঙ্গলগ্রহের স্থান। এই লালচে রঙের গ্রহটিই অন্য গ্রহদের চেয়ে পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ। সূর্যের চার দিকে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে ৬৮৭ দিন। যে-পথে এ সূর্যের প্রদক্ষিণ করছে তা অনেকটা ডিমের মতো; তাই ঘোরার সময় একবার সে আসে সূর্যের কাছে আবার যায় দূরে। আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে এ গ্রহের ঘুরতে লাগে পৃথিবীর চেয়ে আধঘণ্টা মাত্র বেশি, তাই সেখানকার দিনরাত্রি আমাদের পৃথিবীর দিনরাত্রির চেয়ে একটু বড়ো। এই গ্রহে যে-পরিমাণ বস্তু আছে, তা পৃথিবীর বস্তুমাত্রার দশ ভাগের এক ভাগ, তাই টানবার শক্তিও সেই পরিমাণে কম।

সূর্যের টানে মঙ্গলগ্রহের ঠিক যে-পথ বেয়ে চলা উচিত ছিল, তার থেকে ওর চাল একটু তফাত। পৃথিবীর টানে ওর এই দশা। ওজন অনুসারে টানের জোরে পৃথিবী মঙ্গলগ্রহকে কতখানি টলিয়েছে সেইটে হিসেব করে পৃথিবীর ওজন ঠিক হয়েছে। এইসূত্রে সূর্যের দূরত্বও ধরা পড়ল। কেননা মঙ্গলকে সূর্যও টানছে পৃথিবীও টানছে, সূর্য কতটা পরিমাণে দূরে থাকলে দুই টানে কাটাকাটি হয়ে মঙ্গলের এইটুকু বিচলিত হওয়া সম্ভব সেটা গণনা করে বের করা যেতে পারে। মঙ্গলগ্রহ বিশেষ বড়ো গ্রহ নয়,

তার ওজনও অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং সেই অনুসারে টানের জোর বেশি না হওয়াতে তার হাওয়া খোওয়াবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সূর্য থেকে যথেষ্ট দূরে আছে বলে এতটা তাপ পায় না যাতে হাওয়ার অণু গরমে উধাও হয়ে চলে যেতে পারে। মঙ্গলগ্রহের হাওয়ায় অক্সিজেন সন্ধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সামান্য কিছু থাকতে পারে। মঙ্গলগ্রহের লাল রঙে অনুমান হয় সেখানকার পাথরগুলো অক্সিজেনের সংযোগে সম্পূর্ণ মরচে-পড়া হয়ে গেছে। আর জলীয় বাষ্পের যা-চিহ্ন পাওয়া গেল তা পৃথিবীর জলীয় বাষ্পের শতকরা পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মঙ্গলগ্রহের হাওয়ায় এই যে অকিঞ্চনতার লক্ষণ দেখা যায় তাতে বোঝা যায় পৃথিবী ক্রমে ক্রমে একদিন আপন সম্বল খুইয়ে এই দশায় পৌঁছবে।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের চেয়ে মঙ্গল থেকে তার দূরত্ব বেশি অতএব নিঃসন্দেহ এ গ্রহ অনেকটা ঠাণ্ডা। দিনের বেলায় বিষুবপ্রদেশে হয়তো কিছু গরম থাকে কিন্তু রাতে নিঃসন্দেহ বরফজমা শীতের চেয়ে আরও অনেক শীত বেশি। বরফের-টুপি-পরা তার মেরুপ্রদেশের তো কথাই নেই।

এই গ্রহের মেরুপ্রদেশে বরফের টুপিটা বাড়ে-কমে, মাঝে মাঝে তাদের দেখাও যায় না। এই গলে-যাওয়া টুপির আকার-পরিবর্তন যন্ত্রদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই গ্রহতলের অনেকটা ভাগ মরুর মতো শুকনো। কেবল গ্রীষ্মঋতুতে কোনো কোনো অংশ শ্যামবর্ণ হয়ে ওঠে, সম্ভবত জল চলার রাস্তায় বরফ গলার দিনে গাছপালা গজিয়ে উঠতে থাকে।

মঙ্গলগ্রহকে নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে একটা তর্ক চলেছে অনেকদিন ধরে। একদা একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী মঙ্গলে লম্বা লম্বা আঁচড় দেখতে পেলেন, বললেন, নিশ্চয়ই এ গ্রহের বাসিন্দেরা মেরুপ্রদেশ থেকে বরফ-গলা জল পাবার জন্যে খাল কেটেছে। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী বললেন, ওটা চোখের ভুল। ইদানীং জ্যোতিষ্কলোকের দিকে মানুষ ক্যামেরা চালিয়েছে। সেই ক্যামেরা-তোলা ছবিতেও কালো দাগ দেখা যায়। কিন্তু ওগুলো যে কৃত্রিম খাল, আর বুদ্ধিমান জীবেরই কীর্তি, সেটা নিতান্তই আন্দাজের কথা। অবশ্য এ গ্রহে প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়, কেননা এখানে হাওয়া জল আছে।

দুটি উপগ্রহ মঙ্গলগ্রহের চারি দিকে ঘুরে বেড়ায়। একটির এক পাক শেষ করতে লাগে ত্রিশ ঘণ্টা, আর-একটির সাড়েসাত ঘণ্টা, অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের এক দিনরাত্রির মধ্যে সে তাকে ঘুরে আসে প্রায় তিনবার। আমাদের চাঁদের চেয়ে এরা প্রদক্ষিণের কাজ সেরে নেয় অনেক শীঘ্র।

মঙ্গল আর বৃহস্পতিগ্রহের কক্ষপথের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা দেখে

পণ্ডিতেরা সন্দেহ ক'রে খোঁজ করতে লেগে গেলেন। প্রথমে অতিছোটো চারটি গ্রহ দেখা দিল। তার পরে দেখা গেল ওখানে বহুহাজার টুকরো-গ্রহের ভিড়। ঝাঁকে ঝাঁকে তা'রা ঘুরছে সূর্যের চারি দিকে। ওদের নাম দেওয়া যাক গ্রহিকা। ইংরেজিতে বলে asteroids। প্রথম যার দর্শন পাওয়া গেল তার নাম দেওয়া হয়েছে সারিজ (Ceres), তার ব্যাস চারশো পঁচিশ মাইল। ঈরস (Eros) বলে একটি গ্রহিকা আছে, সূর্যপ্রদক্ষিণের সময় সে পৃথিবীর যত কাছে আসে, এমন আর কোনো গ্রহই আসে না। এরা এত ছোটো যে এদের ভিতরকার কোনো বিশেষ খবর পাওয়া যায় না। এদের সবগুলোকে জড়িয়ে যে ওজন পাওয়া যায় তা পৃথিবীর ওজনের শিকিভাগেরও কম। মঙ্গলের চেয়ে কম, নইলে মঙ্গলের চলার পথে টান লাগিয়ে কিছু গোল বাধাত।

এই টুকরো-গ্রহগুলিকে কোনো একটা আস্ত-গ্রহেরই ভগ্নশেষ বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন সে-কথা যথার্থ নয়। বলা যায় না কী কারণে এরা জোট বেঁধে গ্রহ আকার ধরতে পারে নি।

এই গ্রহিকাদের প্রসঙ্গে আর-এক দলের কথা বলা উচিত। তা'রাও অতি ছোটো, তা'রাও ঝাঁক বেঁধে চলে এবং নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণও করে থাকে, তা'রা উল্কাপিণ্ডের দল। পৃথিবীতে ক্রমাগতই তাদের বর্ষণ চলছে, ধুলার সঙ্গে তাদের যে ছাই মিশেছে সে বড়ো কম নয়। পৃথিবীর উপরে হাওয়ার চাঁদোয়া না থাকলে এইসব ক্ষুদ্র শত্রুর আক্রমণে আমাদের রক্ষা থাকত না।

উল্কাপাত দিনে রাতে কিছু-না-কিছু হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে উল্কাপাতের ঘটা হয় বেশি। ২১ এপ্রিল, ৯, ১০, ১১ আগস্ট, ১২, ১৩, ১৪ ও ২৭ নভেম্বরের রাত্রে এই উল্কাবৃষ্টির আতশবাজি দেখবার মতো জিনিস। এ সম্বন্ধে দিনক্ষণের বাঁধাবাঁধি দেখে বিজ্ঞানীরা কারণ খোঁজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, ওদের একটা বিশেষ পথ আছে। কিন্তু গ্রহদের মতো ওরা একা চলে না, ওরা দ্যুলোকের দলবাঁধা পঙ্গপালের জাত। লক্ষ লক্ষ চলেছে ভিড় করে এক রাস্তায়। বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে পৃথিবী গিয়ে পড়ে ঠিক ওদের যেখানে জটলা। পৃথিবীর টান ওরা সামলাতে পারে না। রাশি রাশি বর্ষণ হতে থাকে। পৃথিবীর ধুলোয় ধুলো হয়ে যায়। কখনও কখনও বড়ো বড়ো টুকরোও পড়ে, ফেটেফুটে চারি দিক ছারখার করে দেয়। সূর্যের এলেকায় অনধিকার প্রবেশ ক'রে বিপন্ন হয়েছে এমন ধূমকেতুর এরা দুর্ভাগ্যের নিদর্শন। এমন কথাও শোনা যায়, তরুণ বয়সে পৃথিবীর

অন্তরে যখন তাপ ছিল বেশি তখন অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর ভিতরের সামগ্রী এত উপরে ছুটে গিয়েছিল যে পৃথিবীর টান এড়িয়ে গিয়ে সূর্যের চার দিকে তা'রা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে নাগাল পেলেই আবার তাদের পৃথিবী নেয় টেনে। বিশেষ বিশেষ দিনে সেই উল্কার যেন হরির লুট হতে থাকে। আবার এমন অনেক উল্কাপিণ্ডের সন্ধান মিলেছে যারা সৌরমণ্ডলীর বাইরে থেকে এসে ধরা পড়ে পৃথিবীর টানে। বিশ্বের কোথাও হয়তো একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটেছিল যার উদ্দামতায় বস্তুপিণ্ড ভেঙে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই উল্কার দল আজ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই অতিক্ষুদ্রদের পরের রাস্তাতেই দেখা দেয় অতিমস্তবড়ো গ্রহ বৃহস্পতি।

এই বৃহস্পতিগ্রহের কাছ থেকে কোনো পাকা খবর প্রত্যাশা করার পূর্বে দুটি জিনিস লক্ষ্য করা দরকার। সূর্য থেকে তার দূরত্ব, আর তার আয়তন। পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি মাইলের কিছু উপর আর বৃহস্পতির দূরত্ব ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে পাঁচগুণেরও বেশি। পৃথিবী সূর্যের যতটা তাপ পায়, বৃহস্পতি পায় তার সাতাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এককালে জ্যোতিষীরা আন্দাজ করেছিলেন যে, বৃহস্পতিগ্রহ পৃথিবীর মতো এত ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি, তার নিজের যথেষ্ট তাপের সঞ্চয় আছে। তার বায়ুমণ্ডলে সর্বদা যে চঞ্চলতা দেখা যায় তার নিজের অন্তরের তাপই তার কারণ। কিন্তু যখন বৃহস্পতির তাপমাত্রার হিসাব কষা সম্ভব হল তখন দেখা গেল গ্রহটি অত্যন্তই ঠাণ্ডা। বরফজমা শৈত্যের চেয়ে আরও ২৮০ ফারেনহাইট ডিগ্রির তলায় পৌঁছায় তার তাপমাত্রা। এত অত্যন্ত বেশি ঠাণ্ডায় বৃহস্পতির জোলো বাষ্প থাকতেই পারে না। তার বায়ুমণ্ডল থেকে দুটো গ্যাসের কিনারা পাওয়া গেল। একটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া, নিশাদলে যার তীব্রগন্ধে চমক লাগায়, আর একটা আলেয়া গ্যাস, মাঠের মধ্যে পথিকদের পথ ভোলাবার জন্যে যার নাম আছে। নানাপ্রকার যুক্তি মিলিয়ে আপাতত স্থির হয়েছে যে, বৃহস্পতির দেহ কঠিন, প্রায় পৃথিবীর সমান ঘন। বৃহস্পতির ভিতরকার পাথুরে জঠরটার প্রসার বাইশ হাজার মাইল; এর উপরে বরফের স্তর জমে রয়েছে ষোলো হাজার মাইল। এই বরফপুঞ্জের উপরে আছে ৬০০০ মাইল বায়ুস্তর। এতবড়ো রাশকরা বাতাসের প্রবল চাপে হাইড্রজেনও তরল হয়ে যায়। অতএব এই গ্রহে ঘটেছে কঠিন বরফস্তরের উপরে তরল গ্যাসের সমুদ্র। আর তার বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তর তরল অ্যামোনিয়া বিন্দুতে তৈরি।

বৃহস্পতি অতিকায় গ্রহ, ওর ব্যাস প্রায় নব্বই হাজার মাইল, আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে তেরোশোগুণ বড়ো।

সূর্যপ্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির লাগে প্রায় বারো বৎসর। দূরে থাকাতে ওর কক্ষপথ পৃথিবী থেকে অনেক বড়ো হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ও চলেও যথেষ্ট মন্দ গমনে। পৃথিবী যেখানে উনিশ মাইল চলে এক সেকেণ্ডে, ও চলে আট মাইল মাত্র। কিন্তু ওর স্বাবর্তন অর্থাৎ নিজের মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘোরা খুবই দ্রুত বেগে। অতবড়ো বিপুল দেহটাকে পাক খাওয়াতে ওর লাগে দশ ঘণ্টা। আমাদের এক দিন এক রাত্রি সময়ের মধ্যে ওর দুই দিনরাত্রি শেষ হয়েও উদ্‌বৃত্ত থাকে।

নয়টি উপগ্রহ নিয়ে বৃহস্পতির পরিবারমণ্ডলী। দশম উপগ্রহের খবর পাওয়া গেছে, কিন্তু সে-খবর পাকা হয় নি। পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে এই চাঁদগুলোর বৃহস্পতি-প্রদক্ষিণবেগ অনেক বেশি দ্রুত। প্রথম চারটি উপগ্রহ আমাদেরই চাঁদের মতো বড়ো। তাদেরও আছে অমাবস্যা পূর্ণিমা এবং ক্ষয়বৃদ্ধি।

বৃহস্পতির সবদূরের দুটি উপগ্রহ তার দলের অন্যান্য উপগ্রহের উলটো মুখে চলে। এর থেকে কেউ কেউ আন্দাজ করেন, এরা এককালে ছিল দুটো গ্রহিকা, বৃহস্পতির টানে ধরা পড়ে গেছে।

আলো যে এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে তা প্রথম স্থির হয় বৃহস্পতির চন্দ্রগ্রহণ থেকে। হিসাব মতে বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ যখন ঘটবার কথা, প্রত্যেক বারে তার কিছুকাল পরে ঘটতে দেখা যায়। তার কারণ, ওর আলো আমাদের চোখে পড়তে কিছু দেরি করে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে আলো চলে, এ যদি না হত তা হলে গ্রহণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণের ঘটনাটা দেখা যেত। পৃথিবী থেকে এই উপগ্রহের দূরত্ব মেপে ও গ্রহণের মেয়াদ কতটা পেরিয়েছে সেটা লক্ষ্য ক'রে আলোর বেগ প্রথম হিসাব করা হয়।

বৃহস্পতির নিজস্ব আলো নেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহস্পতির নয়-নয়টি উপগ্রহের গ্রহণের সময়। গ্রহণটা হয় কী ক'রে ভেবে দেখো। কোনো এক যোগাযোগে যখন সূর্য থাকে পিছনে, আর গ্রহ থাকে আলো আড়াল ক'রে সূর্যের সামনে, আর তারও সামনে থাকে গ্রহের ছায়ায় উপগ্রহ, তখনই সূর্যালোক পেতে বাধা পেয়ে উপগ্রহে লাগে গ্রহণ। কিন্তু মধ্যবর্তী গ্রহের নিজেরই যদি আলো থাকত, তা হলে সেই আলো পড়ত উপগ্রহে, গ্রহণ হতেই পারত না। আমাদের চাঁদের গ্রহণেও সেই একই কথা। চাঁদের কাছ থেকে সূর্যকে যখন সে আড়াল করে, তখন জ্যোতির্হীন পৃথিবী চাঁদকে ছায়াই দিতে পারে, নিজের থেকে আলো দিতে পারে না।

বৃহস্পতিগ্রহের পরের পংক্তিতে আসে শনিগ্রহ।

এ গ্রহ আছে সূর্য থেকে ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে। আর ২৯½ বছরে এক পাক তার সূর্যপ্রদক্ষিণ। শনির বেগ বৃহস্পতির চেয়েও কম— এক সেকেণ্ডে ছ'মাইল মাত্র। বৃহস্পতি ছাড়া সৌরজগতের অন্য গ্রহের চেয়ে এর আকার অনেক বড়ো; এর ব্যাস পৃথিবীর প্রায় ৯ গুণ। পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে নয়গুণ বড়ো হয়েও এক পাক ঘুর খেতে ওর লাগে পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়েও কম সময়। এত জোরে ঘুরছে ব'লে সেই বেগের ঠেলায় ওর আকার হয়েছে কিছু চ্যাপটা ধরনের। এত বড়ো এর আয়তন অথচ ওজন পৃথিবীর ৯৫ গুণ মাত্র বেশি। এত হালকা ব'লে এই প্রকাণ্ড আয়তন সত্বেও টানবার শক্তি পৃথিবীর চেয়ে এর বেশি নয়। একটি মেঘের আবরণ একে ঘিরে আছে, যার আকার-বদল মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শনির উপগ্রহ আছে নয়টি। সব চেয়ে বড়ো যেটি, আয়তনে সে বুধগ্রহের চেয়েও বড়ো, প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থাকে, ষোলো দিনে তার প্রদক্ষিণ শেষ হয়।

শনিগ্রহের বেষ্টনীর বর্ণচ্ছটা-পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই বেষ্টনীর যেসব অংশ গ্রহের কাছাকাছি আছে তাদের চলনবেগ বাইরের দূরবর্তী অংশের চেয়ে অনেক বেশি। বেষ্টনী যদি অখণ্ড চাকার মতো হত, তা হলে ঘূর্ণিচাকার নিয়মে বেগটা বাইরের দিকে বেশি হত। কিন্তু শনির বেষ্টনী যদি খণ্ড খণ্ড জিনিস নিয়ে হয় তা হলে তাদের যে দল গ্রহের কাছে, টানের জোরে তারাই ঘুরবে বেশি বেগে। এইসব লক্ষ লক্ষ টুকরো-উপগ্রহ ছাড়াও ন'টি বড়ো উপগ্রহ ভিন্নপথে শনিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে।

কী ক'রে যে এ গ্রহের চারি দিকে দলে দলে ছোটো ছোটো টুকরো সৃষ্টি হল, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে মত তারই কিছু এখানে বলা যাক। গ্রহের প্রবল টানে কোনো উপগ্রহই আপন গোল আকার রাখতে পারে না, শেষ পর্যন্ত অনেকটা তার ডিমের মতো চেহারা হয়। অবশেষে এমন এক সময় আসে যখন টান আর সহ্য করতে না পেরে উপগ্রহ ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। এই ছোটো টুকরো দুটিও আবার ভাঙতে থাকে। এমনি করে ভাঙতে ভাঙতে একটিমাত্র উপগ্রহ থেকে লক্ষ লক্ষ টুকরো বেরোনো অসম্ভব হয় না। চাঁদেরও একদিন এই দশা হবার কথা। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রত্যেক গ্রহকে ঘিরে আছে একটি করে অদৃশ্য মণ্ডলীর বেড়া, তাকে বলে বিপদের গণ্ডি। তার মধ্যে এসে পড়লেই উপগ্রহের দেহ কেঁপে উঠে ডিমের মতো লম্বাটে আকার ধরে, তার পরে থাকে ভাঙতে। শেষকালে টুকরোগুলো জোট বেঁধে ঘুরতে থাকে গ্রহের চার দিকে। বিজ্ঞানীদের মতে বৃহস্পতির প্রথম উপগ্রহ এই অদৃশ্য বিপদগণ্ডির কাছে এসে পড়েছে, আর-কিছুদিন পরে সেখানে ঢুকলেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। শনিগ্রহের মতো বৃহস্পতির চার দিক ঘিরে তখন তৈরি হবে একটি উজ্জ্বল

বেষ্টনী। শনিগ্রহের চারি দিকে যে বেষ্টনীর কথা বলা হল তার সৃষ্টি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন যে, অনেকদিন আগে শনির একটি উপগ্রহ ঘুরতে ঘুরতে এর বিপদগণ্ডির ভিতরে গিয়ে পড়েছিল, তার ফলে উপগ্রহটা ভেঙে টুকরো হয়ে আজও এই গ্রহের চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পৃথিবীর বিপদগণ্ডির অনেকটা বাইরে আছে বলে চাঁদের যা পরিবর্তন হয়েছে তা খুব বেশি না। পৃথিবীর টানের জোরে আস্তে আস্তে চাঁদ তার কাছে এগিয়ে আসছে, তার পরে যখন ঐ বেড়ার মধ্যে অপঘাতের এলেকায় প্রবেশ করবে তখন যাবে টুকরো টুকরো হয়ে, আর সেই টুকরোগুলো পৃথিবীর চার দিক ঘিরে শনিগ্রহের নকল করতে থাকবে, তখন হবে তার শনির দশা।

কেম্ব্রিজের অধ্যাপক জেফ্রের মত এর উলটো। তিনি বলেন চাঁদে পৃথিবীতে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। অবশেষে চান্দ্রমাসে সৌরমাসে সমান হয়ে যাবে, তখন কাছের দিকে টানবার পালা শুরু হবে।

বৃহস্পতির চেয়ে শনি সূর্য থেকে আরও বেশি দূরে—কাজেই ঠাণ্ডাও আরও বেশি। এর বাইরের দিকের বায়ুমণ্ডল অনেকটা বৃহস্পতির মতো, কেবল অ্যামোনিয়া তত বেশি জানা যায় না, আলেয়া গ্যাসের পরিমাণ শনিতে বৃহস্পতির চেয়ে বেশি। শনি যদিও পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে অনেক বড়ো তবু তার ওজন সে-পরিমাণে বেশি নয়। বৃহস্পতির মতো এর বায়ুমণ্ডল গভীর হবার কথা, কেননা এর টান এড়িয়ে বাতাসের পালাবার পথ নেই। এর বাতাসের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি বলেই এর গড়পড়তা ওজন আয়তনের তুলনায় এত কম। এর ভিতরের কঠিন অংশের ব্যাস ২৪০০০ মাইল, তার উপরে প্রায় ৬০০০ মাইল বরফ জমেছে, আর তার উপরে আছে ১৬০০০ মাইল হাওয়া।

শনিগ্রহের পরের মণ্ডলীতে আছে য়ুরেনস নামক এক নতুন-খবর-পাওয়া গ্রহ।

এ গ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জানা সম্ভব হয় নি। এর আয়তন পৃথিবীর ৬৪ গুণ বেশি। সূর্য থেকে ১৭৮ কোটি ২৮ লক্ষ মাইল দূরে থেকে সেকেণ্ডে চার মাইল বেগে ৮৪ বছরে একবার তাকে প্রদক্ষিণ করে। এত বড়ো এর আয়তন কিন্তু খুব দূরে আছে বলে দুরবীন ছাড়া একে দেখা যায় না। যে জিনিসে এ গ্রহ তৈরি তা জলের চেয়ে একটু ঘন, তাই পৃথিবী থেকে বহু গুণ বড়ো হলেও, এর ওজন পৃথিবীর ১৫ গুণ মাত্র।

১০ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে এ গ্রহ একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। চারটি উপগ্রহ নিজ নিজ পথে ক্রমাগত একে প্রদক্ষিণ করছে।

য়ুরেনস আবিষ্কারের কিছুকাল পরেই পণ্ডিতেরা য়ুরেনসের বেহিসাবি চলন দেখে স্থির করলেন, এ গ্রহ পথের নিয়ম ভেঙেছে আর-একটা কোনো গ্রহের টানে। খুঁজতে খুঁজতে বেরল সেই গ্রহ। তার নামকরণ হল নেপচুন।

সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৭৯ কোটি ৩৫ লক্ষ মাইল; প্রায় ১৬৪ বছরে এ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর ব্যাস প্রায় ৩৩০০০ মাইল, য়ুরেনসের চেয়ে কিছু বড়ো। দূরবীনে শুধু ছোটো একটি সবুজ থালার মতো দেখায়। একটি উপগ্রহ ২ লক্ষ ২২ হাজার মাইল দূরে থেকে ৫ দিন ২১ ঘণ্টায় একে একবার ঘুরে আসছে। উপগ্রহের দূরত্ব এবং এই গ্রহের আয়তন থেকে হিসাব করা হয়েছে যে এর বস্তুপদার্থ জল থেকে কিছু ভারি, ওজনে এ প্রায় য়ুরেনস-এর সমান। কত বেগে এ গ্রহ মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘুরছে তা আজও একেবারে ঠিক হয় নি।

নেপচুনের আকর্ষণে য়ুরেনস-এর যে নূতন পথে চলার কথা তা হিসেব করার পরেও দেখা গেল যে য়ুরেনস ঠিক সে পথ ধরেও চলছে না। তার থেকে বোঝা গেল যে নেপচুন ছাড়া এ গ্রহের গতিপথের বাইরে রয়েছে আরও একটা জ্যোতিষ্ক। ১৯৩০ সালে বেরিয়ে পড়ল নূতন এক গ্রহ। তার নাম দেওয়া হল প্লুটো। এ গ্রহ এত ছোটো ও এত দূরে যে দূরবীনেও একে দেখা যায় না। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিঃসন্দেহে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। এই গ্রহই সূর্য থেকে সব চেয়ে দূরে, তাই আলো-উত্তাপ পাচ্ছে এত কম যে, এর অবস্থা আমরা কল্পনাও করতে পারি নে।

৩৯৬ কোটি মাইল দূর থেকে প্রায় ২৫০ বছরে এ গ্রহ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

প্লুটো গ্রহটির তাপমাত্রা হবে বরফগলা শৈত্যের ৪৪৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পরিমাপের নিচে। এত শীতে অত্যন্ত দুরন্ত গ্যাসও তরল এমনকি নিরেট হয়ে যায়। আঙ্গারিক গ্যাস, অ্যামোনিয়া, নাইট্রজেন প্রভৃতি বায়ব পদার্থগুলো জমে বরফপিণ্ডে গ্রহটাকে নিশ্চয় ঢেকে ফেলেছে। কেউ কেউ মনে করেন সৌরলোকের শেষসীমানায় কতকগুলো ছোটো ছোটো গ্রহ ছিটিয়ে আছে, প্লুটো তাদের মধ্যে একটি। কিন্তু এ মতের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি, কখনও যাবে কি না বলা যায় না। এখনকার চেয়ে অনেক প্রবলতর দূরবীন ঐ দূরত্বের যবনিকা তুলতে যদি পারে তা হলেই সংশয়ের সমাধান হবে।

ভূলোক

অন্য গ্রহের আকারের ও চলাফেরার কিছু কিছু খবর জমেছে, কেবল পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যার শরীরের গঠনরীতি আমরা পুরোপুরি অনেকটা জানতে পেরেছি। গ্যাসীয় অবস্থা পেরিয়ে যখন থেকে তার দেহ আঁট বেঁধেছে তখন থেকেই সর্বাঙ্গে তার ইতিহাসের নানা সংকেতচিহ্ন আঁকা পড়ছে।

পৃথিবীর উপরকার স্তরে কোনো ঢাকা না থাকাতে সেই ভাগটা শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হল, আর ভিতরের স্তর ক্রমশ নিরেট হতে থাকল। দুধের সর ঠাণ্ডা হতে হতে যেমন কুঁচকিয়ে যায়, পৃথিবীর উপরকার স্তর ঠাণ্ডা হতে হতে তেমনি কুঁচকিয়ে যেতে লাগল। কুঁচকিয়ে গেলে দুধের সর যেটুকু অসমান হয় সে আমরা গণ্যই করি নে। কিন্তু কুঁচকিয়ে- যাওয়া পৃথিবীর স্তরের অসমানতা তেমন সামান্য ব'লে উড়িয়ে দেবার নয়। নিচের স্তর এই অসমানতার ভার বইবার মতো পাকা হয় নি। তাই ভালো নির্ভর না পাওয়াতে উপরের শক্ত স্তরটা ভেঙে তুবড়ে উঁচুনিচু হতে থাকল, দেখা দিল পাহাড়পর্বত। বুড়ো মানুষের কপালের চামড়া কুঁচকে যেমন বলি পড়ে, তেমনি এগুলো যেন পৃথিবীর উপরকার চামড়ার বলি। সমস্ত পৃথিবীর বৃহৎ গভীরতার তুলনায় এই পাহাড়পর্বত মানুষের চামড়ার উপর বলিচিহ্নের চেয়ে কম বই বেশি নয়।

প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে কুঁচকে-যাওয়া স্তরের উঁচুনিচুতে কোথাও নামল গহ্বর, কোথাও উঠল পর্বত। গহ্বরগুলো তখনও জলে ভরতি হয় নি। কেননা তখনও পৃথিবীর তাপে জলও ছিল বাষ্প হয়ে। ক্রমে মাটি হল ঠাণ্ডা, বাষ্প হল জল। সেই জলে গহ্বর ভরে উঠে হল সমুদ্র।

পৃথিবীর অনেকখানি জলের বাষ্প তো তরল হল; কিন্তু হাওয়ার প্রধান গ্যাসগুলো গ্যাসই রয়ে গেল। তাদের তরল করা সহজ নয়। যতটা ঠাণ্ডা হলে তারা তরল হতে পারত ততটা ঠাণ্ডায় জল যেত জমে, আগাগোড়া পৃথিবী হত বরফের বর্মে আবৃত। মাঝারি পরিমাপের গরমে-ঠাণ্ডায় অক্সিজেন নাইট্রজেন প্রভৃতি বাতাসের গ্যাসীয় জিনিসগুলি চলাফেরা করছে সহজে, আমরা নিশ্বাস নিয়ে বাঁচছি।

পৃথিবীর ভিতরের দিকে সংকোচন এখনও একেবারে থেমে যায় নি। তারই নড়নের ঠেলায় হঠাৎ কোথাও তলার জায়গা যদি নিচে থেকে কিছু সরে যায়, তা হলে উপরের শক্ত আবরণ ভেঙে গিয়ে তার উপরে চাপ দিয়ে পড়ে, দুলিয়ে দেয় পৃথিবীর স্তরকে, ভূমিকম্প জেগে ওঠে। আবার কোনো কোনো জায়গায় ভাঙা আবরণের চাপে নিচের তপ্ত তরল জিনিস উপরে উছলে ওঠে।

পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা জানতে গেলে যতটা খুঁড়ে দেখা দরকার এখনও ততটা নিচে পর্যন্ত খোঁড়া হয় নি। কয়লার খোঁজে মানুষ মাটির যতটা নিচে নেমেছে সে এক মাইলের বেশি নয়। তাতে কেবল এই খবরটা পাওয়া গেছে যে, যত পৃথিবীর নিচের দিকে যাওয়া যায় ততই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গরম বাড়তে থাকে। এই উত্তাপবৃদ্ধির পরিমাণ সব জায়গায় সমান নয়, স্থানভেদে মাত্রাভেদ ঘটে। এক-সময়ে একটা মত চলতি ছিল যে, ভূস্তরটা ভাসছে পৃথিবীর ভিতরকার তাপে-গলা তরল ধাতুর উপরে। এখনকার মত হচ্ছে পৃথিবীটা নিরেট, ভিতরের দিকে তাপের অস্তিত্ব দেখা যায় বটে কিন্তু পৃথিবীর স্তরে যেসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, যথেষ্ট তাপ পাওয়া যাচ্ছে তাদের থেকে। তার অন্তঃকেন্দ্রের উপাদান লোহার চেয়ে নিবিড়। সম্ভবত সে স্থানটি খুব গরম, কিন্তু এতটা নয় যাতে ভিতরকার জিনিস গলে যেতে পারে। আন্দাজ করা যাচ্ছে সেখানকার জিনিসটা লোহা আর নিকেল, তারা আছে দু'হাজার মাইল জুড়ে, আর তাদের বেড়ে আছে যে একটা খোল সে পুরু দু'হাজার মাইলের উপরে।

পৃথিবীর সমস্তটাই যদি জলময় হত তা হলে তার ওজন যতটা হ'ত জলে স্থলে মিশিয়ে তার চেয়ে তার ওজন সাড়ে-পাঁচগুণ বেশি। তার উপরকার তলার পাথর জলের চেয়ে তিনগুণ বেশি ঘন। তা হলে তার ভিতরে আরও বেশি ভারি জিনিস আছে ধরে নিতে হবে। কেবল যে উপরকার চাপেই তাদের ঘনত্ব বেড়ে গেছে তা নয় সেখানকার বস্তুপুঞ্জের ভার স্বভাবতই বেশি।

পৃথিবীকে ঘিরে আছে যে বাতাস তার শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন। আর আর যেসব গ্যাস আছে সে অতি সামান্য। অক্সিজেন গ্যাস্ মিশুক গ্যাস, লোহার সঙ্গে মিশে মর্চে ধরায়, অঙ্গারপদার্থের সঙ্গে মিশে আগুন জ্বালায়— এমনি করে বায়ুমণ্ডল থেকে নিয়ত তার অনেক খরচ হতে থাকে। এদিকে গাছপালারা বাতাসের অঙ্গারাম্ল গ্যাসের থেকে নিজের প্রয়োজনে অঙ্গার আদায় করে নিয়ে অক্সিজেন-ভাগ বাতাসকে ফিরিয়ে দেয়। এ না হলে পৃথিবীর হাওয়া অঙ্গারাম্ল গ্যাসে ভরে যেত, মানুষ পেত না তার নিশ্বাসের বায়ু।

আকাশের অনেকটা উঁচু পর্যন্ত হাওয়ার বেশি পরিবর্তন হয় নি। যেসব গ্যাস মিশিয়ে হাওয়া তৈরি তাদের অনেকটাই আরও অনেক উঁচুতে পৌঁছয় না। খুব সম্ভব সব চেয়ে হালকা দুটো গ্যাস অর্থাৎ হীলিয়ম এবং হাইড্রজেনে মিশনো সেখানকার হাওয়া।

বাতাসের ঘনত্ব কমতে কমতে ক্রমশই বাতাস অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। বাহিরলোক থেকে পৃথিবীতে যে উল্কাপাত হয় পৃথিবীর হাওয়ার ঘর্ষণে তা জলে ওঠে, তাদের অনেকেরই এই জ্বলন প্রথম দেখা দেয় ১২০ মাইল উপরে। ধরে নিতে হবে তার ঊর্ধ্বে আরও অনেকখানি বাতাস আছে যার ভিতর দিয়ে আসতে আসতে তবে এই জ্বলনের অবস্থা ঘটে।

সূর্যের আলো নয় কোটি মাইল পেরিয়ে আসে পৃথিবীতে। গ্রহবেষ্টনকারী আকাশের শূন্যতা পার হয়ে আসতে তেজের বেশি ক্ষয় হবার কথা নয়। যে প্রচণ্ড তেজ নিয়ে সে বায়ুমণ্ডলের প্রত্যন্ত দেশে পৌঁছয় তার আঘাতে সেখানকার হাওয়ার পরমাণু নিশ্চয়ই ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে যায়— কেউ আস্ত থাকে না। বাতাসের সর্বোচ্চ ভাগে ভাঙা পরমাণুর যে স্তরের সৃষ্টি হয় তাকে নাম দেওয়া হয় (F 2) এফ ২ স্তর।

সেখানকার খরচের পর বাকি সূর্যকিরণ নিচের ঘনতর বায়ুমণ্ডলকে আক্রমণ করে, সেখানেও পরমাণুভাঙা যে স্তরের উদ্ভব হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে (F 1) এফ ১ স্তর।

আরও নিচে আরও ঘন বাতাসে সূর্যকিরণের আঘাতে পঙ্গু পরমাণুর আরও-একটা যে স্তর দেখা দেয়, তার নাম (E) ই স্তর।

সূর্যকিরণের বেগনি-পারের রশ্মি পরমাণু-ভাঙচুরের কাজে সব চেয়ে প্রধান উদ্যোগী। উচ্চতর স্তরে উপদ্রব শেষ করতে করতে বেগনি-পারের রশ্মি অনেকখানি নিঃস্ব হয়ে নিচের হাওয়ায় অল্প পৌঁছয়। সেটা আমাদের রক্ষে। বেশি হলে সইত না।

সূর্যকিরণ ছাড়া আরও অনেক কালাপাহাড় দূর থেকে আসে বাতাসকে অদৃশ্য গদাঘাত করতে। যেমন উল্কা, তাদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এরা ছুটে আসে গ্রহ-আকাশের ভিতর দিয়ে এক সেকেণ্ডে দশ থেকে একশো মাইল বেগে। হাওয়ার ঘর্ষণে তাদের মধ্যে তাপ জেগে ওঠে, তার মাত্রা হয় তিন হাজার থেকে সাত হাজার ফারেনহাইট ডিগ্রি পর্যন্ত; তাতে করে বেগনি-পারের আলোর তীক্ষ্ণ বাণ তূণমুক্ত হয়ে আসে, বাতাসের অণুগুলোর গায়ে প'ড়ে তাদের জ্বালিয়ে চুরমার করে দেয়। এ ছাড়া আর-এক রশ্মিবর্ষণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সে কস্‌মিক রশ্মি। বিশ্বে সে-ই হচ্ছে সব চেয়ে প্রবল শক্তির বাহন।

পৃথিবীর বাতাসে আছে অক্সিজেন নাইট্রজেন প্রভৃতি গ্যাসের কোটি কোটি অণুকণা, তা'রা অতি দ্রুতবেগে ক্রমাগতই ঘোরাঘুরি করছে, পরস্পরের মধ্যে সংঘাত চলছেই। যারা হালকা কণা তাদের দৌড় বেশি। সমগ্র দলের যে বেগ তার চেয়ে

স্বতন্ত্র ছুটকো অণুর বেগ অনেক বেশি। সেইজন্যে পৃথিবীর বাহির আঙিনার সীমা থেকে হাইড্রজেনের খুচরো অণু প্রায়ই পৃথিবীর টান কাটিয়ে বাইরে দৌড় দিচ্ছে। কিন্তু দলের বাইরে অক্সিজেন নাইট্রজেনের অণুকণার গতি কখনও ধৈর্যহারা পলাতকার বেগ পায় না। সেই কারণে পৃথিবীর বাতাসে তাদের দৈন্য ঘটে নি; কেবল তরুণ বয়সে যে হাইড্রজেন ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে প্রধান গ্যাসীয় সম্পত্তি, ক্রমে ক্রমে সেটার অনেকখানিই সে খুইয়ে ফেলেছে।

বড়ো বড়ো ডানাওয়ালা পাখি শুধু ডানা ছড়িয়েই অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ার উপরে ভেসে বেড়ায়, বুঝতে পারি পাখিকে নির্ভর দিতে পারে এতটা ঘনতা আছে বাতাসের। বস্তুত কঠিন ও তরল জিনিসের মতোই হাওয়ারও ওজন মেলে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত হাওয়া আছে অনেক মাইল ধরে। সেই হাওয়ার চাপ এক ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া জিনিসের উপর প্রায় সাতাশ মণ। একজন সাধারণ মানুষের শরীরে চাপ পড়ে প্রায় ৪০০ মণের উপর। তবুও তা টের পাই নে। যেমন উপর থেকে তেমনি নিচের থেকে, আবার আমাদের শরীরের মধ্যে যে হাওয়া আছে তার থেকে সমানভাবে বাতাসের চাপ আর ঠেলা লাগছে ব'লে বাতাসের ভার আমাদের পীড়া দিচ্ছে না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আপন আবরণে দিনের বেলায় সূর্যের তাপ অনেকটা ঠেকিয়ে রাখে, আর রাত্রিতে মহাশূন্যের প্রবল ঠাণ্ডাটাকেও বাধা দেয়। চাঁদের গায়ে হাওয়ার উড়ুনি নেই তাই সে সূর্যের তাপে ফুটন্ত জলের সমান গরম হয়ে ওঠে। অথচ গ্রহণের সময় যখনই পৃথিবী চাঁদের উপর ছায়া ফেলে অমনি দেখতে দেখতেই সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হাওয়া থাকলে তাপটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত। চাঁদের কেবল এইমাত্র ত্রুটি নয়; বাতাস নেই বলে সে একেবারে বোবা, কোথাও একটু শব্দ হবার জো নেই। বিশেষভাবে নাড়া পেলে বাতাসে নানা আয়তনের সূক্ষ্ম ঢেউ ওঠে, সেইগুলো নানা কাঁপনের ঘা দেয় আমাদের কানের ভিতরকার পাতলা চামড়ায়, তখন সেইসব ঢেউ নানা রকম আওয়াজ হয়ে আমাদের কাছে সাড়া দিতে থাকে। আরও-একটি কাজ আছে বাতাসের। কোনো কারণে রৌদ্র যেখানে কিছু বাধা পায় সেখানে ছায়াতেও যথেষ্ট আলো থাকে, এই আলো বিছিয়ে দেয় বাতাস। নইলে যেখানটিতে রোদ পড়ত কেবল সেইখানেই আলো হত। ছায়া ব'লে কিছুই থাকত না। তীব্র আলোর ঠিক পাশেই থাকত ঘোর অন্ধকার। গাছের মাথার উপর রোদ্দুর উঠত চোখ রাঙিয়ে আর তার তলা হত মিশমিশে কালো, ঘরের ছাঁদে ঝাঁ ঝাঁ করত দুইপহরের রোদের তেজ, ঘরের ভিতর থাকত দুইপহরের অমাবস্যার রাত্রি। প্রদীপ

জ্বালার কথা চিন্তা করাই হত মিথ্যে, কেননা পৃথিবীর বাতাসে অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যেই সবকিছু জ্বলে।

গাছের সবুজ পাতায় থাকে গোলাকার অণুপদার্থ, তাদের মধ্যে ক্লরফিল বলে একটি পদার্থ আছে— তারাই সূর্যের আলো জমা করে রাখে গাছের নানা বস্তুতে। তাদের শক্তিতেই তৈরি হচ্ছে ফলেফসলে আমাদের খাদ্য, আর গাছের ডালেতে গুঁড়ির কাঠ। পৃথিবীর বাতাসে আছে অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাস সামান্য পরিমাণে। উদ্ভিদবস্তুতে যত অঙ্গারপদার্থ আছে, যার থেকে কয়লা হয়, সমস্ত এই গ্যাস থেকে নেওয়া। এই অক্সিজেনী-আঙ্গারিক গ্যাস মানুষের দেহে কেবল যে কাজে লাগে না তা নয়, একে শরীর থেকে বের করে দিতে না পারলে আমরা মারা পড়ি। কিন্তু গাছ আপন ক্লরফিলের যোগে এই অক্সিজেনী আঙ্গারিককেও জলে মিশিয়ে ধানে গমে আমাদের জন্য যে খাবার বানিয়ে তোলে সেই খাদ্যের ভিতর দিয়ে সূর্যতাপের শক্তিকে আমরা প্রাণের কাজে লাগাতে পারি। এই শক্তিকে আকাশ থেকে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, গাছের আছে। গাছের থেকে আমরা নিই ধার করে। পৃথিবীতে সমস্ত জন্তুরা মিলে যে অক্সিজেন-মিশ্রিত আঙ্গারিক বাষ্প নিশ্বাসের সঙ্গে বের করে দেয় সেটা লাগে গাছপালার প্রয়োজনে। আগুন-জ্বালানি থেকে, উদ্ভিদ ও জন্তুদেহের পচানি থেকেও এই বাষ্প বাতাসে ছড়াতে থাকে। পৃথিবীতে কলকারখানায় রান্নার কাজে কয়লা যা পোড়ানো হয় সে বড়ো কম নয়। তার থেকে উদ্ভব হয় বহু কোটি মণ অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাস। গাছের পক্ষে যে হাওয়ার ভোজের দরকার সেটা এমনি করে জুটতে থাকে ত্যাজ্য পদার্থ থেকে।

বাতাসকে মৌলিক পদার্থ বলা চলে না, ওটা মিশল জিনিস। তাতে মিশেছে নানা গ্যাস কিন্তু মেলে নি, একত্রে আছে, এক হয় নি। বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন তার প্রায় চার গুণ আছে নাইট্রজেন। কেবলমাত্র নাইট্রজেন থাকলে দম আটকিয়ে মরে যেতুম। কেবলমাত্র অক্সিজেনে আমাদের প্রাণবস্তু পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যেত। এই প্রাণবস্তু কিছু পরিমাণ জ্বলে, আবার জ্বলতে কিছু পরিমাণ বাধা পায়, তবেই আমরা দুই বাড়াবাড়ির মাঝখানে থেকে বাঁচতে পারি।

সমস্ত বায়ুমণ্ডল জলে স্যাংসেঁতে। যে জল থাকে মেঘে, তার চেয়ে অনেক বেশি জল আছে হাওয়ায়।

উপরকার বায়ুমণ্ডলে ভাঙা পরমাণুর বৈদ্যুতস্তরের কথা পূর্বে বলেছি। সে ছাড়া সহজ বাতাসের দুটো স্তর আছে। এর যে প্রথম থাকটা পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে তার বৈজ্ঞানিক নাম troposphere, বাংলায় একে ক্ষুব্ধস্তর বলা যেতে পারে। পাঁচ থেকে

দশ মাইলের বেশি এর চড়াই নয়। সমগ্র বায়ুস্তরগুলের মাপে এই ক্ষুব্ধস্তরের উচ্চতা খুবই কম, কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই আছে বাতাসের সমস্ত পদার্থের প্রায় ৯০ ভাগ। কাজেই অন্য স্তরের চেয়ে এ স্তর অনেক বেশি ঘন। পৃথিবীর একেবারে গায়ে লেগে আছে ব'লে এই স্তরে সর্বদা পৃথিবীর উত্তাপের ছোঁয়াচ লাগে। সেই উত্তাপের কমায়-বাড়ায় হাওয়া এখানে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে। এই স্তরেই তাই ঝড়বৃষ্টি। এর আরও উপরে যে স্তর পৃথিবীর তাপ সেখানে ঝড়তুফান চালান করতে পারে না। তাই সেখানকার হাওয়া শান্ত। পণ্ডিতেরা এ স্তরের নাম দিয়েছেন stratosphere, বাংলায় আমরা বলব স্তব্ধস্তর।

আদি সূর্য থেকে যেমন পৃথিবী বেরিয়ে এসেছে তেমনি বাষ্পদেহী আদিম পৃথিবী থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। তার পরে কোটি কোটি বৎসরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হল, চাঁদও হল তাই।

২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে থেকে ২৭⅓ দিনে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। সেই প্রদক্ষিণের কালে কেবল একটা পিঠ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে রেখেছে। এর ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল, এর উপাদান জল থেকে ৩½ গুণ ভারি। অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের তুলনায় পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব খুবই কম ব'লে একে এত উজ্জ্বল ও আয়তনে এত বড়ো দেখায়। আশিটি চাঁদ একসঙ্গে ওজন করলে পৃথিবীর ওজনের সমান হবে। দুরবীনে চাঁদকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় পৃথিবীর মতোই শক্ত জিনিসে এ তৈরি। ওর উপরে আছে বড়ো বড়ো গহ্বর আর বড়ো বড়ো পাহাড়।

পৃথিবীর টানে চন্দ্র পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে। এক পাক ঘুরতে তার এক মাসের কিছু কম লাগে। গড়পড়তায় তার গতিবেগ এক সেকেণ্ডে আধ মাইলের বেশি নয়। পৃথিবী ঘোরে সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘুরতে চাঁদের এক মাসের সমানই লাগে। তার দিন আর বৎসর চলে একই রকম ধীরমন্দ চালে।

চাঁদের ওজন থেকে হিসেব করা হয়েছে যে কোনো জিনিসের গতিবেগ যদি সেখানে সেকেণ্ডে ১½ মাইল হয় তা হলে চাঁদের টান অগ্রাহ্য করে তা ছুটে বাইরে যেতে পারে। চাঁদ যে নিয়মে অতিমাত্রায় রোদ পোহায় তাতে তার তেতে-ওঠা পিঠের উপরে হাওয়া অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠাতে চাঁদ তার বাতাসের অণুদের ধরে রাখতে পারে নি, তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের অণু গরমে চঞ্চল হয়ে চাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল-হাওয়া যেখানে নেই সেখানে কোনো

রূকমের প্রাণ টিকতে পারে বলে আমরা জানি নে। চাঁদকে একটা তালপাকানো রুক্ষভূমি বলা যেতে পারে।

রাতের বেলায় যাদের আমরা খসে-পড়া তারা বলি সেগুলো যে তারা নয় তা আজ আর কাউকে বলতে হবে না। সেই-উল্কাপিণ্ডগুলো পৃথিবীর টানে দিনরাত লাখো লাখো পড়ছে পৃথিবীর উপর। তার অধিকাংশই বাতাসের ঘেঁষ লেগে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যাচ্ছে। যেগুলো বড়ো আয়তনের, তা'রা জ্বলতে জ্বলতে মাটিতে এসে পৌঁছয়, বোমার মতো যায় ফেটে, চার দিকে যা পায় দেয় ছারখার করে।

চাঁদেও ক্রমাগত এই উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে। ওদের ঠেকিয়ে ছাই করে দেবার মতো একটু হাওয়া নেই, অবাধে ওরা ঢেলা মারছে চাঁদের সর্বাঙ্গে। বেগ কম নয়, সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল, সুতরাং যা মারে সর্বনেশে জোরে।

চাঁদে বড়ো বড়ো গর্তের উৎপত্তি একদা-উৎসারিত অগ্নি-উৎস থেকেই। যে গলন্তপদার্থ ও ছাই তখন বেরিয়ে এসেছিল, হাওয়া-জল না থাকায় এত যুগ ধরেও তাদের কোনো বদল হতে পারে নি। ছাইঢাকা আছে ব'লে সূর্যের আলো এই আবরণ ভেদ করে খুব বেশি নিচে যেতে পারে না, আর নিচের উত্তাপও উপরে আসতে পারে না।

চাঁদের যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে তার উত্তাপ প্রায় ফুটন্ত জলের সমান, আর যেখানে আলো পড়ে না তা এত ঠাণ্ডা হয় যে বরফের শৈত্যের চেয়ে তা প্রায় ২৫০ ফারেনহাইট ডিগ্রি নিচে থাকে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া এসে যখন চাঁদের উপরে পড়ে তখন তার উত্তাপ কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় ৩৪৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট কমে যায়।

হাওয়া না থাকায় ও ছাইয়ের আবরণ থাকায় সূর্যের আলো নিচে প্রবেশ করতে পারে না ব'লে সঞ্চিত কোনো উত্তাপই চাঁদে নেই; তাই এত তাড়াতাড়ি এর উত্তাপ কমে আসে। এসব প্রমাণ থেকে বলা যায় যে, আগ্নেয়গিরির ছাই ঢেকে রেখেছে চাঁদের প্রায় সব জায়গা।

চাঁদ পৃথিবীর কাছের উপগ্রহ। তার টানের জোর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে, সেখানে জোয়ারভাঁটা খেলতে থাকে; আর শুনেছি আমাদের শরীরে জরজারি বাতের ব্যথাও ঐ টানের জোরে জেগে ওঠে। বাতের রোগীরা ভয় করে অমাবস্যা-পূর্ণিমাকে।

আদিকালে পৃথিবীতে জীবনের কোনো চিহ্নই ছিল না। প্রায় সত্তর-আশি কোটি বছর ধরে চলেছিল নানা আকারে তেজের উৎপাত। কোথাও অগ্নিগিরি

ফুঁসছে তপ্ত বাষ্প, উগরে দিচ্ছে তরল ধাতু, ফোয়ারা ছোটাচ্ছে গরম জলের। নিচের থেকে ঠেলা খেয়ে কাঁপছে ফাটছে ভূমিতল, উঠে পড়ছে পাহাড়পর্বত, তলিয়ে যাচ্ছে ভূখণ্ড।

পৃথিবীর শুরু থেকে প্রায় দেড়শো কোটি বছর যখন পার হল তখন অশান্ত আদিযুগের মাথা-কুটে-মরা অনেকটা থেমেছে। এমন সময়ে সৃষ্টির সকলের চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা দেখা দিল। কেমন করে কোথা থেকে প্রাণের ও তার পরে ক্রমশ মনের উদ্‌ভব হল তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার আগে পৃথিবীতে সৃষ্টির কারখানাঘরে তোলাপাড়া ভাঙাগড়া চলছিল প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে। তার উপকরণ ছিল মাটি জল, লোহা পাথর প্রভৃতি; আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল অক্সিজেন, হাইড্রজেন, নাইট্রজেন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস। নানা রকমের প্রচণ্ড আঘাতে তাদেরই উলটপালট করে জোড়াতাড়া দিয়ে নদী-পাহাড়-সমুদ্রের রচনা ও অদলবদল চলছিল। এমন সময়ে এই বিরাট জীবহীনতার মধ্যে দেখা দিল প্রাণ, আর তার সঙ্গে মন। এদের পূর্ববর্তী পদার্থরাশির সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই।

নক্ষত্রদের প্রথম আরম্ভ যেমন নীহারিকায় তেমনি পৃথিবীতে জীবলোকে প্রথম যা প্রকাশ পেল তাকে বলা যেতে পারে প্রাণের নীহারিকা। সে একরকম অপরিস্ফুট ছড়িয়ে-পড়া প্রাণপদার্থ, ঘন লালার মতো অঙ্গবিভাগহীন— তখনকার ঈষৎ-গরম সমুদ্রজলে ভেসে বেড়াত। তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌। যেমন নক্ষত্র দানা বেঁধে ওঠে আগ্নেয় বাষ্পে, তেমনি বহু যুগ লাগল এর মধ্যে মধ্যে একটি একটি পিণ্ড জমতে। সেইগুলির এক শ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে অমীবা; আকারে অতি ছোটো; অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায়। পঙ্কিল জলের ভিতর থেকে এদের পাওয়া যেতে পারে। এদের মুখ চক্ষু হাত পা নেই। আহারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। দেহপিণ্ডের এক অংশ প্রসারিত করে দিয়ে পায়ের কাজ করিয়ে নেয়। খাবারের সম্পর্কে এলে সেই সাময়িক পা দিয়ে সেটাকে টেনে নেয়। পাকযন্ত্র বানিয়ে নেয় দেহের একটা অংশে। নিজের সমস্ত দেহটাকে ভাগ করে তার বংশবৃদ্ধি হয়। এই অমীবারই আর-এক শাখা দেখা দিল, তারা দেহের চারি দিকে আবরণ বানিয়ে তুললে, শামুকের মতো। সমুদ্রে আছে এদের কোটি কোটি সূক্ষ্ম দেহ। এদের এই দেহপঙ্ক জমে জমে পৃথিবীর স্থানে স্থানে খড়িমাটির পাহাড় তৈরি হয়েছে।

বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু; সেই পরমাণুগুলি অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে অতিসূক্ষ্ম জীবকোষরূপে সংহত হল। প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র, তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা আশ্চর্য শক্তি আছে যাতে করে বাইরে থেকে

খাদ্য নিয়ে নিজেকে পুষ্ট, অনাবশ্যককে ত্যাগ ও নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে। এই বহুগুণিত করার শক্তি দ্বারা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে।

এই জীবাণুকোষ প্রাণলোকে প্রথমে একলা হয়ে দেখা দিয়েছে। তার পরে এরা যত সংঘবদ্ধ হতে থাকল ততই জীবজগতে উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটতে লাগল। যেমন বহুকোটি তারার সমবায়ে একটি নীহারিকা তেমনি বহুকোটি জীবকোষের সমাবেশে এক-একটি দেহ। বংশাবলীর ভিতর দিয়ে এই দেহজগৎ একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে নূতন নূতন রূপের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা এত কাল নক্ষত্রলোক সূর্যলোকের কথা আলোচনা করে এসেছি। তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আশ্চর্য এই প্রাণলোক। উদ্দাম তেজকে শান্ত করে দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন গ্রহরূপে পৃথিবী যে অনতি-ক্ষুব্ধ পরিণতি লাভ করেছে সেই অবস্থাতেই প্রাণ এবং তার সহচর মন-এর আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে একথা যখন চিন্তা করি তখন স্বীকার করতেই হবে জগতে এই পরিণতিই শ্রেষ্ঠ পরিণতি। যদিও প্রমাণ নেই এবং প্রমাণ পাওয়া আপাতত অসম্ভব তবু একথা মানতে মন যায় না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জীবনধারণযোগ্য চৈতন্যপ্রকাশক অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই ঘটেছে, যে, এই হিসাবে পৃথিবী সমস্ত জগৎধারার একমাত্র ব্যতিক্রম।

উপসংহার

একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহুক্রমে বহুকোটি বৎসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল কত গোপনে। দেহে দেহে অপরূপ শিল্পসম্পদশালী তার সৃষ্টিকার্য নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে। যোজনা করবার, শোধন করবার, অতি জটিল কর্মতন্ত্র উদ্‌ভাবন ও চালনা করবার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, কেমন করে তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করেছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে, ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না। অতি-পেলববেদনাশীল জীবকোষগুলি বংশাবলীক্রমে যথাযথ পথে সমষ্টি বাঁধছে জীবদেহে, নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে; নিজের ভিতরকার উদ্যমে জানি না কী করে দেহক্রিয়ার এমন আশ্চর্য কর্তব্যবিভাগ করছে। যে কোষ পাকযন্ত্রের, তার কাজ এক রকমের, যে কোষ মস্তিষ্কের, তার কাজ একেবারেই অন্য রকমের। অথচ জীবাণুকোষগুলি মূলে একই। এদের দুরূহ কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা হল কোন্ হুকুমে এবং এদের বিচিত্র কাজের মিলন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য নামে একটা সামঞ্জস্য সাধন করল কিসে। জীবাণুকোষের দুটি প্রধান ক্রিয়া আছে, বাইরে থেকে খাবার জুগিয়ে বাঁচা ও বাড়তে থাকা, আর নিজের অনুরূপ জীবনকে উৎপন্ন করে বংশধারা চালিয়ে যাওয়া। এই আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জটিল প্রয়াস গোড়াতেই এদের উপর ভর করল কোথা থেকে।

অপ্রাণ বিশ্বে যেসব ঘটনা ঘটছে তার পিছনে আছে সমগ্র জড়জগতের ভূমিকা। মন এইসব ঘটনা জানছে, এই জানার পিছনে মনের একটা বিশ্বভূমিকা কোথায়? পাথর লোহা গ্যাসের নিজের মধ্যে তো জানার সম্পর্ক নেই। এই দুঃসাধ্য প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ একটা যুগে প্রাণ মন এল পৃথিবীতে— অতিক্ষুদ্র জীবকোষকে বাহন ক'রে।

পৃথিবীতে সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকলকিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না। আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাত-দৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরও সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে

পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।

পণ্ডিতেরা বলেন, বিশ্বজগতের আয়ু ক্রমাগতই ক্ষয় হচ্ছে একথা চাপা দিয়ে রাখা চলে না। মানুষের দেহের মতোই তাপ নিয়ে জগতের দেহের শক্তি। তাপের ধর্মই হচ্ছে যে, খরচ হতে হতে ক্রমশই নেমে যায় তার উষ্মা। সূর্যের উপরিতলের স্তরে যে তাপশক্তি আছে তার মাত্রা হচ্ছে শূন্য ডিগ্রির উপরে ছয় হাজার সেন্টিগ্রেড। তারই কিছু কিছু অংশ নিয়ে পৃথিবীতে বাতাস চলছে, জল পড়ছে, প্রাণের উদ্যমে জীবজন্তু চলাফেরা করছে। সঞ্চয় তো ফুরোচ্ছে, একদিন তাপের শক্তি মহাশূন্যে ব্যাপ্ত হয়ে গেলে আবার তাকে টেনে নিয়ে এনে রূপ দেবার যোগ্য করবে কে। একদিন আমাদের দেহের সদাচঞ্চল তাপশক্তি চারি দিকের সঙ্গে একাকার হয়ে যখন মিলে যায়, তখন কেউ তো তাকে জীবযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে পারে না। জগতে যা ঘটছে, যা চলছে, পিঁপড়ের চলা থেকে আকাশে নক্ষত্রের দৌড় পর্যন্ত, সমস্তই তো বিশ্বের হিসাবের খাতায় খরচের অঙ্ক ফেলে চলেছে। সে সময়টা যত দূরেই হোক একদিন বিশ্বের নিত্যখরচের তহবিল থেকে তার তাপের সম্বল ছড়িয়ে পড়বে শূন্যে। এই নিয়ে বিজ্ঞানী গণিতবেত্তা বিশ্বের মৃত্যুকালের গণনায় বসেছিল।

আমার মনে এই প্রশ্ন ওঠে, সূর্য নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের আরম্ভকালের কথাও তো দেখি অঙ্ক পেতে পণ্ডিতেরা নির্দিষ্ট করে থাকেন। অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হল। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে, আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম-ভাঙার মতো।

সৌরলোকের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের গতি ও অবস্থিতির ভিতর রয়েছে একটা বিরাট শৃঙ্খলা ; বিভিন্ন গ্রহ, চক্রপথে প্রায় একই সমক্ষেত্রে থেকে, একটা ঘূর্ণিটানের আবর্তে ধরা প'ড়ে একই দিকে চ'লে সূর্যপ্রদক্ষিণের পালা শেষ করছে। সৃষ্টির গোড়ার কথা যাঁরা ভেবেছেন তাঁরা এতগুলি তথ্যের মিলকে আকস্মিক ব'লে মেনে নিতে পারেন নি। যে মতবাদ গ্রহলোকের এই শৃঙ্খলার সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ করতে পেরেছে তা-ই প্রাধান্য পেয়েছে সব চেয়ে বেশি। যেসব বস্তুসংঘ নিয়ে সৌরমণ্ডলীর সৃষ্টি তাদের ঘূর্ণিবেগের মাত্রার হিসাব একটা প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব মতবাদকে গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে। হিসাবের গরমিল যেখানে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সেই মতকেই দিতে হয়েছে বাতিল করে। ঘূর্ণিবেগের মাত্রা প্রায় ঠিক রেখে যে দু-একটি মতবাদ এত কাল টিকে ছিল তাদের বিরুদ্ধেও নূতন বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে।

আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের ডিরেক্টর হেনরি নরিস রাসেল সম্প্রতি জীন্‌স ও লিট্‌লটনের মতবাদের যে বিরুদ্ধসমালোচনা করেছেন তাতে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই এদেরও বিদায় নিতে হবে গ্রহণযোগ্য মতবাদের পর্যায় থেকে, পূর্ববর্তী বাতিল-করাদের পাশেই হবে এদের স্থান। নক্ষত্রের সংঘাতে গ্রহ-লোকের সৃষ্টি হলে জ্বলন্ত গ্যাসের যে টানাসূত্র বের হয়ে আসত তার তাপমাত্রা এত বেশি হত যে এই বাষ্পপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। কিন্তু অতিক্রুত তাপ ছড়িয়ে দিয়ে এই টানাসূত্র ঠাণ্ডা হয়ে একটা স্থিতি পেতে চাইত; এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়ায়, মুক্তি আর বন্ধনের টানাটানিতে কার জিত হবে তাই নিয়েই হেনরি রাসেল আলোচনা করেছেন। আমাদের কাছে দুর্বোধ্য গণিতশাস্ত্রের হিসাব থেকে মোটামুটি প্রমাণ হয়েছে যে টানাসূত্রের প্রত্যেকটি পরমাণু তেজের প্রবল অভিঘাতে বিবাগী হয়ে মহাশূন্যে বেরিয়ে পড়ত, জমাট বেঁধে গ্রহলোক সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। যে বাধার কথা তিনি আলোচনা করেছেন তা জীন্‌স ও লিট্‌ল্‌টনের প্রচলিত মতবাদের মূলে এসে কঠোর আঘাত ক'রে তাদের আজ ধূলিসাৎ করতে উদ্যত হয়েছে।

শুদ্ধিপত্র : রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮	১৩	নিতে	শুনিতে
৫৩	২	প্রলোপকল্লোলে	প্রলাপকল্লোলে
১১৩	২২	ভোজনের	ভোজের
১৪৩	২৯	সখা	সখী
২১৬	৫	ছাড়িবে	ছাড়িবি
২৭০	৭	পাতা	পাত
২৭৫	৬	দেবে	দেব
৩৫৬	৩০	অতি ছিটেগুলির	অতি খুদে ছিটেগুলির
৩৬০	২১	ব্লুটিং	ব্লটিং

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল।]

রোগশয্যায়

'রোগশয্যায়' ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল ফোটোগ্রাফ ও রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সংবলিত মাত্র পঞ্চাশখানি গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট সংস্করণও সেই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৪০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে কালিম্পঙ যাত্রা করেন এবং সেখানে গৌরীপুরভবনে ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। ২৯ তারিখে অচেতন অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। প্রায় দেড়মাস জোড়াসাঁকোয় অবস্থানের পর নভেম্বরের মাঝামাঝি অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করায় ডাক্তারের অনুমতিক্রমে তিনি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই সর্বশেষ রোগশয্যাপর্বের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বিবরণ শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর 'নির্বাণ' গ্রন্থে বিশদভাবে লিখিয়াছেন। রোগশয্যায় ও আরোগ্য-পর্বের কবিতা রচনা প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত কিয়দংশ প্রণিধানযোগ্য :

> প্রথম মাস [অক্টোবর] বাবামশায়ের চেতনা ঝাপসা ছিল, মাঝে মাঝে সচেতন হতেন আবার ঝিমিয়ে পড়তেন; দ্বিতীয় মাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে পান এবং মুখে মুখে ছড়া তৈরি করেন, কবিতা লিখতে থাকেন; সেই সময় আশেপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁরা টুকে নিতেন সেইসব রচনা। ডাক্তারদের মতে তখনকার মতো বিপদজনক সময় কেটে গেলেও তিনি পূর্বের মতো সুস্থ হতে পারেন নি। তখন তিনি রুগী। ডাক্তাররা নভেম্বর মাসে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। সেখানকার খোলা হাওয়া, শীতের তাজা ভাব, সমস্তই প্রথম ধাক্কায় তাঁর দেহ-মনকে সজাগ ক'রে তুলল, মনে হল হয়তো একটা আরোগ্য আসবে। হয়তো আবার পূর্বের মতো চ'লে-ফিরে বেড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। কলকাতায় থাকার সময় শেষের দিকে যে-কবিতাগুলি লিখেছিলেন, বেশির ভাগ সেইগুলিই 'রোগশয্যায়' নাম দিয়ে ছাপা হল। এই বই এবং 'আরোগ্যে'র অনেক কবিতাই তাঁর নিষ্ঠাবান অনুরাগী সেবক-সেবিকার উদ্দেশে লেখা।
>
> —নির্বাণ, পৃ ৩৪-৩৫

রোগশয্যায় গ্রন্থখানি 'যে-দুটি নারীর উদ্দেশে' উৎসর্গীকৃত, 'নির্বাণে' শ্রীপ্রতিমা দেবীর সাক্ষ্য অনুসারে তাঁহাদের নাম শ্রীনন্দিতা কৃপালনী ও শ্রীঅমিতা ঠাকুর।

'৩০ অক্টোবর' তারিখচিহ্নিত ৩নং কবিতাটি জোড়াসাঁকোয় চেতনাপ্রাপ্তির পরে রচিত রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম কবিতা। ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণের প্রবাসী পত্রিকায় উক্ত কবিতাটি 'জপের মালা' নামে এবং ৪নং কবিতাটি 'ঋণশোধ' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৬, ৭ ও ৩১ নং কবিতা তিনটি যথাক্রমে 'ভোরের চড়ুই পাখি', 'গহন রজনী' ও 'অপবাদ' নামে প্রবাসীর ১৩৪৭ পৌষ সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। অন্যান্য কবিতাগুলি কিঞ্চিৎ অধিক একমাস কালের মধ্যে (৩০ অক্টোবর হইতে ৫ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে) রচিত এবং গ্রন্থাকারেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

আরোগ্য

'আরোগ্য' ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার সমস্ত কবিতাই কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পরে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে রচনা করেন। অধিকাংশ কবিতাই কোনো পত্রিকায় বাহির হয় নাই।

৩নং কবিতাটির একটি পূর্বতন পাঠ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার অষ্টম বর্ষ, নবম সংখ্যায় (২৭ পৌষ ১৩৪৭, পৃ ৩৩৭) 'দূরস্মৃতি' নামে প্রথম মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় উক্ত কবিতার দৈর্ঘ্য ছিল মোট ২৮ ছত্র, রচনার কাল ও স্থান মুদ্রিত হইয়াছিল '২৭।১২।৪০ উদয়ন'। পাঠান্তর স্বরূপ উহার শেষাংশ দেশ পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

বর্ণহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার চিত্তের ধারা ভাসাইয়া চলে
ফেনায় ফেনায়।
স্পর্শ করি' শূন্যের কিনারা
জেলেডিঙি চলে পাল তুলে,
যূথভ্রষ্ট মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।
সমস্ত দিনের পটে
অতি ক্ষীণ চিহ্ন দেয় কর্মের চিন্তার রেখাগুলি,
পরক্ষণে মুছে যায়।
স্বচ্ছ আনন্দের রূপ স্তব্ধ হেরি অন্তরে বাহিরে
প্রসারিত পাণ্ডুনীল আকাশের তলে।

হেথায় চাহিয়া দেখি বিরস প্রান্তর
সংসারের দায়হারা
তপ্ত শয্যাশায়ী
অকর্মণ্য রোগীসম।
সঙ্গীহীন ছায়াহীন তালগাছ শূন্যে চেয়ে থাকে,
দেখি সেই কৃপণের মাঝে
দীর্ঘ দিনে আপনার নিরর্থক ভাবনার ছবি।

১৯নং কবিতাটি 'দেশ' পত্রিকার অষ্টম বর্ষ, দশম সংখ্যায় (৫ মাঘ ১৩৪৭, পৃ ৩৭৯) 'দিদিমণি' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

জন্মদিনে

'জন্মদিনে' ১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব দিবসে প্রকাশিত হয়। ইহার অনেকগুলি কবিতাই সাময়িক পত্রে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী মুদ্রিত হইল :

২	'অপরিসমাপ্ত' : বৈশাখী বার্ষিকী ১৩৪৮
৫	'জন্মদিন' ১ : প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
৬	২ : প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
৭	৩ : প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
৮	'জন্মমৃত্যু' : প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
৯	'জলচর' : প্রবাসী ১৩৪৭ কার্তিক
১০	'ঐকতান' : প্রবাসী ১৩৪৭ ফাল্গুন
১১	'প্রথম দৈপ্রেতি' · প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন
১২	'পথের শেষে' : প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাখ
১৪	'কালিম্পঙের চিঠি' : পরিচয় ১৩৪৭ কার্তিক
১৫	'গিরি-নিবাস' : প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাখ
১৬	'নবজাতকের উত্তর-কাণ্ড' : প্রবাসী ১৩৪৭ আষাঢ়
১৭	'আরোগ্য' : প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ
১৮	'চিরস্মরণীয়' : প্রবাসী ১৩৪৭ ফাল্গুন
১৯	'ছেলেবেলা' : প্রবাসী ১৩৪৭ কার্তিক

২০ 'আগ্ডুম বাগ্ডুম ঘোড়াডুম সাজে' : প্রবাসী ১৩৪৭ চৈত্র
২১ 'অভিশাপ' : প্রবাসী ১৩৪৭ আষাঢ়
২৫ 'অন্তঃশীলা' : প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ

৫, ৬ ও ৭ নং কবিতার রচনা সম্পর্কে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ হইতে প্রাসঙ্গিক কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

পঁচিশে বৈশাখের দু'তিন দিন আগে একটা রবিবারে এখানে উৎসবের বন্দোবস্ত হল। সকাল বেলা দশটার সময় স্নান করে কালো জামা কালো রঙের জুতো প'রে [রবীন্দ্রনাথ] বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ বৃদ্ধ স্তোত্র পাঠ করল। উনি [রবীন্দ্রনাথ] ঈশোপনিষদ্ থেকে অনেকটা পড়লেন। সেই দিন দুপুর বেলা 'জন্মদিন' ব'লে তিনটে কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে বৌদ্ধ-বুদ্ধের কথা ছিল। বিকেল বেলা দলে দলে সবাই আসতে লাগল— আমাদের পাহাড়ী দরিদ্র প্রতিবেশী, সানাই বাজতে লাগল, গেরুয়া রঙের জামার উপর মালাচন্দনভূষিত আশ্চর্য স্বর্গীয় সেই সৌন্দর্য সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল। ঠেলা-চেয়ারে করে বাড়ির পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, দলে দলে পাহাড়ীরা প্রণত হয়ে ফুল দিচ্ছিল। প্রত্যেকটি লোক শিশু বৃদ্ধ সবাই কিছু না কিছু ফুল এনেছে। ওরা যে এমন করে ফুল দিতে জানে তা আগে কখনও মনে করি নি। তিব্বতীয়া পরাল 'খর্দা' গাছের সুতোর বোনা স্কার্ফ, যা ওরা আমাদের পরায়। ফুলে প্রায় আবৃত হয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে 'শিলাতলে' এসে বসলেন, তিব্বতী আর ভুটানীরা শুরু করলে তাদের জংলী তাণ্ডব নাচ।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, সং ২, পৃ ২৫৫-৫৬

৮নং কবিতায় 'প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের' সংবাদের যে উল্লেখ, তাহা রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনের সংবাদ। কবিতাটি উপরে বর্ণিত উৎসব-দিবসের পরদিন বৈকালে রচিত।

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ-লেখিকার সাক্ষ্য (পৃ ২৩৭-৩৮) অনুসারে ১১ নং কবিতাটি ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে মংপুতে রচিত হইয়াছিল।

১৪ নং কবিতাটি কালিম্পঙ হইতে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০) শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে যে পত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথ পাঠাইয়াছিলেন তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে ব'লে মনে হচ্ছে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত।

কেদারায় বসে আছি সমস্ত-দিন, মনের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণাপাণির বীণার গুঞ্জরণ। তারই একটুখানি নমুনা পাঠাই।

— কালিম্পঙের চিঠি : পরিচয় ১৩৪৭ কার্তিক, পৃ ৩৩২

ইহার পরদিন, ২৬ সেপ্টেম্বর হইতে সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া রবীন্দ্রনাথ মাসাধিক কাল প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় কাটান, এবং ক্রমে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইবার পর ৩০ অক্টোবর (১৯৪০) তারিখে রোগশয্যায় পুনরায় কবিতা রচনা শুরু করেন।

১৫ নং কবিতা প্রবাসীতে 'মিত্রা—' সম্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর উদ্দেশে উক্ত সম্বোধন।

১৬ নং কবিতা 'কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী'কে 'নবজাতকের উত্তর-কাণ্ড' নামে পত্রাকারে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৩৪৭ আষাঢ়ের প্রবাসীতে ৩৫৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ২নং 'পত্রালাপ' দ্রষ্টব্য।

১৩৪৭ সালের ৭ পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে 'আরোগ্য' নামে রবীন্দ্রনাথের যে মুদ্রিত ভাষণ পঠিত হয় ১৭ নং কবিতাটি তাহারই উপসংহার। রচনা-তারিখ ১২ ডিসেম্বরের পরিবর্তে সম্ভবত '২২ ডিসেম্বর' হইবে।

১৮ নং কবিতাটি 'চিরস্মরণীয়' নামে ১৩৪৭ ফাল্গুনের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের '১১ মাঘ' ভাষণের শেষে (পৃ ৫৮০) মুদ্রিত হইয়াছিল। উহার রচনাকাল মাঘ ১৩৪৭ বলিয়া মনে হয়।

২৫ নং কবিতাটির রচনা-তারিখ প্রবাসী পত্রিকা অনুসারে (১৩৪৭ মাঘ, পৃ ৪২৭) '২৮ মে ১৯৪০' হইবে।

উপসংহারে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই 'জন্মদিনে' বইখানি কবির জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ কবিতা-গ্রন্থ।

শ্রাবণগাথা

'শ্রাবণগাথা' ১৩৪১ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। উক্ত সালের '২৬ ও ২৭ শ্রাবণ' তারিখে শান্তিনিকেতনে নৃত্যগীত সহযোগে ইহার 'প্রথম অভিনয়' হয়।

১১৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "তৃষ্ণার শান্তি" গানের একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পাঠ কৌতূহলী পাঠক চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে ১৫৪ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র কথা-অংশ কলিকাতায় নিউএম্পায়ার থিয়েটারে ১১, ১২, ও ১৩ মার্চ তারিখে (১৯৩৬) অভিনয় উপলক্ষে পুস্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের ফাল্গুন মাসে। পরে ১৩৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ইহার একটি স্বরলিপি-সহ পরিমার্জিত সংস্করণ বাহির হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে শেষোক্ত সংস্করণের পাঠ মুদ্রিত হইল। ১৪২ পৃষ্ঠার "ওরে ক্ষমা কোরো সখা" গানটি উক্ত সংস্করণের শেষে স্বরলিপি-অংশে প্রথম সংযোজিত হয়; পাদটীকায় বলা হইয়াছিল "কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পরে এই গানটি নাটকে নূতন যোগ করা হইয়াছে"।

গ্রন্থারম্ভে 'বিজ্ঞপ্তি'তে কবি বলিয়াছেন "এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত"। সেই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য নাটকে কেবলমাত্র নিম্ননির্দেশিত অংশগুলিই "কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে" রচিত :

১৩৪ পৃষ্ঠায় 'সখী'র উক্তি "সখা, কী দেখা দেখিলে তুমি…প্রথম চিনিল আপনারে।"

১৩৭ পৃষ্ঠায় 'চিত্রাঙ্গদা'র উক্তি "হায় হায়…বসন্তেরে করিল ব্যাকুল।"

১৩৮ পৃষ্ঠায় 'একজন সখী'র উক্তি "ব্রহ্মচর্য!…দাও তারে অবলার বল।"

১৪০-৪১ পৃষ্ঠায় 'নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা'র উক্তি "এ কী দেখি!…ধরণীর চির-অবহেলা।" এবং "মীনকেতু…উন্মাদ করেছে মোরে।"

১৪৩ পৃষ্ঠায় 'অর্জুন'-এর উক্তি "হে সুন্দরী…অজানার পথে।"

১৪৪ পৃষ্ঠায় 'চিত্রাঙ্গদা'র উত্তর "তবে তাই হোক…নিমিষের সোহাগিনী।"

১৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় 'অর্জুন'-এর উক্তি "আজ মোরে…শেষ পরিণাম।"

১৪৫ পৃষ্ঠায় 'চিত্রাঙ্গদা'র উত্তর "সে আমি যে আমি নই…যাও যাও ফিরে যাও।"

'অর্জুন'-এর উক্তি "এ কী তৃষ্ণা…সর্বাঙ্গ টুটিয়া।"

১৫১ পৃষ্ঠায় 'সখী'র উক্তি "রমণীর মন ভোলাবার…বীরোত্তম।"

১৫৩ পৃষ্ঠায় 'সখী'র উক্তি "হে কৌন্তেয়…সেবিকার পানে।"

১৫৬ পৃষ্ঠার বৈদিক মন্ত্রগুলিও, বলা বাহুল্য, অভিনয়কালে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে।

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী কর্তৃক লিখিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত "চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য" প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশ এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

চিত্রাঙ্গদার আর-একটি বিশেষ জিনিস হল ছোটো ছোটো কবিতাগুলি, তারা মাঝে মাঝে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে মূল [illegible], গান ও নাচ বন্ধ করে দর্শকের চিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখাই [illegible] কাজ, এই কবিতাগুলির ছন্দ দেহের নৃত্যলীলাকে বাঁচিয়ে রাখে। পরবর্তী নৃত্য যে আবার সেই ভঙ্গীর মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠবে এ যেন তারই ভূমিকা।

—প্রবাসী, ১৩৪৩ চৈত্র, পৃ ৭৯২

১৩৪৩ সালের প্রবাসীতে পৌষ সংখ্যায় (পৃ ৪২৬-৩৪) "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা" প্রবন্ধে শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ('কথা ও সুর' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ) এবং চৈত্র সংখ্যায় (পৃ ৭৮৯-৯৩) "চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য" প্রবন্ধে শ্রীপ্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটির শিল্পকলা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত প্রবন্ধের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

চিত্রাঙ্গদার সম্বন্ধে আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে যে নৃত্যনাট্যে কলাকৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে না, তার ভাষা হল সুর ও তাল; ভাব খেলে তার দেহরেখায়। এই রেখার খেলা মাত্রেই ছবির বিষয় এসে পড়ে, তাই তার অঙ্গে পটভূমির দরকার হয় রঙ ও আলো। এই রঙ আলো ছাড়া নৃত্য-কলার পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলা শক্ত, বিশেষতঃ যখন সে নাটকীয় রাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়। নাচেতে দেহের রেখা খুব নিখুঁত হওয়া চাই, কোথাও তার কোনো অবাস্তর ভঙ্গী হলে তালের সঙ্গে ভঙ্গীর সংগতি রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন ছাড়া নৃত্যকলা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কবিতা ও গদ্যে যে তফাৎ, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই রকমই পার্থক্য।

—প্রবাসী, ১৩৪৩ চৈত্র, পৃ ৭৯২

১৩৪২ সালের ফাল্গুনে নৃত্যনাট্যটির প্রথম বারের অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে নাট্যের মর্মকথাটি অভিনয়-মঞ্চ হইতে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করেন।

প্রভাতের প্রথম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে,
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারি আঘাত।
অবশেষে সেই আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে জাগ্রত জগতে।
তেমনি সত্যের প্রথম আবির্ভাব সাজ-সজ্জার বহিরঙ্গে, বর্ণবৈচিত্র্যে,
তাই দিয়ে অসংস্কৃত চিত্তকে সে করে মুগ্ধ।
অবশেষে নিজের সেই আচ্ছাদন যখন সে মোচন করে
তখন প্রবুদ্ধ মনের কাছে নির্মল মহিমায় তার বিকাশ।
এই কথাটিই চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।

এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে আছে, প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
নিরলংকার সত্যের সহজ মহিমায়।
—প্রবাসী ১৩৪২ চৈত্র, পৃ ৮৮৯

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের প্রচলিত 'ভূমিকা'-অংশের ইহাই আদি পাঠ।

আলোচ্য নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মূল নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে নাটক ও প্রহসন বিভাগে ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

আলোচ্য নাটিকাটি ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসে 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' নামে পুস্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ তারিখে (১৯৩৮) কলিকাতায় "ছায়া" রঙ্গমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে উহা সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

পরবর্তী সালে ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৯৩৯) কলিকাতার "শ্রী" রঙ্গমঞ্চে পুনরভিনয়ের কয়েক মাস পূর্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথ নাটিকাটিকে আগাগোড়া পরিমার্জিত করিয়া নৃত্যে সংগীতে নূতন আকার দান করেন। ১৩৪৫ সালের চৈত্র মাসে 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' নামে স্বরলিপি-সহ একটি নূতন সংস্করণ বাহির হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে উক্ত নূতন সংস্করণের পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের সহিত স্বরলিপি-সংস্করণের প্রধান প্রভেদ এই যে শেষোক্ত সংস্করণে প্রথম দৃশ্যের আরম্ভে ফুলওয়ালির দলের "নব বসন্তের গানের ডালি" গানটি নূতন সংযোজন, এবং নিচের দুইটি গান সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে।

আয় রে মোরা ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে, আজ তারি সওগাতে
ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।
নেব তারি দান,
সোনার রঙের ধান,
তাই-যে গাহি গান,
তাই-যে সুখে খাটি॥

এই গানটি প্রথম দৃশ্যে "মাটি তোদের ডাক দিয়েছে" গানের (পৃ ১৬৭) অব্যবহিত পূর্বে 'পুরুষ' দলের গান রূপে ছিল।

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু, ইত্যাদি

(শ্রাবণগাথা, পৃ ১১৪ দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় দৃশ্যের সর্বশেষে (পৃ ১৭৮) ইহা 'পুরুষদলের নৃত্য' হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

নৃত্যনাট্যটির প্রথম সংস্করণের শুরুতে চণ্ডালিকা মূল নাটকের 'ভূমিকা'টি ও সমগ্র নাট্যবিষয়ের রবীন্দ্রনাথ-কৃত একটি 'পরিচয়' সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ভূমিকাটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডে (পৃ ১৩৩) একবার মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান খণ্ডে পুনরায় দেওয়া হইল না। 'পরিচয়' অংশটি নিম্নে আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হইল :

পরিচয়

(সমগ্র চণ্ডালিকা নাটিকার গদ্য এবং পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে। এই কারণে মনে রাখা দরকার এই নাটিকা দৃশ্য এবং শ্রাব্য, কিন্তু পাঠ্য নয়।)

প্রথম দৃশ্য

ফুল বিক্রি করতে চলেছে মেয়েরা। (গান)

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি ফুল চাইতেই তার স্পর্শ বাঁচিয়ে সবাই চলে গেল।

দইওয়ালা এল। সেও প্রকৃতিকে এড়িয়ে চলে গেল।

চুড়িওয়ালা এল, সেও ঘৃণা করে ওকে চুড়ি বেচল না।

(সকলের প্রস্থান)

দেবতাকে নিন্দা ক'রে প্রকৃতির গীত নৃত্য।

বৌদ্ধভিক্ষুরা বুদ্ধস্তব গান করে গেল রাস্তা দিয়ে।

ঘরকন্নায় অবহেলা করছে ব'লে মা এসে প্রকৃতিকে ভর্ৎসনা করলে।

চির-লাঞ্ছনায় জন্ম দিয়েছে ব'লে প্রকৃতি ধিক্কার দিলে তার মাকে।

(মায়ের প্রস্থান)

প্রকৃতির জল-তোলার অভিনয়।

বুদ্ধশিষ্য আনন্দ এসে জল চাইলেন।

প্রকৃতি ক্ষমা চেয়ে বললে, "আমি চণ্ডালকন্যা, আমার কুয়োর জল অশুচি।"

আনন্দ বললেন, "যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ। যে জল তৃষিতকে তৃপ্ত করে সেই জলই পবিত্র তীর্থবারি।" প্রকৃতির হাতের জল খেয়ে তিনি চলে গেলেন।

পুলকিত মনে প্রকৃতির নৃত্য।

পাড়ার মেয়েপুরুষরা ওকে ফসলকাটার কাজে ডাকতে এল। ভাবাবেগে নিমগ্ন প্রকৃতি তাদের ফিরিয়ে দিলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পুষ্প অর্ঘ্য নিয়ে পুরনারীরা বুদ্ধের মন্দিরে চলে গেল।

প্রকৃতি গান গেয়ে বলছে, "ফুল মাটির কোলে ফুটেছে, দেবতা আসবেন সেই মাটির কাছেই আপন পূজা নিতে।"

মা এসে বললে, "তুই রৌদ্রে পুড়ে উমার মতো তপস্যা করছিস নাকি।"

প্রকৃতি বললে, "আমি তাঁরই জন্যে তপস্যা করছি যিনি আমাকে ডাক দিয়ে গেছেন, যিনি আমাকে নতুন জন্ম দিয়েছেন। আমি তাঁকেই চাই যিনি আমাকে দিয়েছেন সেবিকার সম্মান।"

রাজবাড়ির অনুচর এসে চণ্ডালিকাকে জানালে রানীর পোষা পাখি উড়ে গেছে, মন্ত্র প'ড়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, এই আদেশ। (প্রস্থান)

মন্ত্রের কথা শুনে প্রকৃতি মাকে ধ'রে পড়ল, মন্ত্র প'ড়ে আনন্দকে তার কাছে আনিয়ে দিতে হবে।

মা ভয় পেয়ে দ্বিধা করলে, বললে, "যদি আনিয়ে দিই তবে তার মূল্য দিতে গিয়ে তোর কিছুই বাকি থাকবে না।"

প্রকৃতি বললে, "আমার কিছুই বাকি থাকবে না জানি তবু আমি ভয় করি নে।"

মা রাজি হল।

বুদ্ধের স্তব পাঠ করতে করতে ভিক্ষুর দল পথ দিয়ে চলে গেল।

প্রকৃতি দেখলে আগে আগে চলেছেন আনন্দ, কিন্তু তার দিকে ফিরে তাকালেন না, সেই খেদে সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগল, আর মাকে বললে, তার মন্ত্রে আরও জোর দিতে।

আকর্ষণী নৃত্যে যোগ দেবার জন্যে মা আপন শিষ্যাদের ডাক দিলে। তাদের প্রবেশ ও নৃত্য।

প্রকৃতির হাতে মায়াদর্পণ দিয়ে মা বললে, এই দর্পণ হাতে নিয়ে নাচলে যাকে কামনা করছে তার ছায়া দেখতে পাবে।—তাণ্ডব নৃত্যে মা রুদ্রভৈরবের দলকে আহ্বান করলে। তাদের নৃত্য।

তৃতীয় দৃশ্য

মায়ের মন্ত্রনৃত্য।

আকাশে মেঘ ঘনিয়েছে দেখে প্রকৃতির আশা হল, মন্ত্র খাটবে, সন্ন্যাসীর শুষ্ক সাধনা উড়ে যাবে শুকনো পাতার মতন।

মা বললে, "এইবার আয়নার সামনে নেচে দেখ্ তো কী ছায়া পড়ল।"

প্রকৃতি আয়নায় দেখলে, আনন্দ আকাশে হাত তুলে থেকে থেকে কাকে যেন অভিশাপ দিচ্ছেন, নিজেকে কঠোরভাবে আঘাত করছেন। দেখে সে অনুতাপে অভিভূত হল। বললে "আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, এ দর্পণ আমি দেখব না।"

মায়া যখন বললে, "তা হলে মন্ত্র ফিরিয়ে নেওয়াই ভালো' প্রকৃতি প্রথমে তাতে সম্মতি দিলে, পরক্ষণেই বললে, "না, তোর মন্ত্র পড়্, আসুন তিনি, দুঃখ দিয়েই তাঁর দুঃখ মেটাব আমি।"

প্রকৃতি তার মাকে নাগপাশ মন্ত্র পড়তে বললে। (নাগপাশমন্ত্র নৃত্য)

(আহ্বান গানের সঙ্গে শিষ্যাদের নৃত্য)

(আনন্দের ছায়া অভিনয়)

অবশেষে আনন্দ পরাভূত হয়ে কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তখন মহাপুরুষের এই অপমান প্রকৃতি সহ্য করতে পারলে না। বললে, "প্রভু, তুমি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ। আমি তোমাকে নিচে নামিয়ে এনেছি, তুমি আমাকে উপরে টেনে তুলবে ব'লে।"

সকলে মিলে বুদ্ধের স্তবমন্ত্র পাঠ ও প্রণাম।

সমাপ্ত

কলিকাতায় পুনরভিনয় কালে প্রচারিত পুস্তিকা হইতে নৃত্যনাট্যটির রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নূতন করিয়া লিখিত আর-একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে মুদ্রিত হইল :

প্রথম দৃশ্য

ফুলওয়ালির দল ফুল বিক্রি করতে এসেছে। চণ্ডালিকাও আনলে তার ফুলের ডালি। সবাই ঘৃণায় তার পাশ কাটিয়ে গেল। দইওয়ালা এল দই বেচতে, চণ্ডালিকা প্রকৃতি কেনবার জন্যে হাত বাড়াতেই দইওয়ালাকে সবাই নিষেধ করলে।

চুড়িওয়ালা এল চুড়ি বিক্রি করতে, প্রকৃতি চুড়ি কিনতে চাইতেই চুড়িওয়ালাকে সবাই সতর্ক করে দিলে। চণ্ডালিকা মনের দুঃখে তার সৃষ্টিকর্তাকে ধিক্কার দিলে। প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ। ঘরের কাজে চণ্ডালিকার ঔদাসীন্য নিয়ে তাকে ভৎর্সনা করতেই, মা তাকে অপমানের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বলে তাকে তিরস্কার করলে। মা বিস্মিত হয়ে চলে গেল। বুদ্ধদেবের শিষ্য আনন্দ এসে জল চাইলেন। তার হাতের জল অশুচি বলে চণ্ডালিকা সংকোচ প্রকাশ করলে। আনন্দ বললেন, "যে জল তৃষিতের তৃষ্ণা দূর করে, তাপিতের তাপ শান্ত করে, সেই জলই শুচি।" তিনি জল খেয়ে চলে গেলেন। তাঁর করুণা ও তাঁর রূপে প্রকৃতির মন মুগ্ধ হয়ে গেল পাড়ার মেয়েরা ধানকাটার কাজে ওকে ডাকতে এল। ও বললে,

"আমায় ডেকো না আমায় ডেকো না—
আমার কাজভোলা মন আছে দূরে কোন্
করে স্বপনের সাধনা ॥"

দ্বিতীয় দৃশ্য

বুদ্ধের পূজার অর্ঘ্য নিয়ে পথ দিয়ে চলে গেল পূজারিনীরা। প্রকৃতি এসে গাইলে,

"ফুল বলে ধন্য আমি, ধন্য আমি মাটির 'পরে—
দেবতা ওগো তোমার পূজা আমার ঘরে ॥"

মা এসে বললে, "তুই অবাক করলি যে, উমার মতো তুই তপস্যা করছিস নাকি। তোর সাধনা কার জন্যে।" চণ্ডালিকা বললে, "যে আমাকে আহ্বান করলে, তার জন্যে। আমি ছিলুম বাণীহারা, যে আমাকে বাণী দিয়েছে, আমার মনের মধ্যে যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও', তার জন্যে।" মা বললে, "তোর কাছে কে আবার জল চাইলে, সে কি তোর আপন লোক নাকি।" প্রকৃতি বললে, "তিনি বলেছেন, তিনি আমার আপন লোকই বটেন। তিনি আমাকে নব জন্ম দিয়েছেন। মন্ত্র পড়ে তুই নিয়ে আয় ভিক্ষুকে এই অমানিতার পাশে, আমি তাঁকে আত্মনিবেদনের সম্মান দেব।" এত বড়ো স্পর্ধার কথা শুনে মা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন সময় ভিক্ষুর দল নিয়ে আনন্দ পথ দিয়ে চলে গেলেন। তার দিকে তাকালেন না দেখে চণ্ডালিকার অসহ্য ক্ষোভ হল। মা বললে, "মন্ত্র পড়ে আমি ওঁকে আনবই।" তার শিষ্যাদের সঙ্গে সম্মোহন নৃত্য করে কন্যার হাতে একটা মায়াদর্পণ দিলে। বললে, "এই দর্পণ নিয়ে যখন তুই নাচবি দেখতে পাবি তাঁর কী দশা হচ্ছে।"

তৃতীয় দৃশ্য

এই দৃশ্যে মন্ত্রের কাজ চলেছে। মায়াদর্পণে আনন্দের অভিভব-দৃশ্য দেখে মাঝে মাঝে প্রকৃতি অনুতপ্ত হচ্ছে, মাকে নিষেধ করছে, আবার তাকে উৎসাহিত করছে। অবশেষে মহাকালনাগিনীমন্ত্র-প্রভাবে টান ধরল। পরাভূত আনন্দের অসম্মানে দুঃখার্ত হয়ে আনন্দকে প্রকৃতি প্রণাম করে বললে, "আমাকে ক্ষমা করো, তোমাকে মাটিতে টেনেছি, তুমি আমাকে ধূলি হতে তুলে নাও তোমার পুণ্যলোকে।"

চণ্ডালিকা-কে নৃত্যনাট্যে রূপদান করার প্রেরণা প্রসঙ্গে ২১।১।৩৮ তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের নিম্নে-উদ্ধৃত অংশ প্রণিধানযোগ্য :

আজ আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের জন্যে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড়। সেই মাতালটা বড়ো হাটের জন্যে ফসল-ফলানো কেয়ার করে না। কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি। খ্যাতির দিক থেকে এর দাম নেই বললেই হয়। প্রথমত বিদেশী হাটে চালান করবার মাল এ নয়, দ্বিতীয়ত দেশের মাতব্বর লোকেরা এর বিশেষ খাতির করবেন ব'লে আশাই করি নে, যদি করেন তবে প্রভূত মুরুব্বিয়ানা মিশিয়ে করবেন। অথচ দিনরাত্রি এত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মন যে, সমস্ত সামাজিক কর্তব্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ আছি আমি অজন্তা-গুহায়— তার বাইরের সংসারটা সম্পূর্ণ মুলতবি বিভাগে রয়ে গেছে।

—প্রবাসী, ১৩৪৪ ফাল্গুন, পৃ ৭১৪

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী কর্তৃক লিখিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত "চণ্ডালিকা" প্রবন্ধটি নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা-র পরিপূর্ণ রসগ্রহণের পক্ষে অপরিহার্য। ১৩৪৫ সালের আশ্বিনের প্রবাসী হইতে উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

চণ্ডালিকার ভূমিকা হল খাঁটি সাহিত্য; একটি মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির উপর তার রচনা। মানুষের মধ্যে যা আদিম আকর্ষণ তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চণ্ডালিকার নৃত্যকলা। দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র যা শিবের তপস্যাকেও টলাতে পেরেছিল প্রকৃতি-পুরুষের অন্তরের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব পৌঁছল চণ্ডালিকার প্রাণে, তারই আঘাতে দোল-খাওয়া মন নৃত্যসংগীতের তালে আপনাকে বিচ্ছুরিত করে দিল অবসাদ বিষাদ করুণার আতিশয্যে।...

মূল আখ্যানের সঙ্গে এই নৃত্যনাট্যের আখ্যান-অংশ কিছু তফাত হয়ে গেছে। নাটকীয় সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে এবং রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিককে উৎকর্ষ দেবার নিমিত্ত কবি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছেন, যদিও সাহিত্যের দিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক পরিচালনায় কোনোরূপ পরিবর্তন হয় নি।

প্রথম দৃশ্যে চণ্ডালিকা সাধারণ মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের এবং পথের গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেখানে তার সখী আছে, মা আছে, কর্ম আছে। সেই পথের জীবনের মধ্যে একদিন তার প্রাণে এসে পৌঁছল কোন্ প্রেমের ডাক, প্রথম সাড়া দিয়ে উঠল তার দেহ, তার কামনা, তার পর অসীম দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে টানা-ছেঁড়ার অপরিমেয় অভিজ্ঞতার সাধনায় তার মন বিকশিত হল প্রেমের গভীর আনন্দে। মূল উপাখ্যানের মধ্যে যদিও আনন্দ স্বপ্রকাশ নয়, চণ্ডালিকার মুখের বাণী থেকেই তাঁর দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু নাটকীয় রসকে জমিয়ে তোলবার জন্যে এবং চণ্ডালিকার দুরূহ মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে দর্শকের চিত্তকে বিরাম দেবার জন্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের মনোজগতের দ্বন্দ্বকে ছায়ানৃত্যে দেখানো হয়েছে। চণ্ডালিকার মায়াদর্পণে সন্ন্যাসীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তারই ছায়া জেগে উঠল দর্শকের চোখে। আনন্দের যে দ্বন্দ্ব সে চণ্ডালিকার চেয়ে কিছু কম নয়। এক দিকে তার সুগভীর জ্ঞানের সাধনা, এক দিকে তার দেহের কামনা; এই বস্তুজগতের আকর্ষণ জ্ঞানীকেও টেনে আনলে মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু অবশেষে মানুষই জিতল। জীবধর্মের আদিমতাকে ছাপিয়ে উঠল তার আত্মার শক্তি, দিশাহারা উন্মাদনায় বাঁধা পড়ল না সে সংসারের মায়াজালে। চিরবৈরাগী পুরুষ, যার প্রেরণায় সে ছুটেছে উত্তর মেরুতে, উড়েছে আকাশ পথে, ডুবেছে অতল সমুদ্রে, সেই দুর্দাম শক্তির পুরুষকার দেহের আকর্ষণ থেকে আনন্দকে পৌঁছে দিল পৌরুষের অসাধারণ গৌরবে।...

এই যে প্রকৃতি-পুরুষের স্বভাবের মধ্যে মূলগত বিরুদ্ধতা, চণ্ডালিকার সাহিত্য ও নৃত্যনাট্য সেই মানসিক জটিলতাকে সুর ও তালের ছন্দে প্রকাশ করতে চেয়েছে। দেহের অনুপম ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে মনোজগতের ইতিকথাকে নয়নগোচর করে তোলাই ছিল চণ্ডালিকার আদর্শ।

—প্রবাসী, ১৩৪৫ আশ্বিন, পৃ ৭৭৬-৭৭

চণ্ডালিকার মূল আখ্যান প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় (পৃ ৫৪২-৪৩) দ্রষ্টব্য।

শ্যামা

'শ্যামা' নৃত্যনাট্য স্বরলিপি-সহ ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বেই ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারির ৭ ও ৮ তারিখে নাটিকাটি কলিকাতায় "শ্রী" রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার বৎসর তিনেক আগে ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে কথা ও কাহিনী-র "পরিশোধ" কবিতাটিকে (রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড পৃ ৩১-৪০ দ্রষ্টব্য) অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন; এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের ও অন্যান্য শিল্পীদের সহায়তায় ১০ ও ১১ অক্টোবর তারিখে (১৯৩৬) উহা ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে মঞ্চস্থ করেন। ১৯৪৩ সালের কার্তিকের প্রবাসীতে ১-১১ পৃষ্ঠায় "পরিশোধ (নাট্যগীতি)" আগাগোড়া মুদ্রিত হইয়াছিল। বস্তুত উক্ত 'নাট্যগীতি'তেই শ্যামা নৃত্যনাট্যের আদি সূচনা।

'পরিশোধ নাট্যগীতি'র প্রবাসীতে-প্রকাশিত পাঠ রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে শ্যামার 'পরিশিষ্ট'রূপে যথাস্থানে (পৃ ২০৯-১৮) মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্যামা বা পরিশোধ-এর আখ্যান-অংশ, চণ্ডালিকার মতোই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Published by the Asiatic Society of Bengal, 57 Park Street, 1882) গ্রন্থের মহাবস্তবদান-অংশে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে গৃহীত। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য উক্ত গদ্যাংশটি আগাগোড়া মূল গ্রন্থ হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল :

Story of Syāmā and Vajrasena —The reason why Buddha abandoned his faithful wife Yasodharā is given in the following story.

There was in times of yore a horse-dealer at Takshasilā, named Vajrasena ; on his way to the fair at Vārānasī, his horses were stolen, and he was severely wounded. As he slept in a deserted house in the suburbs of Vārānasī, he was caught by policemen as a thief. He was ordered to the place of execution. But his manly beauty attracted the attention of Syāmā, the first public woman in Vārānasī. She grew enamoured of the man, and requested one of her handmaids to rescue the criminal at any hazard. By offering large sums of money, she succeeded in inducing the executioners to set Vajrasena free, and excute the orders of the king on another, a banker's son, who was an admirer of Syāmā. The latter not knowing his fate, approached the place of execution with victuals for the criminal, and was severed in two by the executioners.

The woman was devotedly attached to Vajrasena. But her inhuman conduct to the banker's son made a deep impression on his mind. He could not reconcile himself to the idea of being in love with the perpetrator of such a crime. On an occasion when they both set on a pluvial excursion, Vajrasena plied her with wine, and, when, she was almost senseless, smothered and drowned her. When he thought she was quite dead, he dragged her to the steps of the ghat and fled, leaving her in that helpless condition. Her mother, who was at hand, came to her rescue, and by great assiduity resuscitated her. Syāmā's first measure, after recovery, was to find out a Bhikshunī of Takshasilā, and to send through her a message to Vajrasena, inviting him to her loving embrace. Buddha was that Vajrasena, and Syāmā, Yaśodharā.

—The Sanskrit Buddhist Literature, p. 135.

১৯৩৯ সালে অভিনয়কালে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'শ্যামা'র একটি সংক্ষিপ্ত নাট্যপরিচয় সমসাময়িক প্রচার-পুস্তিকা হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল :

শ্যামা

প্রথম দৃশ্য

রাজপথে

বজ্রসেন বণিক। সে অনেক সন্ধানে ইন্দ্রমণির হার সংগ্রহ করেছে। তার ইচ্ছা, এই হার সে কাউকে বেচবে না। বিনামূল্যে যাকে পরাতে চায় তাকেই খুঁজে বের করবে। বন্ধু বললে, "এই হারের প্রতি রাজার চরের লক্ষ্য আছে।" বজ্রসেন বললে, "সেই ভয়ে যাচ্ছি বিদেশে পালিয়ে।" বলতে বলতে কোটালের চর এসে বললে, "তোমার পেটিকায় কী আছে দেখাও।" বজ্রসেন বললে, "এ তুমি ছুঁয়ো না, এ আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়।" বলে সে ছুটে গেল। কোটালের চর বললে, "দেখব তুমি কোথায় পালাও।"

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামার সভা

শ্যামা রাজনটী, বিখ্যাত সুন্দরী। তার প্রেমে পাগল বালক উত্তীয়। সে শ্যামার পূজা করে দূরের থেকে। সখীদের করুণা তার 'পরে। শ্যামা নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত, এমন সময়ে চোর অপবাদ দিয়ে প্রহরী শ্যামার সভার মধ্য দিয়ে বজ্রসেনের পিছন পিছন ছুটে গেল। শ্যামা বজ্রসেনের দেবকান্ত মূর্তি দেখে মুগ্ধ। সখিকে পাঠিয়ে বজ্রসেনের সঙ্গে প্রহরীকে ডেকে পাঠালে। বজ্রসেনকে বাঁচাবার জন্যে দুদিন সময় চাইলে। প্রহরী রাজি হল। শ্যামা সভাস্থদের উদ্দেশ করে বললে, "তোমাদের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে এই নিরপরাধ বিদেশীকে অন্যায় অপবাদ থেকে রক্ষা করবে।" উত্তীয় এসে বললে, "ন্যায়-অন্যায় বুঝি নে, ঐ বিদেশীর নামের অভিযোগ আমি নিজে স্বীকার করে প্রাণ দেব— সেই মৃত্যুর বন্ধনেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে।" প্রহরীর কাছে সে আত্মসমর্পণ করলে। কারাগারে তার মৃত্যু হল।

তৃতীয় দৃশ্য

পথে

বজ্রসেনের সঙ্গে শ্যামার মিলনের আনন্দ। দেশত্যাগ করে বজ্রসেন ও শ্যামার পলায়ন। পলাতকা রাজনটীর সন্ধানে প্রহরীর অনুসরণ। সখীরা তাকে ছলনা করে

ভুলিয়ে দিলে। শ্যামাকে বার বার বজ্রসেনের প্রশ্ন, কী উপায়ে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অবশেষে শ্যামার কাছে শুনলে তার জন্যে প্রাণ দিয়েছে উত্তীয়। বজ্রসেন তাকে ধিক্কার দিলে, ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বর্জন করে চলে যাবার সময়ে শ্যামা তাকে ছাড়তে চাইলে না। বজ্রসেন তাকে সংঘাতিক আঘাত করে চলে গেল। শ্যামার প্রতি প্রেম ভুলতে পারলে না, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, শ্যামাকে ডাকতে লাগল মৃত্যুলোক থেকে। সেই আহ্বানে শ্যামার হঠাৎ আবির্ভাব। বললে, "তোমার নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্যেও করুণা ছিল, আমি মরণের দ্বার থেকে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।" আবার বজ্রসেনের মনে ধিক্কার জাগল, বললে, "চলে যাও।" শ্যামা প্রণাম করে চলে গেল।

পরিতপ্ত বজ্রসেনের গান :

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো এ মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা,
ক্ষমো এ মম দীনতা ॥

প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা,
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা ॥

শ্যামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন হইতে ১৪।২।৩৯ তারিখের এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিয়াছিলেন :

সুরের বোঝাই-ভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল। নটনটীরা যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে চলে গেল কলকাতায়। দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত।

আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ, কেননা সে নির্বস্তুক (abstract)। বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চলতি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাই নে তার মূল্যের আদর্শ।......

...গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা, তাকে দেখতে পাই ছন্দের লোকান্তরে, সীমান্তরে, প্রাত্যহিকের করস্পর্শে তার ক্ষয় ঘটে না, দাগ ধরে না। আমার শ্যামা নাটকের জন্যে একটা গান তৈরি করেছি, ভৈরবী রাগিণীতে—

জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা
হে গরবিনী।

এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারংবার, কিন্তু গানের সুর শুনলে বুঝবে, এই বারংবারের অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন্ চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে। সুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড়ো অলংকার।......

গানে আমি রচনা করেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ ভালোমন্দ। তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়। কিন্তু এগুলোকে পুলিস-কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি— গানে তার বাধা দিয়েছে— তার চার দিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌঁছতে পারে নি যা-কিছু অবান্তর, যা অসংলগ্ন, যা অনাহূত আকস্মিক। অথচ জগতে সব কিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন, অর্থহীন, আবর্জনা; তাদেরই সাক্ষ্য নিয়ে তবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সত্যতা, এমন বে-আইনী বিধি মানতে মনে বাধছে। অন্তত গানে এ কথা ভাবতেই পারি নে।...

—প্রবাসী, ১৩৪৫ চৈত্র, পৃ ৭৮২-৭৮৫

তিন সঙ্গী

'তিন সঙ্গী' ১৩৪৭ সালের পৌষমাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল:

রবিবার আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৬ শারদীয়া সংখ্যা

শেষ কথা শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ ফাল্গুন

ল্যাবরেটরি আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৭ শারদীয়া সংখ্যা

শেষকথা গল্পটির একটি ভিন্নতর পাঠ দেশ পত্রিকার 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংখ্যা'য় (৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, পৃ ১৬৫-৭৬) "ছোটো গল্প" নামে বাহির হইয়াছিল। পরিশিষ্টে উহা আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হইল।

ল্যাবরেটরি গল্পটির সূত্রে শ্রীপ্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ গ্রন্থ' হইতে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি ছত্র উদ্ধারযোগ্য :

……অসুস্থতার মধ্যে পুজোর 'আনন্দবাজার' বেরল, তাতে ল্যাবরেটরি গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল, অসুখের মধ্যে সেদিন তিনি [রবীন্দ্রনাথ] ভালো ছিলেন তাই কাগজখানি আসবামাত্র আমার স্বামী [রথীন্দ্রনাথ] তা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখিয়েছিলেন। কী আগ্রহ তাঁর গল্পটি দেখে, ডাক্তারদের বারণ সত্ত্বেও তিনি কাগজখানি হাতে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে গেলেন। সোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ-কেউ আলোচনা করতেন, তাঁদের প্রায়ই বলতেন, "সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশনো খাঁটি রিয়ালিজ্‌ম্‌, অথচ তলায়-তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজ্‌মই হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।" বন্ধুবান্ধব এসে গল্পটির প্রশংসা করলে অসুখের মধ্যেও তাঁর মুখ কত উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

—নির্বাণ, পৃ ৩৪

বিশ্বপরিচয়

'বিশ্বপরিচয়' ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইখানি উক্ত বৎসর আলমোড়ায় গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের সময় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন।

সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার এই প্রয়াস প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন :

বিশ্বপরিচয় বইখানা তোমাকে পাঠিয়ে দিতে লিখে দিলুম, তারই সঙ্গে ফাউ একখানা 'ছড়ার ছবি' পাবে। ডাঙায় নাচতে পারি বলেই জলে সাঁতার কাটার অধিকার যে পাকা হবে এমন কোনো কথা নেই। বিজ্ঞান-সরোবরের ঘাটের কাছটাতে খুব হাত-পা ছুঁড়েছি, প্রাইজ পাব এমন আশা করি নে। বিজ্ঞানের আবহাওয়ার সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের মনটা চন্দ্রলোকের মতোই। যতটা সাধ্য, হাওয়া খেলিয়ে দেবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে মনে ছিল, কিন্তু হাওয়াটা ওজনে ভারী হয়েছে এমন নালিশ কানে উঠেছে।—মাল থাকবে অথচ ভার থাকবে না এমন জাদুবিদ্যা ওস্তাদের পক্ষেই সম্ভব। বিজ্ঞানের একটা রসালো উপক্রমণিকা লেখা তোমারই দ্বারা সাধ্য, কেননা তোমার ভাণ্ডারে বাক্যরস এবং অর্থমূল্য দুইই

আছে পুরো পরিমাণে ; অতএব দেশকে বঞ্চিত কোরো না। একদিন ক্লাস চালিয়েছিলে আজ আসর জমাতে হবে। ইতি ৫।১০।৩৭

—বৈজয়ন্তী, ১৩৪৬ ফাল্গুন-চৈত্র, পৃ ২৮৯

আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় ও পঞ্চম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র দুইটি ভূমিকা সংযোজন করিয়াছিলেন। উক্ত ভূমিকা দুইটি নিম্নে মুদ্রিত হইল :

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

যে বয়সে শরীরের অপটুতা ও মনোযোগশক্তির স্বাভাবিক শৈথিল্যবশত সাধারণ সুপরিচিত বিষয়ের আলোচনাতেও স্খলন ঘটে সেই বয়সেই অল্পপরিচিত বিষয়ের রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেম। তার একমাত্র কারণ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল। আশা ছিল বিষয়বস্তুর ত্রুটিগুলির সংশোধন হতে পারবে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে। কিছুদিন অপেক্ষার পর আমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সেন এবং বম্বাই থেকে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমোহন সোম বিশেষ যত্ন করে ভুলগুলি দেখিয়ে দেওয়াতে সেগুলি সংশোধন করবার সুযোগ হল। তাঁরা অযাচিতভাবে এই উপকার করলেন, সেজন্যে আমি তাঁদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছি। এইসঙ্গে পূর্বসংস্করণের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

কালিম্পঙ
২৭।৬।৩৮

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থে যে-সকল ত্রুটি লক্ষ্যগোচর হয়েছে সে-সমস্তই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনগুপ্ত বিশেষ মনোযোগ করে সংশোধিত করেছেন— তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

শান্তিনিকেতন
৯।১।৪০

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ "ছাত্রপাঠকদের প্রতি" 'বিশ্বপরিচয়' সম্বন্ধে যে কথাকয়টি বলিয়াছেন তাহাও এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :

··· তোমাদের জন্যে বিশ্বপরিচয় বইখানা লিখেছিলুম এই ভাবেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো

খুশি হয়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিনভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘটে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হতে পারে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল বলেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা তোমাদের মনে যদি জাগাতে পারি তা হলে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে করে আশ্বস্ত হব।

—বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ ।৴০

'বিশ্বপরিচয়' পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী কর্তৃক 'লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা'র প্রারম্ভিক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া ভূমিকায় সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থ রচনার গভীরতর প্রেরণাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহা বিশেষ সাহায্য করে। ভূমিকাটির প্রাসঙ্গিক কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে, এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে ; অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়।···

বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

—লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার ভূমিকা

বর্ণানুক্রমিক সূচী